নির্ণয়
মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

লেখক

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

সম্পাদনা

ওমর আল জাবির

শরীফ আবু হায়াত অপু

শার'ঈ সম্পাদনা

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দিন (খাকী)

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল, ২০১৭

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ মাসুম আনসারী

মুদ্রণ

ডিউ-ড্রপ এ্যাড্ এন্ড প্রিন্টিং

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

+ ৮৮ ০১৮১৮ ৭৩৭৩০৩

শুভেচ্ছ মূল্য : ৩০০৳

(তিন শত টাকা মাত্র)

USD $ 9

প্রকাশক ও পরিবেশক

পরিপূরক প্রকাশন

www.poripurok.com

prokashon@poripurok.com

poripurok@qq.com

Phone: + 88 016 79 19 19 19

সূচি

শার'ঈ সম্পাদকের কথা

সব প্রশংসা আল্লাহ এর জন্য। দরূদ ও সালাম নবী সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমার সন্তান আমাকে তার শিক্ষক তোয়াহা স্যার এর একটি পান্ডুলিপি দিয়ে বললো, "আব্বু, স্যার আপনাকে উনার এই পান্ডুলিপিটা দেখে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। সন্তানের কথার ভালবাসায় শুরু করলাম পড়া। আল্লাহ এর রহমতে ঐ সময়ে বেশ অবসরও ছিল। গভীর আগ্রহে মনযোগ সহকারে পুরো পান্ডুলিপি পড়ার পর মনে হলো, নবী (স) এর একটি হাদিসের মু'জিজা লেখকের কলম দিয়ে ভেসে উঠেছে। লেখক সত্যের অনুসন্ধানে ইব্রাহীম (আ) এর অনুসরণে দিক-বেদিক ছুটাছুটি করতে গিয়ে কুর'আনের আলোকে তাওহীদের পথের সন্ধান পেয়েছেন।

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তির চাইতে বেশি খুশি হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভুমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রম কালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় তার (বাহনটির) পিঠের উপর থাকে। অত:পর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পরে। ইতোমধ্যে বাহনটি তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশির চোটে বলে উঠে, "হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস আমি তোমার প্রভু!" সীমাহীন খুশির কারনে সে ভুল করে ফেলে। (মুসলিম)

সত্যর সন্ধানে লেখকও উক্ত বাস্তবতার শিকার। স্রষ্টার ব্যাপারে সত্যতা অন্বেষণ করতে গিয়ে তাঁর পরিশ্রম আল্লাহ কবুল করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি তাঁর বইটি বাস্তবতা দিয়ে ইসলামকে যুগোপযুগী করে সুন্দর ভাবে নানা রকম দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। কুর'আন ও হাদিসের বিপরীত কিছুই আমার জ্ঞান অনুযায়ী দৃষ্টি গোচর হয়নি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের জন্য সত্য প্রাপ্তির উপায় হোক। আ-মীন।

-শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দিন (খাকী)
১১ জুন, ২০১৭

আত্মকথন

বইটা একাডেমিক না। আপনাকে বলা নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি বলা যায়। সত্য খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া, সত্যের ঠিকানা পেয়ে সেই খোঁজে হাঁটার গল্প এই বইটা।

আমি অন্ধকারের মানুষ। হঠাৎ যেদিন আবিস্কার করলাম আমার পুরোটা জীবন নর্দমার নোংরায় মাখানো, গর্তের গহীনে হাঁচোড়পাঁচোড় করে কাটানো, যখন বুঝলাম "আমি" আসলে এই শরীরটা নই, বরং এই শরীর নামক বাহনটার এক আধ্যাত্মিক চালক, তখন মনে হলো এই উপভোগের সংকীর্ণ জীবনযাপনটা সত্যিকারের "আমার" উদ্দেশ্য হতে পারে না।

একসময় হাঁটতে হাঁটতে আলোর কথা জানলাম। অন্ধকার গর্তের এই সুড়ঙ্গপথের কোথাও সত্যের মিষ্টি ঝর্ণাধারার উপস্থিতি অনুভব করলাম। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। ততোদিনে আত্মাকে অর্থাৎ আমার আসল সত্ত্বাটাকে নিজের অতীত জীবনযাপন দিয়ে মেরে মোটামুটি খুনই করে ফেলেছি। দূর্বল মৃতপ্রায় আত্মা দিয়ে শরীরকে আর কতটুকুইবা নিয়ন্ত্রণ করা যায়? দাঁড়াতে পারি না। হাঁটতে গেলেই পড়ে যাই। হাত পা ছিলে যায়। নোংরাময় সামাজিক সুড়ঙ্গপথের রীতিনীতি আর প্রবৃত্তির শেকলে ছেয়ে থাকা কুৎসিত অন্ধকার আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার। পড়ে ফেটে যাওয়া মাথা নিয়ে কতবার হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। কেন যেনো আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। পা হেঁচড়ে ছেঁচড়ে হাঁটতে চেয়েছি। আলোতে যে আমি ভেসে যেতে চাই। ঐ ঝর্ণার সুপেয় ধারাতে আমার গায়ের সব নোংরা যে ধুতে হবে, অথৈ তৃষ্ণা যে মিটাতেই হবে আমার! তার আগে যে আমি থামতে চাই না। চাই না আপনিও থেমে যান। তাই নিজেকে কথাগুলো বলেছি। সাথে আপনাকেও।

কখনো ভাবিনি নিজের বইয়ের ভূমিকা লেখার সৌভাগ্য আমাকে দেয়া হবে। আমার আজকের অবস্থান, শিক্ষা, পথচলার অনুপ্রেরণার পেছনে আছে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বু আম্মুর সুগভীর ধৈর্য আর সহনশীলতা। অগাধ ভালোবাসা আর আদর। তীব্র ক্ষমাশীলতার টলটলে হ্রদ। উনাদের সাথে এত এত অন্যায় আর অবিরাম সব জঘন্য ভুলত্রুটির পরেও এই দুটা মানুষ আমাকে সবসময় আদর-আশ্রয় দিয়েছেন, ক্ষমা করে বারবার ভালোবেসেছেন, সহ্য করেছেন সব কষ্ট ভুলে। বুকে টেনে নিয়েছেন প্রতিটা বার। জানি না কীভাবে এই দুটা মানুষের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা প্রকাশ করবো! উনাদের প্রতি আমার এত সুতীব্র অনুভূতিকে আসলে অক্ষরে বাঁধা যাবে না। সম্ভব না।

আমার ছোট দুইটা ভাইয়ের অবিরাম সঙ্গ আর সাপোর্ট না থাকলে আমি বোধহয় অপূর্ণই থেকে যেতাম। আমার জীবনের ভুলভালগুলো ওরা এত যত্ন করে বুঝিয়ে বলে, আর ঠিক কাজগুলোতে এত বেশি উৎসাহ দিয়ে আমাকে সামনে এগিয়ে দেয় যে নির্দ্বিধায় বলতেই হয় যে ওরা শুধু আমার ভাই-ই না, পরম বন্ধুও। এই দুইটা দুষ্টুর জন্যে যে কতটা স্নেহ আর আদর আমার বুকে কলকল করে তা কীভাবে কীভাবে যেন ওরা ঠিকই বুঝে যায়! আত্মার সত্যিকার বন্ধন বোধহয় এমনই হয়।

আমার জীবনসাথী আর কন্যাকে অনেক ত্যাগ সইতে হয়েছে আমার জন্যে। উনারা সেটা হাসিমুখে সয়েছেনতো বটেই, উল্টো বারবার উৎসাহ দিয়ে গেছেন আমার প্রতিটা ভালো ইচ্ছে-কাজে, এই বইটার সূচনাতে। নিজেদের চরম কষ্ট লুকিয়ে, স্মিতমুখে, কুৎসিত সমাজের প্রতিটা নোংরামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে। এই মানুষগুলোর প্রতি যতোই কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসার কথা বলি না কেন তা সবসময় অপ্রতুলই রয়ে যাবে। যথেষ্ট হবে না। কক্ষণো না।

পরম ক্ষমাশীল দয়াময় আমাকে, আমার কাজের ভুল-ত্রুটিগুলোকে, আমার চারপাশের মানুষগুলোকে আর পাঠকসহ সবাইকে ক্ষমা করে কবুল করে নিন। সত্যকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করার হিম্মত দিন, শক্তি দিন। দুঃসাহস দিন সত্যকে মেনে নিয়ে সব বাধা-বিপত্তির বিপরীতে দৃঢ় পায়ে পথ চলতে। সবাইকে।

মিথ্যা আর বানোয়াট ভিত্তিহীন এই নোংরা সামাজিক জীবনের ইন্দ্রজালটা ছিঁড়েফুঁড়ে বেরিয়ে আসার ইচ্ছের অনির্বাণ মশালটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠুক প্রতিটা প্রাণে।

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর
২৯ রমাদ্বান, ১৪৩৮ হিজরী।

ছোট্ট একটা কাজ

আজকের এই অসাধারণ গল্পটার দাম ১৫ টাকা। এটা একটা সাধারণ মানুষের ভেতরে বেড়ে ওঠা অসাধারণ শুভ্রতার গল্প। আনন্দের গল্প। চারিদিকে এত অশান্তি আর অন্যায়ের মাঝে এই ঘটনাগুলো মনে করে করেই আমি এখনো স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন বুনি। এই ঘটনাগুলো আছে বলেইতো এখনো রাতে ঘুমুতে পারি। তো, ঘটনাটা বলি। সেইদিন ভার্সিটির প্রশাসনিক ভবনে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে গিয়েছিলাম। বায়লোজিক্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে ১৫ টাকায় রিকশা ভাড়া ঠিক করে যখন প্রশাসনিক ভবনের সামনে পৌছালাম, তখন সারা মানিব্যাগ ওলোট পালোট করে হাতিয়ে দেখে মাথায় হাত।

- ইন্নালিল্লাহ ভাইয়া, আমার কাছে দেখি ৫০০ টাকার নোট।

- খাইছে! উনার করুণ চেহারা দেখে চরম দিশেহারা লাগছিলো। বললাম,

- দাঁড়ান, খুঁজে দেখি ভাংতি পাই কি না!

প্রশাসনিক ভবনটা এমন এক বিরান জায়গায় যেখানে আশেপাশে একটা দোকানও নেই। একটাও না। এখানে রিকশাও দাঁড়ায় না খুব একটা। স্টুডেন্টদের চলাফেরাও হাতে গোনা। তারপরেও কয়েকটা পথচলতি স্টুডেন্টকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, "ভাইয়া, ভাংতি হবে?" ভাংতি না থাকায় যে মানুষের মনে এত বিশাল আনন্দের ঢেউ বয়ে যেতে পারে, তা উনাদের সারি সারি সাজানো ঝকঝকে শাদা দাঁতের উজ্জ্বল হাসি না দেখলে কোনোদিন জানা হতো না! যাকেই জিজ্ঞেস করি দেখি উনি ভাংতি না থাকায় চরম আনন্দিত। এদিকে উনার আনন্দের গুরগুরানি দেখে আমার কণ্ঠস্বর করুণ থেকে করুণতর হতে লাগলো, রিকশাওয়ালা ভাইয়া আরো চুপসে যেতে লাগলেন। এ কি মহাবিপদে পড়া গেলোরে ভাই? আস্তে আস্তে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই হাবাগোবা টাইপের। কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতায় এত্ত বেশি রাগ এর আগে কখনো হয়নি। হঠাৎ একজন এগিয়ে এসে বললেন,

- ভাইয়া, রিকশা ভাড়া কত?

- ১৫ টাকা।

তিনি ১৫ টাকা বের করে রিকশাওয়ালা ভাইয়াকে দিয়ে দিলেন। আমি বললাম,

-আপনি কেন দিচ্ছেন? আমার তো ভাংতি দরকার। ১৫ টাকা না।

- কিচ্ছু হবে না। ভাংতি নাই বলে কি উনার ভাড়াও দেয়া হবে না নাকি? হেহেহেঃ

আমার হাসি আসলো না। চিমসে মুখ বানানোর চেষ্টা করে চিঁ চিঁ করে জিজ্ঞেস করলাম,

- কিন্তু, আপনাকে এখন আমি ১৫ টাকা কিভাবে দিবো?

- দিতে হবে না ভাইয়া। ১৫ টাকাই তো। কিচ্ছু হবে না। হেহেহেঃ

এই বলে উনি হাঁটা দিলেন।

আমি ডাকলাম না।

থ্যাঙ্কস দিলাম না।

নাম জিজ্ঞেস করলাম না।

কোন ডিপার্টমেন্টে পড়েন, কই থাকেন জিজ্ঞেস করলাম না।

কিচ্ছু না।

জাস্ট হাবার মতো ৫০০ টাকার একটা নোট হাতে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, মানুষ এত ভালো? এত্ত? অন্যের বিপদে মানুষ নিজ থেকে আগায়ে এসে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে এখনো হেল্প করে এইভাবে? আমি হলে কি এমন করতাম? জানি না। তবে ভবিষ্যতে যে এইভাবে এগিয়ে গিয়ে মানুষকে নিজ থেকে সাহায্য করবো এইটুকু বুকের ভেতরে নিশ্চিত জানি।

১০ টাকা আর ৫ টাকার নোট দুটো। কত ছোট্ট! কত ক্ষুদ্র! কিন্তু সেটা দিয়ে সাহায্য করতে আসার পেছনের মনটা কত বিশাল বড়, তাই না? যেন আকাশ ছোঁয়া। মাত্র ১৫ টা টাকা। অথচ একজন হাবাগোবা মানুষের ভেতরটা সারা জীবনের জন্যে আমূল বদলে দিয়ে গেলো। আপনি কখনোই জানবেন না, আপনার একটা ছোট্ট কাজ দেখেও হয়তো অন্য আরেকটা মানুষের পুরো জীবনটাই বদলে যাবে। আপনি মুসলিম বলেই হয়তো আপনার সেই কাজে মুগ্ধ হয়ে সে ইসলামকে জানা শুরু করবে। পথ খুঁজে পাবে। তাই একটা ছোট্ট কাজকেও যেনো আর অবহেলা করবার দুঃসাহস না করি।

স্পর্শের ভ্রান্তি

খুব অবাক লাগে!

সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোও যখন অসীম মমতা নিয়ে কপালে হাত রাখেন, তখন কী যে ভালো লাগে! স্পর্শ, ছুঁয়ে দেয়ার মাঝেই এই অদ্ভুত ম্যাজিকটা লুকোনো। কাউকে ছুঁয়ে দেয়ার মানেই হচ্ছে আমি এখন তার সবচাইতে কাছে আছি। এই কাছে থাকার উৎসটা হলো ভালোবাসা। ছুঁয়ে দেয়ার ফলে একটা ভালোলাগা অনুভূত হয় ভেতরে। জ্বর আসলে আব্বু-আম্মু যখন পরম আদরে কপালে হাত দিয়ে দেখেন তখন এই ভালোলাগা বিদ্যুতের মতো সবার ভেতরে বয়ে যায়। প্রিয় মানুষটা আর আমার মাঝখানে সামান্যতম ফাঁকা জায়গাও নেই, একটুও না, এই সত্যটা আমাদের অবচেতন মনের ক্যানভাসটাতে আনন্দের আকাশী জলরঙে একটা হালকা টান দিয়ে যায়! মৃদু মৃদু ভালো লাগতে শুরু করে!

এই যে স্পর্শকে এত সত্য, এত জীবন্ত মনে হয়, সেই স্পর্শে কিন্তু কেউ আমাদেরকে সত্যি সত্যি ছুঁয়ে দিতে পারে না। দুইজনের শরীরের লক্ষ লক্ষ এটমের বাইরের দিকে থাকা ইলেক্ট্রনগুলো পরস্পরকে তীব্র বিকর্ষণ করে ভেতরের দিকে চেপে যায়। একটা মানুষের ইলেক্ট্রন আরেকটা মানুষের ইলেক্ট্রনকে স্পর্শ করতে পারে না। ফলে, মাঝখানে ঠিকই একটা বি-শা-ল দুরত্ব থেকে যায়। হোক না তা ইলেক্ট্রনের সাপেক্ষে! এটাই সত্যি। শুধু আমরাই জানি না, বুঝি না এই দুরত্বের সত্যকে। আমরা বুঝে উঠতেই পারি না কখনো যে, দুনিয়াটা আসলেই একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তির জায়গা। গভীর ভ্রান্তি!

আমরা না জানলেও কিন্তু এটাই সত্যি। আমাদের জানা বা অজানা থাকার ফলে কিন্তু সত্যটা বদলে মিথ্যে হয়ে যায় না। সত্যের জায়গায় সত্য অবিরাম অটল থাকে। আমরাই কেবল আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের গন্ডীতে তাকে ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না। আমরা যে সত্যি সত্যি কত্ত অসহায় সেটা অনুধাবন করার মতো জ্ঞান আর ক্ষমতাও আমরা রাখি না। হ্যাঁ, আমরা এতটাই অসহায়!

যিনি সব সত্যকে ধারণ করে আছেন, সব সত্যি সত্যি যেমন আছে তেমন হয়ে থাকার আসল কারণ আর আদি উৎস যিনি, আমাদের জন্যে তাঁর রয়েছে তীব্র মায়া আর স্নেহ! জগতের অকুল পাথারে তাই আমাদের জন্যে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় কিছু সত্য তিনি তাঁর কথামালায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথামালায়

একটা কথা [১] জানতে পেরে বুকটা অদ্ভুত শূন্য হয়ে গেলো। তীব্র হাহাকার আর শূন্যতায় বুকের আকাশটা হঠাৎ করেই পুরোপুরি খালি হয়ে গেলো। দুনিয়াটা ভ্রান্তি, মায়া ছাড়া আর কিচ্ছু না। যা অনুভব করছি, উপভোগ করছি, সবই আসলে ভ্রান্তি! এটাই সত্য! এটাই রিয়েলিটি, বাস্তবতা। যেমনটা হয় ছুঁয়ে দেয়ার সময়। ছুঁয়ে দেয়ার ফলে আমাদের মনে হতে থাকে যে আমাদের মাঝে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, অথচ এই মনে হওয়াটা কেবলই আমাদের শরীরে কিছু ইলেক্ট্রিক সিগন্যাল আর কেমিক্যাল রিয়েকশানের ফলাফল। কী অদ্ভুত আর অভূতপূর্ব ডিজাইন করেই না আমাদেরকে এই পরীক্ষার হলে পাঠানো হয়েছে! সত্যিই অসাধারণ!

জানি, আমি এইখানে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। পরীক্ষা দিতে বসেছি। তবু পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে কঠিন কঠিন সব আনকমন প্রশ্ন দেখে মনটা উদাস হয়ে যায়। গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন সব সৃজনশীল প্রশ্ন দেখে ভয় আর উৎকণ্ঠায় মন আঁধারে আঁধারে ঘিরে আসে। যদিও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে আমরা বুকের ভেতরে ভয় পেলেও বিশ্বাসীদের জন্যে সত্যি সত্যিই ভয়ের কিছু ঘটবে না। তবুও ভয় কাটে না। ভয় যে কাটবে না এটা তিনিও জানেন। তবুও তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে ভুলেননি।

আমার পরীক্ষার শেষ সময় কবে জানি না। পরীক্ষা শেষ করে খাতা জমা দিয়ে সব ছেড়েছুড়ে এক দৌড়ে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। আবার এদিকে কিছুই যে ঠিকঠাকমতো লিখতে পারিনি, যা লিখেছি তাও সবই ভুলেভালে ভরা সেটাও জানি। চারপাশের পরীক্ষা নামক দায়িত্বগুলোর তীব্র চাপ, সেই সাথে অতীতের পৃষ্ঠায় ভুল উত্তর লিখে আসার কারণে এই পৃষ্ঠার অংকটার উত্তর না মেলা! প্রতিটা ক্ষণ যে কী ভয়াবহ! কী যে ভয়ংকর!

এই ভয়ংকর জায়গা থেকে হয় আরো নীচে আরো অকল্পনীয় ভয়ংকরে অনন্তের জন্যে তলিয়ে যাওয়া, আর নয়তো ধৈর্য্য রেখে দাঁতে দাঁত চেপে পরীক্ষা দিতে থাকলে উপরে উঠে যাওয়া। নিজের বাসায়। নিজের সত্যিকারের বাসায়, যেখান থেকে এইখানে আসার পরে কেবলই খারাপ লাগে দিবারাত্রি।

জানি না আরো কতদিন বাকি! শুধুই স্বপ্ন দেখি বাসায় ফিরে যাবার। নিজের বাসায়। আমাদের সত্যিকারের বাসা।

রেফারেন্সঃ [১] আল-কুরআন, সুরা হাদীদ, ২০ নং আয়াতের শেষ বাক্যটা।

উল্টো নির্ণয়

প্রিয় বন্ধুটা সেদিন বাসায় এসে বলছিলো,
"তোর দেয়া স্ট্যাটাস টা পড়লাম। আরে, যে আপুটার বদলে যাওয়ার গল্প লিখলি তার চেয়ে তোর বদলানোর গল্পটাতো আরো মজার ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই বছরে তুই কী ছিলি, আর শেষ দুই বছরে কী হলি, সেটা শেয়ার কর।"

আমার লজ্জা লাগে বলতে। এ যে একান্তই নিজের করা যুদ্ধের কথা। একা একা ভুল পথে, ভুল গলিতে হন্যে হয়ে হোঁচট খাওয়া আর হেঁটে বেড়ানোর গল্পের কথা বলতে কার ভালো লাগে? ভুল আর নষ্ট অতীত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তাকে কেন আবার খুঁড়ে বের করে দুর্গন্ধ করা চারিপাশ? পরে ভাবলাম, এই অতীতই তো আমার শক্তি, আমার এগিয়ে চলার সাহস আর প্রেরণা। কেউ যদি একটুও সাহস পায় এই গল্প থেকে, কেউ যদি সত্যের পথে, সত্যের জন্যে আপোষহীন হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়ে যায়? বলা তো যায়না।

গাপুসগুপুস করে আমি বই খেতাম সেই ছোট্টবেলা থেকে। সবাই খেলা দেখতো, আমি বই খেতাম। বন্ধুরা আড্ডা দিতো, আমি বই পান করতাম। বন্ধুরা টিভিতে বুঁদ হয়ে থাকতো, আমি বইয়ে ডুবে হাঁসফাঁস করতাম। বই ছিলো আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। প্রিয় খাবার, পানীয়, বালিশ, জগত সবই ছিলো আমার বইময়। এমন কোনো বই ছিলো না যা আমি পড়তামনা। ইন্টার পাশ করার পর হুমায়ুন আজাদের "আমার অবিশ্বাস" বইটি গেলার পর পেটে খুব গ্যাস ফর্ম করে। খুব পানি খেয়ে, রেস্ট নিয়ে পেটের গ্যাস দূর হলো, কিন্তু মাথায় ঠিক ঠিক গ্যাস্ট্রিক হয়ে গেলো।

স্রস্টা কি সত্যিই আছেন? নাকি সব মানুষের বানানো গালগপ্পো? হুম্ম? ধর্ম-টর্ম কি আসলে বানানো কিছু হাস্যকর "রিচুয়ালস" না? সমাজের গড়ে তোলা সংস্কারভীতু মন বলে ওঠে,

"না না, বাদ দাও তো ওসব ফালতু কথা। ওসব ভাবতে নেই।"

যুক্তি বলে, “না না তো করছো, ভিত্তি আছে এই বিশ্বাসের? ভীতু কাপুরুষ কোথাকার!”

মেজাজ খাট্টা হয়ে গেলো। কী করা যায়? কী করা যায়? পারিতো খালি একটাই কাজ। পড়া। তো, শুরু হয়ে গেলো আর কি!

পড়তে পড়তে আরজ আলী মাতুব্বর থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল, কুরআনের অনুবাদ থেকে শুরু করে বেদ-গীতা-বাইবেল কিচ্ছু বাদ থাকলো না। একটাই লক্ষ্য, যেটা সত্যি সেটাকে খুঁজে বের করবো, শুধু সেটাই মানবো। সত্যের সাথে কোনো আপস চলবে না, চলতে পারে না। ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ পড়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে এতদিন সব ফালতু বিশ্বাস মেনে এসেছি? হায় হায়! বন্ধ করো এসব। কেন মিলাদ পড়ো? নামাজ কেন পড়ো? মাজারে যাও কেন? মুসলিমই যদি হও তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেন পড়ো না? নিজেকে মুসলিম বলো কি বুঝে? দেব-দেবীর পুজা করছো ভালো কথা, জেনে বুঝে করছোতো? ঘরে-বাইরে, বন্ধু-সহপাঠি, ঈদ-পুজায় সবখানে সবাইকে জ্বালিয়ে মারতাম। কেউ কিচ্ছু জানতো না। উত্তর দিতে পারতো না কেউ। সব্বাই হই-হই করে উঠতো “মাইরালামু-কাইট্টালামু” সরগোল তুলে। সার্টিফিকেটধারী বেকুবের দলকে চিনে গেলাম, চিনে গেলাম হাস্যকর জ্ঞানার্জনের সিস্টেমটাকে আর সেই সিস্টেম থেকে বিজবিজ করতে করতে বেরিয়ে আসা অন্ধ মেরুদন্ডহীনদের। অন্ধ বিশ্বাস আর বিনোদনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আবিষ্কার করে অনেকদিন অ-নে-কদিন হতাশায় ভুগেছি, আর তামাক পুড়ে ছাই করেছি।

হতাশা ধীরে ধীরে ঘৃণাতে আর ঘৃণা থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলো অহংকার। খুব পড়তাম, আর সবাইকে যেখানেই পেতাম ধুয়ে দিতাম। এক্কেবারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ডলে, এসিড দিয়ে ঝলসে বিবর্ণ-রংহীন বানিয়ে ছেড়ে দিতাম। ভার্সিটির স্টুডেন্ট হলে তো কথাই নেই। চুড়ান্ত ওয়াশ দিতাম। মিয়া ভার্সিটিতে পড়ো! নামাজ পড়ো, পুজা করো, কেন করছো, কী করছো না বুঝেই করবা, চলবা আর সমাজে গিয়া ভাব নিবা যে “খুব শিক্ষিত হইছি গো” তা হবেনা। অসহ্য লাগতো এই সমাজ ব্যবস্থা আর মানুষের অবিরাম ভন্ডামী। এখনো লাগে।

এভাবে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষাও পার হয়ে গেলো। পড়া কিন্তু থামেনি।

সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশান। ধুমিয়ে চলছে ডকুমেন্টারী দেখা। এর মাঝেই একদিন Atheism and Theism নিয়ে এক লেকচার দেখা হয়ে গেলো। খ্রীস্টান প্রফেসর এত এত সুন্দর করে লজিক দিয়ে সব কিছু বোঝালেন যে নড়েচড়ে বসলাম। ভাবনার নিস্তরঙ্গ পুকুরে অনেকদিন পরে তীব্র ঢিলের আঘাত! এইবার Theism এর লজিকের পিছে লাগলাম নিরপেক্ষ মন নিয়েই। এর সাথে একাডেমিক স্টাডি হেল্প করছিলো বিবর্তনবাদ নিয়ে ভুল ধারণাগুলোর দরজায় আঘাত করতে। সংশয়বাদী মন বারবার বলে উঠতে চাইলো, স্রস্টা কি সত্যিই আছেন তাহলে? আর অহংকারী মন বারবার তার টুটী চেপে ধরছিলো।

কী যে কষ্ট এই নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা! কী যে যন্ত্রণা এই একা একা মানসিক যুদ্ধ করতে থাকা! এত্ত এত্ত অসহায় লাগা সেই অনুভূতি আর দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাওয়া। কেউ পাশে নেই। কেউ না। বারবার শুধু অহংকারী মন "ধর্ম ভুল, স্রস্টা ভুল" বলে চিৎকার করে ওঠে আর বলে, "শোন, তুমি যা জানো তাই ঠিক। আরো ভালো করে Atheism নিয়ে স্টাডি করো, করতেই থাকো। এইসব সংস্কার, ফালতু সংস্কার।" দিনরাত মাথায় খালি আর্গুমেন্ট আর কাউন্টার আর্গুমেন্ট ঘুরতো। স্রস্টা যে নেই সেটাই বা কনফার্ম করি কী দিয়ে? বিজ্ঞানীরা কী বলেন? ম্যাক্রো-ইভোলিউশানিস্টরাতো এই ব্যাপারে কিছু অপ্রমাণিত ধারণা কপচিয়ে উচ্ছৃংখলদের উস্কে দেয়। অথচ এই থিওরীগুলো থিওরীই শুধু। হাতে কলমে কাজ করে, অবজার্ভেশানে রেখে রেজাল্ট পাওয়ার জায়গা এটা নয়। বাকি থাকলো দর্শন। শুধু ভাবনা দিয়ে, চিন্তা-পরীক্ষা (থট এক্সপেরিমেন্ট) করে যে কত্ত অসাধারণ জিনিস বের হয়ে আসে তা সবাই জানে। আর বিজ্ঞানের শুরুটাওতো সেই দর্শন থেকেই। শুরু হলো দর্শন যুদ্ধ।

পড়তে পড়তে একটা উপলব্ধির শুরু হলো। আমি আসলে কিছুই জানি না, কিচ্ছু না। অহংকারের পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো। দর্শন, যুক্তি আর কমনসেন্সের যুদ্ধে নাস্তিক্যবাদ হার মানলো। আমরা কোনোকিছু দেখে, ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে, বারবার দেখে তারপর একটা সিদ্ধান্তে যখন আসি তখন সেটাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বলি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কমনসেন্স আর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই কাজে লাগাই।

ধরুন, আপনাকে আমার এন্ড্রয়েড ফোনটা দেখালাম। তারপর বললাম আমার

এন্ড্রয়েডটা সৌদি আরবের মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছি। এত বালি আর তেল এত্ত এত্ত মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে ঝড়ো হাওয়া আর জলে, তাপে আর শৈত্যে, তারপরে বজ্রের ধমধমাধম আঘাতে প্রথমে ধীরে ধীরে সিলিকন আর প্লাস্টিক, তারপর আরো মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে অন্যান্য পার্টস, ব্যাটারী ইত্যাদিতে বিবর্তিত হতে হতে হতে হতে আজকের এই টাচস্ক্রীণড-এন্ড্রয়েড ফোনে বিবর্তিত হয়েছে। Samsung লেখাটা যে খোদাই করা দেখছেন, সেটাও এভাবেই এসেছে ভাই। বিশ্বাস করেন ভাই। আপনার দুটি পায়ে পড়ি ভাই, প্লীজ বিশ্বাস করেন। আপনি বিশ্বাস করবেন না। কেন? কেন করবেন না? কারণ, আপনার এতদিনের পর্যবেক্ষণ বলে এটা পুরোপুরিই অসম্ভব।

তাই?

একটা জড় পদার্থ থেকে আরেকটা জড় পদার্থ এভাবে তৈরী হওয়ার দাবীকে আপনি অসম্ভব বলছেন, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ চাইছেন আমার দাবীর! ভালো ভালো, গুড, গুড! এইতো যুক্তিবাদী মন! যেখানে একটা জড় (তথা বালি, তেল ইত্যাদি) থেকে আরেকটা জড়ই (যেমন মোবাইল ফোন) তৈরী হতে পারে না, অসম্ভব, সেখানে জড় পদার্থ থেকে একটা কোষের মত অসাধারণ সাজানো-গোছানো আবার পুনঃউৎপাদনক্ষম জৈবিক একটা যন্ত্র নিজে নিজে এমনি এমনি তৈরী হতে পারে? সম্ভব? আপনি বুদ্ধিমান হলে অলরেডী দুইদিকে মাথা নেড়ে "না, না" বলছেন, আর অন্ধ বিতার্কিক হলে উল্টো যুক্তি হাতড়ানো শুরু করেছেন।

প্রিয় অন্ধ বিতার্কিক, আপনি আপনার অন্ধকূপে হাতড়াতে থাকুন যদ্দিন সুখ পান, ভাব নিয়ে নিজে যা জানেন তাকেই শুধু সত্য বলে মেনে যান গলার জোরে আর অহংবোধে, নিজের গোলকধাঁধায়। ততক্ষণে আমরা আরেকটু আলোকিত হয়ে নিই, কেমন?

যেহেতু এত্ত সুক্ষ্ম জটিলতায় পরিপূর্ণ একটা জিনিস এভাবে নিজে নিজে তৈরী হয়ে যেতে পারে না, অনস্তিত্ব থেকে নিজে নিজেই অস্তিত্বে আসতে পারে না, তার মানে আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এর একজন স্রস্টা আছেন। তিনিই হচ্ছেন স্রষ্টা যিনি কোনোকিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন। এই দুনিয়া, প্রাণজগতের মাঝে এত্ত সুন্দর নিয়ম-শৃংখলা আর ডিজাইন, নিখুঁত নিয়ম-কানুন মেনে চলা বিশাল মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে ছোট্ট ইলেক্ট্রন-প্রোটন

সবকিছু একজন অসাধারণ অপার্থিব অতিবুদ্ধিমান, জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান ডিজাইনারের দিকেই ইশারা করছে অবিরাম।

কাজেই স্রস্টা আছে, থাকতেই হবে।

আবার আরো একটু মন দিয়ে ভাবলেই বুঝা যায় যে, একজনের বেশি স্রস্টা থাকা অসম্ভব। দর্শন, যুক্তি আর নিরপেক্ষভাবে কমনসেন্স খাটালেই বুঝা যায় একজনের বেশি স্রস্টা থাকলে এই এর সুন্দর শৃংখলা আর সাজানো গুছানো প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনগুলো থাকতো না, এলোমেলো আর বিশৃংখলায় ভরে থাকতো পুরো অণু-পরমাণু হতে সমগ্র মহাবিশ্ব। অনেকগুলো স্রষ্টার হিসেব বাদ দিই। শুধুমাত্র দুইজন সমান ক্ষমতাবান স্রষ্টা থাকলেই কিন্তু শক্তির প্রদর্শনী আর যুদ্ধ লেগে যেতো। একজন ডানে বললে, আরেকজন বলতো বামে। ফলে, শৃংখলা কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতো না। টেনিসবল তিনবার অভিকর্ষের কারণে নীচে পড়তো, তো পরের দুইবার উপরে উঠে যেতো, পরক্ষণেই আবার ডানে কিংবা বামে ছুট দিতো। কিন্তু তা তো না! সব তো কি সুন্দর নিয়ম-কানুন আর শৃংখলা মেনে চলছে। সর্বশক্তিমান স্রস্টা তাহলে একজনই। তিনি অপার্থিব। সৃষ্টি অর্থাৎ যা কিছু অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এসেছে এমনকিছুরই সাথে তাঁর কোনো মিল নেই, সৃষ্টির কোনো গুণাবলী হুবহু তাঁর মাঝে নেই, থাকতে পারে না। সৃষ্টির উপাদান হতে তিনি পুরোপুরি আলাদা, ফলে এর বৈশিষ্ট্য হতেও। কারণ, যদি তিনি সৃষ্টির মতো গুণাবলীর ধারক হয়ে থাকেন তাহলে তাকেও সৃষ্ট হতে হবে, যা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁকে যে সৃষ্টি করবে তাকে আবার আরেকজন দ্বারা সৃষ্ট হতে হবে, তাকে আবার আরেকজন দ্বারা, এভাবে চলতেই থাকবে অসীম পর্যন্ত। এর কোনো শেষ নেই।

সহজ করার জন্যে একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন, আপনি একজন ট্রাক ড্রাইভার। গাড়ির ইঞ্জিন রাস্তায় হঠাৎ বিগড়ে গেলো। ঠেলে ঠেলেই আধা মাইল দূরের গ্যারেজে নিতে হবে। ধাক্কা দেয়া দরকার। একজনকে ডাকলেন।

তিনি বললেন,

"অক্কে ভাইয়া। কুনো সমিস্যা নাই। আমি ধাক্কা দিমু, তবে যদি আমার আরেকজন বন্ধু রাজি হয় তারপর দিমু, নইলে না।"

তাঁর বন্ধুকে বললেন ব্যাপারটা।

সেই বন্ধুও উত্তর দিলো,
"অক্কে ভাইয়া। সমিস্যা নাই কুনো। আমি ধাক্কা দিমু, তবে যদি আমার আরেকজন বন্ধু রাজি হয় তারপর দিমু, নইলে না।"

তাঁর বন্ধুকেও খুঁজে বের করে অনুরোধ করলেন। সেও একই কথা জানালো। তাঁর আরেকটা বন্ধু রাজি হলে তবেই তিনি ধাক্কা দিবেন।

এভাবে যদি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, বন্ধুর সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকবে অসীম পর্যন্ত। ধাক্কা আর দেয়া হবে না। গাড়িও আর কোনোদিন আধমাইল দূরের গ্যারেজে যাবেনা। ঠিক?

এভাবে স্রস্টাও যদি আরেকজন স্রস্টা দ্বারা, সেই স্রস্টাও আরেকজন স্রস্টা দ্বারা তৈরী হতে হয় তাহলে তা অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে। সৃষ্টির মাঝে অসাধারণ ডিজাইনের ছাপ খুঁজে পাওয়া দূরে থাকুক, কোনোকিছু সৃষ্টিই তো হবে না আর কখনো। কিন্তু সৃষ্টি যেহেতু আছে, তাতে স্রষ্টার অতিবুদ্ধিমত্তা আর প্রজ্ঞার ছাপও পাওয়া যায় বুদ্ধি খাটালেই, তার মানে স্রস্টাও আছেন। তবে মনে রাখতে হবে, সেই স্রস্টা যদি আমাদের এই জীবনে দেখা কোনো কিছুর মতই না। কারণ, যদি কোনো কিছুর মত হয় তাহলে তাকে সৃষ্টি হতে হবে আরেকটা স্রষ্টা দ্বারা, তাকে আবার আরেকজন দ্বারা, এভাবে অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে, ফলে আমরা আর কোনো সৃষ্টিই দেখবোনা। তাই না?

স্রষ্টা আছেন, তবে সেই স্রস্টা আমাদের দেখা কোনোকিছুর মত না, কোনো সৃষ্টির মত না। কোনো মূর্তির মত না, ফুটবলের মত না,আমাদের মতো হাত পা চোখওয়ালা না, মোট কথা আমরা যেভাবে ভাবতে পারি তিনি সেরকম নন। খেয়াল করলেই দেখবো, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাইরে, সৃষ্টিজগতের বাইরে ভাবতেই পারি না। কল্পনায় একটা নতুন ধরণের প্রাণী তৈরী করার চেষ্টা করতে পারেন। তাহলেই দেখবেন সেখানে আপনি শুধু আপনার পরিচিত জগত থেকেই নানান রকমের উপাদান নিয়ে প্রাণীটাকে সাজাচ্ছেন। কিন্তু একটু আগেই আমরা বুঝেছি যে, স্রস্টা সৃষ্টিজগতের কোনো উপাদান দ্বারা তৈরী হতে পারেন না, ফলে সৃষ্টিজগতের উপাদানগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য হতেই তিনি পুরোপুরি স্বতন্ত্র। একই কারণে তাঁকে থাকতে হবে সৃষ্টি

থেকে আলাদা। তাঁকে হতে হবে অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান, শাশ্বত, সর্বশক্তিমান এবং স্বনির্ভর।

অসম্ভব প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান এবং সর্বশক্তিমান হওয়া ছাড়া এই সুবিশাল নিউক্লিয়ার শক্তি বিকিরণকারী নক্ষত্র, জটিল অণু-পরমাণু, আর ছোট্ট আণুবিক্ষণীক কোষ হতে সমগ্র মহাবিশ্বের এত সুন্দর নিয়ম-কানুন তৈরী করা সম্ভব নয়। তিনি স্বনির্ভর এবং কখনোই কারো মুখাপেক্ষি হতে পারেন না। তিনি অনাদি (সময়ের উপর অনির্ভশীল, পরম) ও স্বনির্ভর না হলে কার উপরে নির্ভর করবেন? তিনি কারো উপরে নির্ভর করলে সেই সত্ত্বা আবার আরেকজনের উপরে নির্ভর করার প্রশ্ন চলে আসে, যা কিনা অবিরাম চলতেই থাকবে, ফলে মহাবিশ্বের কিছুই আর অস্তিত্বে আসতে পারবে না। একইভাবে তিনি Self-fulfilling না হলে তাকে কে Fulfill করবে? তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি। কারণ, কারো কাছ থেকে জন্ম নিলে জন্মদাতাকে কে জন্ম দিলো এরকম প্রশ্ন আবার অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। একইভাবে তিনি কাউকে জন্মও দেননি। জন্ম দেয়া বা জন্ম নেয়া জীবের তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টাকে অবশ্যই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হতে পুরোপুরি মুক্ত ও স্বাধীন হতে হবে।

উপরে বর্ণিত গুণগুলো থাকতে হবে বলতে বুঝানো হচ্ছে এগুলোই একজন স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য। তিনি কোনোভাবেই সৃষ্টির মতো নন। একদম সহজে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা টেবিল বাতাস দেয় কিনা, ঘূর্ণিঝড় তৈরী কিভাবে করে, এই প্রশ্ন যেমন অবান্তর এবং ভুল, ঠিক তেমনি একজন স্রষ্টার স্রষ্টা কে, তাঁকে কে পূর্ণ করে, তাঁর আগে তাহলে কী ছিলো, সেই প্রশ্নগুলোও সব অবান্তর। কারণ, "টেবিলটা বাতাস কেমন দেয়?" এই প্রশ্নটাই যেমন অপ্রাসঙ্গিক, টেবিলের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, ঠিক একইভাবে স্রষ্টাকে কে তৈরী করলো, তাঁর আগে কী ছিলো, তিনি কী খেয়ে জীবনধারণ করেন, এই প্রশ্নগুলোও একইভাবে অবান্তর এবং ভুল।

স্রষ্টা কি এমন একটা পাথর বানাতে পারেন, যা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না? কিংবা তিনি কি নিজেকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দিতে পারেন? কিংবা তিনি কি খারাপ হতে পারেন? মিথ্যা বলতে পারেন? উত্তর হচ্ছে, না। কারণ, এর প্রতিটাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, স্ববিরোধী। তিনি এমন কিছু করতে পারবেন না যা স্ববিরোধী, যা তাঁর স্রষ্টা-সত্ত্বাকেই নষ্ট করে দিবে। আর তাঁর স্রষ্টা সত্ত্বা নষ্ট হয়ে গেলে তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না।

অনেকে বলতে পারে, এই কাজগুলো করতে না পারলে তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা নন। আবারও স্ববিরোধী ভুল সিদ্ধান্ত। সহজ করার জন্যে বলি, কেউ যদি আপনাকে একটা টেনিস বল দেখিয়ে বলে এই বলটা কাঠের আলমারী তৈরী করতে পারে না, ফলে এটা টেনিস বলই নয়, এমনকি এই টেনিস বলটার অস্তিত্বও নেই। তাহলে আপনি হাহাহা করে হেসে ফেলবেন। কেনো হাসবেন? তার যুক্তিতে ভুল কোথায়? ভুল এখানেই যে সে টেনিস বলটার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার জন্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বোকাটা টেনিস বলটার উপরে চাপিয়ে দিতে চাইছে, যা থাকলে এটা আর টেনিস বলই থাকবে না, হয়ে যাবে কাঠমিস্ত্রী! একইভাবে স্রষ্টারও এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না, বা তিনি এমন কিছু করতে পারেন না, যে বৈশিষ্ট্য থাকলে বা যা করলে তিনি আর স্রষ্টাই থাকবেন না।

বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে রাখা যাক।

১. স্রষ্টা এক। ফলে, পূজনীয় এবং উপাস্য হিসেবে শুধুমাত্র তাঁকেই মেনে নিতে হবে। কারণ, তিনি ব্যতীত আর সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। আর তাঁর প্রতিটা সৃষ্টিই তাঁর উপরে নিভর্রশীল। নিভর্রশীল কোনোকিছুই পূজনীয় এবং উপাস্য হতে পারে না। বরং উপাসনা এবং পূজনীয় শুধুমাত্র তিনিই, যিনি সবাইকে সৃষ্টির পর সবকিছু দেন, রক্ষা করেন কারও উপরে নিভর্রশীল না হয়েই।

২. তিনি সর্বশক্তিমান। কারণ, এতো বিশাল গ্রহ, সুবিশাল নক্ষত্র, নিহারীকা থেকে শুরু করে কোষের জটিলতা পর্যন্ত যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে অন্যরকম শক্তির অধিকারী হতেই হবে যা কিনা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. অত্যন্ত বুদ্ধিমান যা কল্পনা করার ক্ষমতাও আমাদের নেই।

৪. স্বনিভর্র। কারো উপর নিভর্রশীল নন। সৃষ্ট নন। জন্ম নেননি। জন্ম দেননি। সৃষ্টি হওয়া, জন্ম নেয়া নামক নিভর্রশীলতা থেকে তিনি মুক্ত।

৫. তিনি সৃষ্টির মাঝে থাকেন না। তিনি সৃষ্টি হতে আলাদা। তিনি পরিচিত কোনো কিছুর মতোই নন।

মোটামুটিভাবে স্রষ্টাকে আমরা বুঝে ফেললাম। স্রস্টাতো মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে, মানুষকে এই পৃথিবীর জীবনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠিয়েছেন শুনেছি। এবার সেগুলো যাচাই করে দেখি কোনোটা স্রষ্টাকে পুরোপুরি সঠিকভাবে বর্ণণা করে, ফলে সত্যকে আংশিকভাবে নয় বরং পুরোপুরি ধারণ করে? আশেপাশে পাওয়া ধর্মগুলোকেই খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ কী পেয়েছিলাম সেটা একবার দেখা যাক।

কিছু ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা এক, এবং উনাকে ছাড়া আর কারো বা কোনো বস্তুর পূজো করা যাবে না উল্লেখ থাকলেও সাংঘর্ষিক কথাও আছে। সেই ধর্মে তাই প্রাণীপূজা বা বস্তুপূজার পাশাপাশি আছে অবতারবাদ। অবতারবাদ অনুযায়ী স্রস্টা নিজেকেই মানুষরুপে দুনিয়াতে পাঠান। স্রষ্টা নিজে মানুষ হওয়ার সমস্যা আছে। এটা উনার স্বনির্ভরশীল বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। কারণ, মানুষ স্বনির্ভরশীল নয়, তাকে সৃষ্টি হতে হয়। জন্ম নিতে হয়। একজন স্রষ্টা একই সাথে সৃষ্ট আবার স্রষ্টা দুটোই হতে পারেন না যুক্তি অনুযায়ীই। জন্মও নিতে পারেন না। আবার মানুষকে খাবার সহ অনেক কিছুর উপরে নির্ভরশীল হতে হয়। স্রষ্টা অনির্ভরশীল, স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ। আগেই বলেছি। কাজেই এই ধর্ম কোনো যুগ বা কালে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক হিসেবে যদি স্রস্টার কাছে থেকে এসে থাকে, তবুও এটা আর আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু এটা পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ সত্যকে ধারণ করছে না, যুক্তিবিরোধী সাংঘর্ষিক কথাবার্তা আছে, সেহেতু এখানে মানুষের হাত লেগেছে, বা সম্পাদিত হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আরেকটি ধর্মগ্রন্থে বলা হচ্ছে স্রস্টার সন্তান আছে। তাঁর নাম হচ্ছে যীশু (বা ঈসা নবী)।
যীশু মানুষ ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি স্রস্টার সন্তানই হতে পারে না। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য বিরোধী। যীশু স্রষ্টা হতে পারেন না, কারণ তিনি মানুষ ছিলেন। মানুষ স্বনির্ভর না, তাকে সৃষ্টি হতে হয়। একজন স্রষ্টা একই সাথে সৃষ্ট আবার স্রষ্টা দুটোই হতে পারেন না যুক্তি অনুযায়ীই। এছাড়াও, ইতিহাস বলে এরা নিজেরাই ভোটাভুটির মাধ্যমে বাইবেল কে ইচ্ছেমতো বদলে নিয়েছে। বাইবেলের বদলানোর কাজ অনেকজন করায় এর অনেক রকম সংস্করণ পাওয়া যায়। এছাড়াও বাইবেলে দেখা যায় যিশু স্রষ্টার কাছে দুয়া করেছেন, প্রার্থনা করেছেন। স্রষ্টার কাছে যে দুয়া করে সে কিভাবে স্রষ্টা বা পূজনীয় হতে পারে? পূজনীয়তো শুধু একজনই যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি স্রষ্টা। কাজেই এই ধর্ম কোনো যুগ বা কালে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক হিসেবে যদি স্রস্টার কাছে থেকে এসে থাকলেও, অদল-বদল আর মনুষ্য সম্পাদনার কারণে এটাও আর গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে। ফলে, এটাও আমি মানতে পারিনি।

আরেকটি ধর্মগ্রন্থের আলোচনায় চলে যাই। স্রষ্টা উযাইরকে পাঠিয়েছিলেন উনার বার্তাবাহক হিসেবে। একটা ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন উযাইর স্রষ্টার সন্তান, ফলে উযাইর উপাস্য-পূজনীয়, যা আবারো স্ববিরোধী। ফলে,

ঝামেলা আছে। আবার এই ধর্মকে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের বাইরের কেউ গ্রহণ করতে পারে না। নিয়ম নেই। এর মূল ধর্মগ্রন্থটা একটা নির্দিষ্ট সময়ে, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছিলো, যার কার্যকারিতা এই যুগের সব মানুষের জন্যে নয়। তাই আমার জন্যে এটি প্রযোজ্য নয় মোটেও। সাথে যুক্তির সাংঘর্ষিকতা, ফলে বিকৃতির সম্ভাবনাতো আছেই।

কিছু ধর্মের ব্যাপারে যট্টুক জেনেছি, বুঝেছি যে একজন মানুষের দর্শন নিয়ে এই ধর্ম বেড়ে উঠেছে, স্রস্টার ব্যাপারে খুব বেশি বিস্তারিত কিছু সেইসব ধর্মে আমি খুব বেশি পাইনি। গ্রহণ এবং যাচাই করবার মতো খুব বেশি তথ্য তাতে ছিলোও না। এমনকি মূল ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা নিজে কিছুই বলেননি, নিজের বাণী বলে দাবীও করেননি। ফলে, সেটা স্রষ্টার পক্ষ থেকে ছিলোই না কখনো।

ফাইনালি যে ধর্ম নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হলো তার মূল ধর্মগ্রন্থের নাম আল-কুরআন। আল্লকুরআন দাবী করছে এটা স্রষ্টার বাণী এবং স্রস্টা শুধুমাত্র একজন। এটি বলছে, স্রস্টার আকার কল্পনা করা যায় না। তিনি কোনোকিছুর মতো নন। তিনি স্বনির্ভর। কারো মুখাপেক্ষী নন, নির্ভরশীল নন কোনোকিছুর উপর। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। এটা সবক'টা যুক্তিকেই পূর্ণভাবে সমর্থন করছে। এছাড়াও এটা মানুষের সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের কাছে আসা অন্যান্য বাণীর (Revelation) কথা বর্ণণা করছে, বারবার বার্তাবাহক আর বাণী পাঠিয়ে পথ দেখানোর পরেও মানুষের অন্য দিকে ছুটে যাওয়া, ভুল উপাস্য (যিশু, মূর্তি, মাজার, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি) নির্বাচন, ভুলে ডুবে যাওয়ার ইতিহাস বর্ণণা করছে। এটা এই দাবীও করছে যে এটা জগতের ধ্বংস পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এই দাবীর পর ১৪০০ বছর পার হয়ে গেছে, এখনো একটি অক্ষর এদিক ওদিক হয়নি। কেউ এটা প্রমাণ করতে পারেনি অনেক চেষ্টার পরেও। এর মাঝে স্ববিরোধী বা সাংঘর্ষিক কোনো কথা বার্তা তো নেই-ই, বরং আছে স্থান-কালহীন সুগভীর প্রজ্ঞা আর জ্ঞান। কেউ যখন বলে এখানে স্ববিরোধী বা সাংঘর্ষিক কথা আছে, সে আসলে আরবী না জানার ফলে, আয়াতের কনটেক্সট না জানার কারণেই বলে। ভালোভাবে পড়াশোনা করার পর আর কোনো সন্দেহ থাকে না। আর এই কুরআনেই আল্লাহ চুড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন,

"This day I have perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you

Islam as your religion." (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩)
এই চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ বার্তা আল-কুরআনের মাধ্যমেই মহান স্রষ্টা একমাত্র জ্ঞান অর্জন করে যাচাই বাছাই করে এই পথ গ্রহণ করার আহ্বান জানান দুনিয়ার সব মানুষকে, প্রত্যেকটা মানুষকে। এই পথের নাম ইসলাম। এই শান্তির পথকে, এই একমাত্র টিকে থাকা পরিপূর্ণ ও সত্যিকার পথকে যেসব মানুষ খুঁজে, জেনে, মেনে চলে নিজেকে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পিত করে দেন তাদেরকে মুসলিম বলে। কাজেই, একজন মানুষ মুসলিম হতে হলে তাকে অবশ্যই স্রস্টা আর তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা পড়ে, বুঝে, জেনে, মেনে হতে হবে। এখানে কোনো শর্টকাট নেই। জন্মসূত্রে নামের আগে একখানা "মোহাম্মদ" থাকলেই সে স্রষ্টার কাছে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। এইখানে (ইসলামিক) জ্ঞানার্জনকে এবং সেই অনুযায়ী জীবনধারণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সব সত্য জেনে শুনেও যেসব মানুষ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ আর দাসত্ব করতে গিয়ে, সমাজের ভয়ে, অহংকারে, নির্যাতনের ভয়ে ইত্যাদি নানা রকম অজুহাতে এক স্রস্টার পাঠানো এই জীবনব্যবস্থা বিশ্বাস করতে চায় না, বিশ্বাস করলেও নিজের জীবনে মানতে চায় না, বিরোধীতা করে যায় অবিরাম আর তাই অবিশ্বাসীদের চাইতে এইসব ভন্ডদের (hypocrites) শাস্তি হবে আরো ভয়াবহ। এখানে বিচার-কে করা হয়েছে সুক্ষ্ম হতে সুক্ষ্মতর। নিখুঁত হতে নিখুঁততর। পৃথিবীর বুকে একমাত্র এটাই পরিপূর্ণ সত্যকে ধারণ করে চলেছে। কাজেই, এটাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত টিকে থাকা স্রষ্টা প্রদর্শিত ও স্বীকৃতপ্রাপ্ত একমাত্র গ্রহণযোগ্য সঠিক সত্য পথ।

আমার এই পথে যাত্রা শুরু হলো। হাঁটতে হাঁটতে জানলাম কুরআন নিজেই একটা মিরাকেল। শেষদিন পর্যন্ত মানুষের এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এর মিরাকেল আবিস্কার হতেই থাকবে, হতেই থাকবে। এর সবচাইতে বড় অসাধারণত্ব হচ্ছে এর অলৌকিক ভাষাশৈলী। আরবী না জানলে এর সত্যিকার অলৌকিকত্ব বোঝা প্রায় সম্ভবই না। সেই আরবী শেখার পথে আমি মাত্র যাত্রা শুরু করলাম। ইসলাম নামের সেই পরশ পাথরটি আমাকে বদলে দিয়েছে, প্রতিদিনই বদলে দিচ্ছে একজন সোনালী মুসলিমে। সত্যিকার মুসলিমে। এখন শুধু পথটা ধরে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকা, নিজেকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে থাকা, মানুষকে সত্যটা জানানোর চেষ্টা করতে থাকা।

অনেক কথাতো বললাম। ইসলামে আসার পর সেই হই-হই রৈ-রৈ করে মারতে আসা মানুষগুলোকে, সমাজকে যখন ইসলামের কথাগুলো হাসিমুখে বলতে গেলাম, জানাতে গেলাম সত্যের কথা, বোঝাতে গেলাম, সেই তারা এরপর কী করলো জানেন? থাক, আজ না। এই বিশাল ভন্ড আর দূষিত সমাজের কথা, সেই গথাম সিটির গল্প আরেকদিন করবো ইন শা আল্লাহ।

আপনি যদি এই দুনিয়ার কোনো মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকেও সেই সুমহান সত্যের পথে স্বাগতম। স্বাগতম ইসলামের পথে। স্বাগতম দুনিয়ার চাকচিক্য, প্রদর্শনী, অশ্লীলতা আর গোলামী থেকে মুক্তির পথে। স্বাগতম অবিকৃত আর সুন্দরতম মানবতার পথে।

স্বাগতম স্রস্টার নিজের দেখানো, একমাত্র অস্তিত্বশীল স্বীকৃত সত্যের পথে।

সত্য

“সত্যি করে বলুন, আজ আপনাকে বলতেই হবে, আপনি কি আমাকে আর ভালোবাসেন না?”

জীবনসাথীর কাছ থেকে আসা উত্তরটা যেনো অবশ্যই সত্য হয়- এই চাওয়ার পেছনের দাবীটা আর বুকের ধুকপুকানিটা একদমই নিখাঁদ।

সত্যকে জানতে চাওয়ার এই তীব্র আকুতিটা আমাদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই একেবারে লতাপাতায় জড়ানো। ডাক্তার সাহেব সত্যি কথা বলবেন, চাকুরীর নিয়োগদাতা মিথ্যা বলবেন না, বই আর প্রবন্ধে সত্যি কথা লেখা থাকবে এই চাওয়াগুলো কার ভেতরে নেই? সংবাদ সংস্থা থেকে শুরু করে বিচারালয়, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, পরিবহন ব্যবস্থা, ওষুধের বোতল, বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা খাবারের প্যাকেটের গায়ে উপাদানের পরিমাণেও যেনো সত্য কথা লেখা থাকে এটাই আমাদের চাওয়া। টাকা-পয়সার লেনদেন, সম্পর্ক, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাদের দাবী, আমাদের চাওয়া একটাই। সেটা হলো “সত্য”। এইসব ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার, আপোষ করার প্রশ্নই আসে না। কক্ষনো না।

সত্যের প্রতি আমাদের এই সুতীব্র দাবী আর সুন্দর ভালোবাসাটাই কেমন যেনো ম্যাটম্যাটে, নিরস, মেরুদন্ডহীন আর অসৎ হয়ে পড়ে, যখন নৈতিকতা আর ধর্মের সত্যের বিষয়টা সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা তখন আনমনা হয়ে মুখ উদাস করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে কেটে পড়ার ধান্দা করি, কিংবা চুপ মেরে যাই। নিজের ভেতরটাকেও “চোওওপ” বলে একটা কড়া ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চাই।

ধর্ম বা নৈতিকতার ব্যাপারে আমাদের ভেতরের এই নেতিবাচক মনোভাবটা খুব কম মানুষই স্বীকার করে। এই নেতিবাচক মনোভাবের ভিত্তিটা যে যৌক্তিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে যাওয়া- এটা বলার মতো সাহসী আর সৎ মানুষ খুব কমই দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে আমরা কিছু না বুঝেই ঝটাপট তৈরী করা কিছু উত্তর ঝেড়ে দিই। “সামাজিক জীব” হিসেবে আমরা প্রায় সবসময়ই কিছু স্ববিরোধী তথা আত্মঘাতী বক্তব্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করি, যেমন:

“আরে ধম্মো টম্মো এইসব মানুষের বানানো ব্যাপার, এর মাঝে সত্যের কিছু

নেই।"

"এটা আপনার জন্যে সত্যি, আমার জন্যে নারে ভাই।"

"বুঝলা মিয়া, নিশ্চিত সত্য বলে কিছু নাই।"

"সবকিছুই আপেক্ষিক।"

"হুম, এইসব আসলে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার।"

"এইটা আপনি বিচার করার কে?"

"ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার। এখানে ফ্যাক্ট তথা নিশ্চিত সত্যের কোনো ব্যাপার নাই।"

দিনশেষে আমরা আসলে ঐ সত্যটাকেই পছন্দ করি, যেটা আমাদেরকে আনন্দিত করে, স্বস্তি দেয়, কষ্ট দেয় না। কোনো সত্য যখনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের অন্ধকারকে দেখিয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় যে আমরা দোষী, ভুল করে চলেছি, তখন আমরা সেই সত্যকে আর পছন্দ করি না। দূরে দূরে থাকতে চাই। যেনো দূরে থাকলেই সত্যটা পাল্টে যাবে। মিথ্যে হয়ে যাবে। সম্ভবত এটাই সত্য যে, সত্যকে হজম করবার মতো শক্তি আমাদের নেই।

আমাদের হৃদয় আর মননে গেঁথে যাওয়া এই অশুভ সাংস্কৃতিক অসততা সমাধানের জন্যে সত্যের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্নের সমাধান করা অতীব জরুরী। কী সেগুলোঃ

১. সত্য কী?

২. সত্যকে কি জানা সম্ভব?

৩. ঈশ্বর সম্পর্কিত সত্যকে জানা সম্ভব?

৪. এসবে কী আসে যায়? সত্য নিয়ে এত প্যানপ্যানানির কী আছে?

সত্যের ব্যাপারে সত্য

সত্য কী?

"যেটা যেরকম, সেটাকে ঠিক সেভাবেই বলা" অথবা "যা কোনোকিছুর প্রকৃত অবস্থাকে বর্ণণা করে" সেটাই সত্য।

আমাদের সমাজে ইদানীং সত্যকে আপেক্ষিক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, অথচ যা সত্য, তা সবসময়েই সত্য। সত্য কারো মতামতের উপরে নির্ভরশীল নয়। কোনো বিষয়ে একজন জ্ঞানী মানুষের মতামত মিথ্যে হতে পারে, আবার একজন অজ্ঞের মতামতও সত্য হয়ে যেতে পারে। মতামত আর চলতি বিশ্বাস যাই হোক না কেনো, সত্য সত্যই থাকে। বিশ্বাস পরিবর্তনশীল হতে পারে, মতামত আর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যেতে পারে, কিন্তু সত্য অপরিবর্তনশীল।

উদাহরণ দেয়া যাক। মানুষ একসময় বিশ্বাস করতো পৃথিবী একটা বিছানো সমতল ভুমি। সত্যটা প্রকাশ পাওয়ার পর দেখা গেলো মানুষের বিশ্বাসে ভুল ছিলো। ঐ সময়ের মানুষের বিশ্বাস, মতামত আর বিশ্লেষণের ক্যানভাসে পৃথিবীর ছবি চারকোণা সমতল হলেও, আসলেই কি পৃথিবী চারকোণা সমতল ছিলো? মোটেও না। পৃথিবী গোলাকারই ছিলো সবসময়। দৃঢ়বিশ্বাস আর ব্যক্তিগত মতামত সত্যের উপরে কোনো প্রভাবই ফেলে না, তা যতো লক্ষ বছরের বিশ্বাস আর প্রতিষ্ঠিত মতামতই হোক না কেনো।

সত্যের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা সবসময়ের জন্যেই সত্য। সত্য আপেক্ষিক না। সত্য সবসময়েই পরম (absolute)। আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্যের উল্টোটা সবসময়েই মিথ্যা। ঠান্ডা মাথা নিয়ে একটু ভেবে দেখা যাক তাহলে। ধরা যাক, "সূর্য গোল" এই কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এর উল্টো কথা হচ্ছে "সূর্য গোল না"। প্রথম কথাটা সত্যি হলে, সেটা সবসময়ের জন্যেই সত্যি, এবং সেইক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথাটা সবসময়েই মিথ্যা। এটাই ফ্যাক্ট। সব সত্যের উল্টো কথাই মিথ্যা। এটা ধর্মীয় সত্যের ক্ষেত্রেও সত্যি। আশা করি বুঝা গেছে। তাও গোলমেলে মনে হচ্ছে? তাহলে পড়তে থাকুন। একটু পরে একদমই ফকফকা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে?

অনেকক্ষণ ভারী ভারী কথা হলো। এখন একটা হালকা গল্প কল্পনা করি। অনল আর হামজা। দুই ত্যাঁদড় টাইপের বন্ধু গলা ফুলিয়ে তর্ক করছে। চায়ের কাপে

সুনামি চলছে। আড্ডার অন্যান্য বন্ধুরা হা করে চুপচাপ এই দুই ট্যালেন্টের তর্ক শুনছে গালে হাত দিয়ে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এক পর্যায়ে অনল দাঁড়িয়ে শ্রোতা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলোঃ

"তোরা দ্যাখ, এই মুসলিমগুলা কত্তো সংকীর্ণমনা! আমি হামজার সব কথা শুনলাম। তোরা জানিস হামজা কী বিশ্বাস করে? ও বিশ্বাস করে যে ইসলামই সত্য আর যেটা ইসলামের উল্টা কিংবা সাংঘর্ষিক সেটা মিথ্যা। এই মুসলিমগুলা সব আসলেই সংকীর্ণমনা!"

হামজা মিটিমিটি হাসছিলো অনলের কথা শুনে। অনলের কথা শেষ হবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস একটা মুখ বানিয়ে বললোঃ

"তোরা দ্যাখ, এই এথিইস্টরা (atheists) কত্তো সংকীর্ণমনা! আমি অনলের সব কথা শুনলাম। তোরা জানিস অনল কী বিশ্বাস করে? ও বিশ্বাস করে যে এথিইজমই (atheism) সত্য আর যেটা এথিইজমের উল্টা কিংবা সাংঘর্ষিক সেটা মিথ্যা। এই এথিইস্টগুলা সব আসলেই সংকীর্ণমনা!"

আড্ডার বন্ধুরা একটু চমকে উঠলো প্রথমে, তারপরেই বুঝতে পেরে ঠাঠা করে হাসতে শুরু করলো। আসলেইতো। এথিইস্টদের সত্যের দাবীটাওতো মুসলিমদের সত্যের দাবীর মতোই সংকীর্ণ! যদি মুসলিমদের কথা সত্য হয়, তাহলে উল্টো হবার কারণে এথিইস্টদের দাবী মিথ্যে। একইভাবে, এথিইস্টদের দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিমদের দাবীটা মিথ্যে হতে হবে।

সত্যের ব্যাপারে আরো কিছু সত্য এখানে দেয়া হলোঃ

১. কেউ জানুক বা না জানুক, বুঝুক বা না বুঝুক, সত্য সত্য হিসেবেই অস্তিত্বে থাকে। সত্যকে খুঁজে বের করতে হয়, সত্যকে তৈরী করা যায় না। যেমনঃ নিউটন সাহেবের আগেও মহাকর্ষ ছিলো।

২. সত্য টাইম-স্পেস বা সময়-কালের উপরে নির্ভর করে না। যা সত্য, তা সকল সময়ের সকল স্থানের জন্যেই সত্য। যেমনঃ ২ আর ৩ এ যোগ করলে ৫ হয়, এটা সকল সময়ের সব জায়গার সব মানুষের জন্যেই সত্য।

৩. সত্যের ব্যাপারে আমাদের "বিশ্বাস" বদলাতে পারে, "বিশ্বাসে" ভুল থাকতে পারে, কিন্তু সত্য সবসময়েই অপরিবর্তনশীল। সত্য বদলায় না। যেমনঃ মানুষ বিশ্বাস করতো পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে সূর্য ঘুরছে। এতে কিন্তু সত্যটা বদলে যায়নি, বরং সত্যটা বুঝতে পারার পর মানুষের বিশ্বাস বদলেছে।

৪. বিশ্বাস কখনো সত্যকে বদলে দিতে পারে না, সেটা যতোই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা হোক না কেনো! একজন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরছে। তার এই মনেপ্রাণে বিশ্বাসের কারণে সত্যটা বদলে যাবে না।

৫. কারো চরিত্র বা আচার-আচরণের কারণেও সত্য বদলে যায় না। আচার-আচরণে ভালো একজন মানুষ যেমন ভুল করতে পারেন, আবার একজন অহংকারী মানুষের কথাও সত্যি হতে পারে। সত্য কারো ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে নির্ভরশীল নয়।

৬. সকল সত্যই পরম সত্য। এমনকি যেগুলোকে আপেক্ষিক সত্য বলে ভ্রম হয়, সেগুলোও আসলে সত্য। উদাহরণ স্বরুপ, "আমি, মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর, আজ ১৩ই জানুয়ারী, ২০১৬ তে বড্ড মন খারাপ অনুভব করছি" কথাটাকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই আপেক্ষিক অর্থাৎ শুধু আমার জন্যেই সত্য বলে মনে হলেও, এটা আসলে সব জায়গার সব সময়ের সব মানুষের জন্যেই পরম সত্য যে, মোহাম্মদ তোয়াহা আকবরের ঐ নির্দিষ্ট দিনে আসলেই মন খারাপ ছিলো।

সারকথা হলো, ভুল বিশ্বাস থাকা সম্ভব, কিন্তু ভুল বা আপেক্ষিক সত্য থাকা সম্ভব না। আমরা বিশ্বাস করতেই পারি যে আমাদের চোখের আকৃতি কাঁঠালের মতো, কিন্তু আমাদের সেই বিশ্বাস চোখের সত্যিকার আকৃতিকে কখনোই বদলে দেবে না। চোখের আকৃতির ব্যাপারে সত্যটা সত্যই থেকে যাবে।

এতক্ষণে ফকফকা ক্লিয়ার হয়েছে, তাই না? কিন্তু আধুনিক সেক্যুলার, লিবারেলিস্ট, এগনস্টিক আর এথিইস্টরা "সত্য বলে কিছু নাই" বলে যখন দাবী করে তখন আমরা কী করবো? জানতে হলে পরের চ্যাপ্টারে চলে যান এখনই।

আত্মঘাতী কথাবার্তা

"আজ আপনাকে যা শেখাবো সেটা আপনাকে এমন একটা অতিমানবীয় ক্ষমতা দিবে, যেটা ব্যবহার করে আপনি দ্রুত এবং পরিস্কারভাবেই আপনার চারপাশের অনেক অনেক ভুল কথা আর মিথ্যা দর্শনগুলো সাথে সাথেই ধরে ফেলতে পারবেন!" এই কথাটা যদি আপনাকে কেউ বলে আপনি কি আগ্রহী হবেন? যদি আগ্রহী হন তাহলে পরের অনুচ্ছেদে চলে যান।

দু'টো কথা দেখুনঃ

"আপনি পড়তে জানেন না"

"আমি লিখতে পারি না।"

উপরের বাক্য দুটো নিঃসন্দেহে মিথ্যা। আপনাকে যতোই বুঝাই না কেনো আপনি আমার এই উপরের বাক্যগুলো বিশ্বাস করবেন না।

কেনো?

কারণ, কথাগুলো যে নিজেই নিজেকে মিথ্যে প্রমাণ করছে। এইরকম আরো অনেক কথা বা বাক্য বলা যায়। যেমনঃ

"আমি টাইপ করতে জানি না।"

"আমি বাংলা বুঝি না।"

আমি লিখতে পারি না কথাটা এজন্যেই ভুল, কারণ, কথাটা আমি লিখেছি। যেহেতু আমি লিখেছি কথাটা, তাই "আমি লিখতে পারি না" কথাটা সত্য নয়। শেষের দুইটা বাক্যের জন্যেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। আপনি পড়তে জানেন না কথাটা কেনো ভুল তা কি আর বুঝিয়ে বলতে হবে?

এই ধরণের হাস্যকর কথাবার্তা বা বিবৃতিকে বাংলায় বলা হয় স্ববিরোধী কথা (self defeating statement)। সোজা বাংলায় বলা যায় "আত্মঘাতী বিবৃতি"। যেহেতু, এই কথা বা বিবৃতিগুলো নিজেই নিজের সত্যতার বিপক্ষে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ সেহেতু এই "আত্মঘাতী বিবৃতি" নামকরণ।

কাজেই, কেউ যদি এসে বলে "ভাই, আমি বাংলায় কথা বলতে পারি না", আপনি সাথে সাথে ক্যাঁক করে আটকে দিয়ে বলবেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান! আপনার এই কথাটাতো মিথ্যা, কারণ আপনি যে কথাটা বাংলাতেই বলে ফেলেছেন ভাই সাহেব!"

আমাদের সমাজে এইরকম আত্মঘাতী কথাবার্তা প্রায়ই বলা হয় কিন্তু। আপনি হয়তো "সত্য একটা আপেক্ষিক ব্যাপার", "সুনিশ্চিত সত্য বলে কিছু নাই" এইরকম কথাবার্তা মানুষের মুখে শুনেছেন। আজ থেকে এইরকম কথা বলে আর কেউ পার পাবে না। কারণ, আপনি এতক্ষণে আগের চেয়ে স্মার্ট হয়ে গেছেন। আপনি বুঝে গেছেন এই কথাগুলো আত্মঘাতী। এগুলো নিজেই নিজের কথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকেই খুন করে ফেলে, নিজের শুদ্ধতার মানদন্ডে নিজেই ফেইল করে, ফলে, কথাগুলো সত্য হতে পারে না। ব্যাপারটা অনেকটা কার্টুনগুলোতে দেখানো ইঁদুর দৌড়ের মতোন। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ আবিস্কার করা, "আরি, দৌড়াতে দৌড়াতে বিল্ডিং এর বাইরে চলে আসলাম কখন! আরে, আমি কিসের উপরে দৌড়াচ্ছি? ওমা, আমার পায়ের তলায়তো দেখি কিচ্ছু নাই!" আর আবিস্কার করার সাথে সাথেই নিজের ভার নিজে সইতে না পেরে সাঁইইইইইইই করে নীচের দিকে পড়তে পড়তে প্রপাৎ ধরণীতল! আত্মঘাতী কথাগুলোও ঠিক এইরকম। কথাগুলো নিজের কথার ভার নিজেই সইতে পারে না। তারপর খেয়াল করে, "আরি, এইটা কী বললাম!" খেয়াল করে দেখে ভিত্তিহীন একটা কথা বলার কারণে পায়ের তলায় মাটি নেই আর, ফলে নিজের কথার ওজনেই পতন ঘটে মরতে হয়।

কাজেই, কেউ যদি বলে বসে "সত্য আপেক্ষিক", আপনিও সোজা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবেন, "আপনার এই কথাটাও কি আপেক্ষিক সত্য?"। অথবা কেউ যদি বলে, "নিশ্চিত সত্য বলে কিছু নাইরে ভাই", আপনিও বোমা ছুঁড়বেন, "এই কথাটাওতো তাহলে নিশ্চিত সত্য নয়, ফলে মিথ্যা"। কিংবা কেউ যদি বলে, "এটা আপনার জন্যে সত্যি, আমার জন্যে না", আপনি তখন তার মুখের কথাটা মাটিতে পড়বার আগেই লুফে নিয়ে বলবেন, "এইমাত্র যে কথাটা বললে, সেটা কি আপনার জন্যে সত্য, নাকি সবার জন্যেই সত্য?" এইরকম "আপনার জন্যে সত্যি, আমার জন্যে না" টাইপের কথাবার্তা এই যুগের মন্ত্র বলা যায়, কিন্তু এইসব কথা দিয়ে দুনিয়া চলে না। আপনি পাওনাদার, পুলিশ কিংবা বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাটা বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারেন আপনি কদ্দুর যেতে পারেন!

আধুনিক সমাজের এই তন্ত্র-মন্ত্রগুলো খুবই ফালতু, কারণ এগুলো আত্মঘাতী,

স্ববিরোধী। কিন্তু যারা এইসব কথাবার্তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বসে থাকে তাদের জন্যে কয়েকটা প্রশ্ন হলোঃ সত্য বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে আমরা কোনো কিছু শেখার চেষ্টা করি কেনো? একজন স্টুডেন্ট কেনো টীচারের কথা শুনবে, বই পড়বে? দিনশেষে, বইতে বা টীচারের কাছেতো সত্যটা নেই, তাই না? টাকা দেয়া দূরে থাকুক, স্কুল, কলেজ আর ভার্সিটিতে গিয়ে সময় নষ্ট করার দরকারটা কী? টীচারের কথা শুনে নকল না করে পরীক্ষা দেয়ার কী দরকার?

প্রত্যেকটা আইডিয়ার ফলাফল আছে, পরিণতি আছে। ভালো আইডিয়ার জন্যে সুন্দর ফলাফল, আর মন্দ আইডিয়ার আছে মন্দ পরিণতি। আমরা যদি আমাদের স্টুডেন্টদের শেখানো শুরু করি যে সত্য-মিথ্যা, সঠিক-বেঠিক বলে কিছু নাই, সবই আপেক্ষিক, তখন সেই আমরাই কেনো নিজের অবিবাহিত বোনকে প্রেগন্যান্ট দেখে আঁতকে উঠবো, অথবা কারো খুন হবার সংবাদে কেনো বিচলিত হবো? কেনো মানুষের কাছ থেকে আমরা "সঠিক" আচরণ আশা করবো, যেখানে আমরাই শেখাচ্ছি যে সত্য বা সঠিক বলে কিছু নেই, এগুলো আপেক্ষিক ব্যাপার? আমরা কি খেয়াল করছি যে আমাদের সমাজটা ঠিক এই মন্দ পরিণতির দিকেই চলে যাচ্ছে, আর গত কয়েক দশকের নৈতিক আর ধর্মীয় অবক্ষয় হচ্ছে এর পেছনের মূল কারণ। যারা এইসব "আমার জন্যে সত্য নয়" টাইপের ফালতু আর ভুলভাল আইডিয়া মাথায় নিয়ে ঘুরে ঘুরে অন্যায় করে বেড়ায়, তাদের অন্যায়ের পরিণতির ফসল কিন্তু শুধু তাকেই নয়, আপনাকে আমাকে সবাইকেই বহন করতে হয়।

সত্য আছে। এটা অস্বীকার করে বোকামী করার প্রশ্নই আসে না। যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা আসলে কিছু আত্মঘাতী কথাবার্তা আওড়ে যায় শুধু। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করে বলা, "ভাই, আপনে আইজকা যান গা, আমিতো বাসায় নাই।"

আমাদের এই আত্মঘাতী কথাবার্তা চিহ্নিত করবার ক্ষমতাটাকে পরবর্তী লেখায় ব্যবহার করে দেখবো যে সংশয়বাদীদের "সত্যকে জানা সম্ভব না" কথাটার সত্যতা কতোটুকু? আচ্ছা, লেখাটা পড়ার আগে আপনি নিজেই চেষ্টা করে দেখুন না।

সুনিশ্চিত সত্যটাকে ধারণ করে চলেছে। এটা নিয়েও আমরা “উল্টো নির্ণয়” অধ্যায়ে কথা বলেছি। তবে পিটার সাহেবকে দেখালে সেটাতে শুধু পিটার সাহেবেরই উপকার হবে, কিন্তু আপনার কী অবস্থা? আপনি কি সত্যিই সততার সাথে পিটার সাহেবের মতো সত্যটাকে দেখতে চান, বুঝতে চান, মানতে চান? জানতে চান সেই প্রমাণগুলোকে যেগুলো সুনিশ্চিত সত্যটাকে আপনার সামনে উদ্ভাসিত করবে, আর আপনি ভেবে-চিন্তে যাচাই করে নিবেন কথাগুলো সত্য কিনা আসলেই?

যদি তাই হয়, তাহলে পরের লেখাটা পড়বার আমন্ত্রণ রইলো।

আমার বুকে আঙ্গুল ঠুকতে ঠুকতে পিটার সাহেব উত্তর দিলেন, "আমার ঘরের ভেতরে আপনি ঢুকবেন নাকি ঢুকবেন না সেটা আমিই আপনাকে বলবো!"

সাথে সাথেই ঝেড়ে দিলাম, "আল্লাহও আপনাকে ঠিক এই উত্তরটাই দেয়ার অধিকার রাখেন!"

পিটার সাহেব হালকা ধাক্কা খেলেন। চোখ চিকন করে বললেন, "সত্যি বলতে কি, আমি আল্লাহতে বিশ্বাসই করি না। আমি একজন এথিইস্ট (নাস্তিক)।"

-"আপনি এথিইস্ট?"

-"জ্বি, হ্যাঁ।"

-"ঠিক আছে। আপনি কি একদমই নিশ্চিত যে আল্লাহ নেই?"

-"আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না আসলে। একজন আল্লাহ থাকতেও পারেন।"

-"তাহলে আপনি আসলে একজন এথিইস্ট নন, বরং এগনস্টিক (সংশয়বাদী)। কারণ, একজন এথিইস্ট বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবেই জানি আল্লাহ বলে কিছু নেই' এবং একজন এগনস্টিক বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি না আল্লাহ আছেন কিনা।' "

-"ওহ! আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমি এগনস্টিকই।" উনি স্বীকার করে

নিলেন।

-"আপনি কোনো ধরণের এগনস্টিক তাহলে?"

ক্লিনশেইভড গালের মাঝখানে থাকা ঝাঁটার মতোন গোঁফের নীচ দিয়ে ম্লান হাসি হেসে তিনি বললেন, "বুঝিনি।" সম্ভবত তিনি ভাবছিলেন, "কী আজিব! এক মিনিট আগে আমি এথিইস্ট ছিলাম। এখন আমার কোনো ধারণাই নেই যে আমি কোনো ধরণের এগনস্টিক!"

-"আসলে দুই ধরনের এগনস্টিক আছে। সাধারণ এগনস্টিক বলে, সে কোনোকিছুই নিশ্চিতভাবে জানে না, আর দ্বিতীয় ধরণের এগনস্টিক বলে, নিশ্চিতভাবে কোনোকিছুই জানা সম্ভব না।"

-"আমি দ্বিতীয় দলের। কোনোকিছুইতো আসলে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব না।"

পিটার সাহেবের আত্মঘাতী বক্তব্যটা আমি লুফে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম,

"পিটার সাহেব, আপনি যদি বলেন যে আপনি কোনোকিছুই নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন না, জানা সম্ভব না, তাহলে এটা আপনি কীভাবে জানলেন?"

উনাকে একটু বিভ্রান্ত দেখালো। বললেন, "কী বুঝাতে চাচ্ছেন?"

একটু ঘুরিয়ে বললাম প্রশ্নটাকে, "আপনি কী করে নিশ্চিতভাবে জানলেন যে কোনোকিছুই নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব?"

উনার মুখে বাতি জ্বলে ওঠাটা নিজের চোখে দেখলাম যেনো। উত্তর পেলাম, "ওকে। আমার মনে হয়, নিশ্চিতভাবে কিছু জিনিস জানা অবশ্যই সম্ভব। সেক্ষেত্রে আমি প্রথম দলের সাধারণ এগনস্টিক।"

যাক! ব্যাপারটা এগুচ্ছে তাহলে। কয়েকটা প্রশ্নেই পিটার সাহেব এথিইজম হতে সরে এসে দ্বিতীয় সারির এগনস্টিসিজম ছেড়ে এখন সাধারণ এগনস্টিসিজমে পৌঁছলেন।

আমি বললাম, "যেহেতু আপনি স্বীকার করে নিলেন যে আপনার পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানাও সম্ভব, তাহলে কেনো আপনি জানেন না যে আল্লাহ আছেন?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলেন, "কারণ, এই ব্যাপারে আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।"

আমি মিলিয়ন ডলারের প্রশ্নটা করলাম, "আপনি কি প্রমাণ দেখতে ইচ্ছুক?"

"অবশ্যই।" তিনি জবাব দিলেন।

এই ধরণের মানুষেরাই আসলে বেস্ট মানুষ, যারা সৎভাবে একটা ব্যাপারকে দেখতে চান, বুঝতে চান। সৎ ইচ্ছা থাকাটা খুবই খুবই জরুরী। কারণ, একজন অনিচ্ছুকের জন্যে লক্ষ প্রমাণও যথেষ্ট না।

উপরের কাল্পনিক কথোপকথনটা আরো বহুদূর পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া যায়। পিটার সাহেবকে প্রমাণ দেখানো যায় যে আসলেই আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে শক্ত প্রমাণ রয়েছে যেটা আমরা এই বইয়ের "উল্টো নির্ণয়" অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। সামনে আরো আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ। আরো প্রমাণ করে দেখানো যায় যে, বেদ, বাইবেল কিংবা কুরআনের মাঝে কোনোটা সুনিশ্চিত সত্য, এবং কোনোটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এখনও অবিকৃত অবস্থায়

সুনিশ্চিত সত্যটাকে ধারণ করে চলেছে। এটা নিয়েও আমরা "উল্টো নির্ণয়" অধ্যায়ে কথা বলেছি। তবে পিটার সাহেবকে দেখালে সেটাতে শুধু পিটার সাহেবেরই উপকার হবে, কিন্তু আপনার কী অবস্থা? আপনি কি সত্যিই সততার সাথে পিটার সাহেবের মতো সত্যটাকে দেখতে চান, বুঝতে চান, মানতে চান? জানতে চান সেই প্রমাণগুলোকে যেগুলো সুনিশ্চিত সত্যটাকে আপনার সামনে উদ্ভাসিত করবে, আর আপনি ভেবে-চিন্তে যাচাই করে নিবেন কথাগুলো সত্য কিনা আসলেই?

যদি তাই হয়, তাহলে পরের লেখাটা পড়বার আমন্ত্রণ রইলো।

হিউমের ভুল

১.

আলোচনার সুবিধার জন্যে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কিছু কথা আরেকটু মনে করিয়ে দিচ্ছি।

"বিশ্বাস করেন, আমি লিখতে পারি না।"

উপরের বাক্যটা নিঃসন্দেহে মিথ্যা। আপনাকে যতোই বুঝাই না কেনো আপনি আমার এই উপরের লেখাটা বিশ্বাস করবেন না।

কেনো?

কারণ, বাক্যটা যে নিজেই নিজেকে মিথ্যে প্রমাণ করছে। এইরকম আরো অনেক কথা বা বাক্য বলা যায়। যেমনঃ

"আমি লিখতে জানি না।"

"আমি বাংলা বুঝি না।"

আমি লিখতে পারি না কথাটা এজন্যেই ভুল, কারণ, কথাটা আমি লিখেছি। যেহেতু আমি লিখেছি কথাটা, তাই "আমি লিখতে পারি না" কথাটা সত্য নয়। শেষের দুইটা বাক্যের জন্যেও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

এই ধরণের কথাবার্তা বা বিবৃতিকে সোজা বাংলায় বলা যায় "আত্মঘাতী বিবৃতি"। যেহেতু, এই কথা বা বিবৃতিগুলো নিজেই নিজের সত্যতার বিপক্ষে জলজ্যান্ত প্রমাণ সেহেতু এই "আত্মঘাতী বিবৃতি" নামকরণ। এই ধরণের কথাবার্তাকে স্ববিরোধী কথাও বলা হয়ে থাকে।

২.

ডেভিড হিউম। ভদ্রলোক একজন দার্শনিক ছিলেন। Atheist আর Agnostic রা উনার নাম জানুক আর না জানুক উনার মতবাদ দ্বারা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুবই মুগ্ধ এবং প্রভাবিত। এই দার্শনিক ছিলেন একজন Empiricist, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাবাদী। তিনি শুধু তাই সত্য বলে বিশ্বাস করতেন যেটা সংজ্ঞা অনুযায়ীই সত্য, অথবা যেটা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটা বা একাধিক ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায়, অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। তার এই মত

অনুযায়ী, যা কিছু সংজ্ঞা অনুযায়ী সত্য নয়, বা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না, তা অবশ্যই বিভ্রান্ত, মিথ্যা, এবং অর্থহীন। এই কারণেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের আইডিয়াও বিভ্রান্ত, মিথ্যা এবং অর্থহীন, ফলে, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কঠিন লাগছে একটু? দাঁড়ান সহজ করে বলি।

তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কোনোকিছুকে অর্থপূর্ণ তথা সত্য হতে হলে নিচের দু'টো শর্তের যেকোনো একটা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই দু'টো শর্তকে বলা হয় The Principle of Empirical Verifiability. শর্ত দু'টো হচ্ছেঃ

১. সত্য বলে যেটাকে দাবী করা হচ্ছে সেটা অবশ্যই গাণিতিক সমীকরণ বা সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হতে হবে। যেমনঃ ১০+২=১২ অথবা প্রতিটি চতুর্ভুজের চারটি বাহু আছে।

অথবা,

২. যেটাকে সত্য বলে দাবী করা হচ্ছে সেটাকে অবশ্যই একটা ইন্দ্রিয় অথবা পাঁচটা ইন্দ্রিয় দ্বারাই পর্যবেক্ষণ কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষাযোগ্য হতে হবে।

উপরের দু'টো দাবীর যেকোনো একটা পূরণ না করতে পারলে তা সত্য নয়।

উপরে বর্ণিত ডেভিড হিউমের দু'টো শর্ত Atheist দের খুবই পছন্দ। তারা এই দু'টো শর্ত কপচে দিয়ে বলে, "অতএব, ঈশ্বর সত্য নয়। তাই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।"

৩.

"আত্মঘাতী বিবৃতি"র কথা মনে আছে?

মনে না থাকলে আরেকবার পড়ে আসুন।

এইবার চিন্তা করে নিজেই বের করে ফেলুন কেনো Atheist (or skeptic, or agnostic) দের সত্য নির্ণয়ের শর্ত দু'টো "আত্মঘাতী বিবৃতি"র পর্যায়ে পড়ে যায়!

নিজে নিজেই বের করে ফেলুন।

এইটুকু মাথা খাটানোর দরকার আছে।

এই লেখার পরবর্তী অংশ আর পড়ার দরকার নেই। বিদায়।

যেহেতু আপনি এই অংশে চলে এসেছেন, এবং লজ্জা লজ্জা মুখে এখনো এই লেখাটা পড়েই যাচ্ছেন, তার মানে দাঁড়াচ্ছে আপনি এখনও নিশ্চিত নন যে হিউম সাহেবের কথাগুলো কেনো "আত্মঘাতী বিবৃতি"র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সত্য নয় তথা নিজেরাই ভুল ।

ঠিক আছে, সমস্যা নেই । আসুন, আলোকিত হই ।

হিউমের দাবী (অর্থাৎ The Principle of Empirical Verifiability) অনুযায়ী কোনো আইডিয়া বা বক্তব্য যদি গাণিতিক সমীকরণ বা সংজ্ঞানুযায়ী সত্য না হয়, অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা না যায়, তাহলে তা অবশ্যই সত্য নয়, অর্থাৎ মিথ্যা! ফলে, সেটা আর বিশ্বাস করবার দরকার নেই ।

যেহেতু The Principle of Empirical Verifiability নিজেই সত্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত নয় (কোনো গাণিতিক সমীকরণ দিয়েও নয়, গাণিতিক সংজ্ঞানুযায়ীও নয়), আবার, ইন্দ্রিয় দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাযোগ্যও নয়, ফলে The Principle of Empirical Verifiability নিজেই সত্য নয়, অর্থাৎ মিথ্যা । ফলে, The Principle of Empirical Verifiability বিশ্বাস করবার দরকার নেই ।

প্রমাণিত ।

["সত্য" অধ্যায়টা থেকে "হিউমের ভুল" পর্যন্ত অধ্যায়গুলো ও I don't have enough faith to be an atheist বইটি হতে সরাসরি অনুপ্রাণিত]

আমি কে? আমি এখানে কেন?

আপনি কি জানেন, মানুষের মস্তিস্কের ক্ষমতা কতটা অসাধারণ?

কতটা অসাধারণ সেটা কিছু সংখ্যা বা তথ্য দিয়ে কিছুটা প্রকাশ করা গেলেও আমাদের পক্ষে তা পুরোপুরি কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই মস্তিস্কের কিছু সীমাবদ্ধতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা চাইলেই সবকিছু ভাবতে পারি না, কল্পনা করে ফেলতে পারি না। আমাদের ভাবনা আর, কল্পনার ক্ষমতাও একটা গন্ডীর ভেতরে থাকে। দাঁড়ান, আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। তাহলে সহজেই বুঝে যাবেন।

আপনি তো ছোটবেলা থেকে অনেক অনেক প্রাণী দেখেছেন, প্রাণীর বর্ণণা পড়েছেন, অনেক প্রাণী সম্পর্কে আপনি জানেন, তাই না? শুধু প্রাণী না, এর পাশাপাশি আপনি আরো অনেক অনেক কিছুই জানেন। এখন আমি যদি আপনাকে বলি, মনে মনে একটা কাল্পনিক প্রাণী বানানতো যেটাতে আমাদের পরিচিত কিছুই থাকবে না! চেষ্টা করুন। যদি সত্যিই মন দিয়ে চেষ্টা করে থাকেন, তাহলে আপনি এতক্ষণে বুঝে গেছেন, এটা সম্ভব না। আমরা কিছু কল্পনা করতে গেলেই, ভাবতে গেলেই, যা জানি তার বাইরে ভাবতে পারি না। নিজের জ্ঞানের গন্ডীর সীমায় আমাদের সবার কল্পনা আর ভাবনার ক্ষমতা সবসময়ই আঁটকে থাকে।

তবে মজার ব্যাপার কি জানেন? আমাদের একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে। তা হলো, আমরা চাইলে এই গন্ডীর সীমানা বাড়াতেই থাকতে পারি। কিভাবে? নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে নতুন জিনিস দেখতে পারি, মানুষের অভিজ্ঞতা শুনে জেনে নিতে পারি, পড়তে পারি। এর মাঝে সবচাইতে বুদ্ধিমানরা করে কি জানেন? তারা পড়ে। কারণ, পড়াটা একদমই সোজা। আমরা চাইলেই এখানে সেখানে চলে যেতে পারি না, কোনো অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে পারি না, কিন্তু আমরা চাইলেই যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময় পড়ে পড়েই অনেক কিছু জেনে ফেলতে পারি। এক জায়গায় বসে থেকে শুধু পড়ার মাধ্যমেই অনেক অনেক জায়গায় ঘুরে আসতে পারি, অনেক মানুষের মজার মজার অভিজ্ঞতা জেনে নিতে পারি, জেনে নিতে পারি হরেক রকমের বিচিত্র মজার ব্যাপার। এতে আমাদের জানার গন্ডী বাড়ে, মস্তিস্কের মাঝে নিউরন কোষগুলোর সজ্জা বদলাতে থাকে, উন্নত হতে থাকে আমাদের চিন্তা আর ভাবনার

গভীরতা।

এতকিছুর পরেও জানো, মানুষ নিজের জ্ঞান আর প্রজ্ঞা দিয়ে ভেবে পায় না, তারা কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে এসেছে? এত অসাধারণ সব প্রাণী, অসাধারণ সব ডিজাইন কোথা থেকে আসলো, কীভাবে আসলো? বাংলা সিনেমায় নায়ক মাথায় বাড়ি খাওয়ার পর যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন মানুষের মাথায় ঘুরতে থাকা সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় কাঁপা কাঁপা গলায়, "আমি কে? আমি এখানে কেন?" আফসোস! নায়কের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মন সিনেমায় আসল উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে একসময় হারিয়ে যায়। তবে মানুষ তো থেমে থাকে না। মানুষ এটা নিয়ে অনেক ভেবেছে। সেই ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে তারা নানা রকম আইডিয়া দাঁড়া করায় প্রথমে। তারপরে সেটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন দেখে একই ব্যাপার বারবার একইরকম ভাবে ঘটছে, তখন তারা সেটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। মানুষের জ্ঞান এভাবেই এগিয়ে যায় সামনে। আমরা এই জ্ঞান আর জ্ঞানার্জন পদ্ধতি সবটুকুকেই একসাথে বিজ্ঞান বলি। একটা আইডিয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেলে, সব বিজ্ঞানী সেটাকে ফ্যাক্ট বা সত্য হিসেবে মেনে নেন। এটাই নিয়ম। আর পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ না হলে, সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝেই অর্থাৎ যারা আসলেই ব্যাপারটার খুঁটিনাটি জানেন, বোঝেন তাঁদের মাঝেই দুটো দল দাঁড়িয়ে যায়। পক্ষে আর বিপক্ষে।

মানুষ কিভাবে এসেছে, বিভিন্ন প্রাণী কিভাবে এসেছে এটার জ্ঞান আর ব্যাখ্যা নিয়ে মানুষ সবসময়েই ভেবে এসেছে। অনেকরকম আইডিয়া তারা দেয়ার চেষ্টা করেছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যেহেতু আদৌ প্রমাণ করতে পারেনি তাই এখনও চেষ্টা করছে। এরকম একটা আইডিয়া ছিলো "বিবর্তনবাদ"। আমরা এই লেখায় বিবর্তনবাদ কি বলতে চায় তা নিয়ে জানার চেষ্টা করবো।

বিবর্তনবাদ মানে কি? বিবর্তনবাদ যা কিছু বলে থাকে তার মাঝে কিছু ব্যাপার নিয়ে একেবারেই তর্ক চলে না। কি কি সেগুলো? যেমন, সব জীবের মাঝেই সময়ের সাথে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে, পরিবেশের বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের সাথে জীব নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে, অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ে জীবের কোষের ভেতরে অবস্থিত জিনের প্রকাশের মাত্রা একেক পপুলেশানে (population) একেকরকম। শুধুমাত্র এটুকুই যদি বিবর্তনবাদের মানে হতো, তাহলে কোনো সমস্যাই ছিলোনা। তাই, আমাদের বাংলাদেশের স্কুলে আর কলেজের বায়োলজির টিচাররা যখন স্টুডেন্টদের বিবর্তনবাদ শেখাতে যান, তাঁরা বিবর্তনবাদের একটি নিষ্পাপ চলচ্চিত্র কোমলমতি স্টুডেন্টদের সামনে তুলে ধরে

বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে জীব সময়ের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। অবশ্যই তোমরা শুনেছ যে ব্যাকটেরিয়া নিজেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের মাঝে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তো ইয়ে মানে, এটাই হচ্ছে গিয়ে বিবর্তনবাদ। বুঝছো সবাই? কে কে বুঝছো হাত তুলো দেখি। আচ্ছা থাক হাত তোলা লাগবে না।"

বিবর্তনবাদ নিয়ে এধরণের বর্ণণা সবার মাঝে একধরণের প্রতিক্রিয়া তৈরী করে এবং বিবর্তনবাদের মাঝে থাকা সত্যিকার সমস্যাগুলো নিয়ে যত রকম বিতর্ক আছে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে এগুলো খুব বেশিক্ষণ ধোপে টিকে না। আসলে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীরা কি চায় জানেন? তারা চায় বিবর্তনবাদের আসল সমস্যাগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে থাকা বিতর্কগুলোকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে। এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা আসলেই বিবর্তনের একটা সুন্দর উদাহরণ। তবে জানেন, এটা এত এত্ত নগন্য আর পিচ্চি একটা পরিবর্তন যে এটাকে বিজ্ঞানীরাই আলাদা করে একটা নাম দিয়ে "অতি ক্ষুদ্র বিবর্তন" বা "মাইক্রো-ইভোলিউশান" (micro-evolution) বলেন। এখানে, মাইক্রো কথাটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক বা "দেখাই যায়না"র সংক্ষিপ্ত রূপ। আপনাকে কেউ কখনো এটা বলে দিবে না যে, বিবর্তনবাদের ইয়া বড় বড় দাবীগুলোর পাশে এই "অতি নগন্য পরিবর্তনের" উদাহরণটা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক।

বিবর্তনবাদের ইয়া বড় বড় দাবী? সেগুলো আবার কি? আসলে বিবর্তনবাদ তো বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি কিভাবে হলো সেটার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে একটা ধারণামাত্র। এই ধারণাটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এমন কিছু আইডিয়া দিতে হবে যেগুলো বলবে, দেখো, এভাবে এভাবেই জীবের উৎপত্তি হতে পারে। সেই আইডিয়াগুলো সন্দেহাতীতভাবে যদি কোনোদিন কেউ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারে, তখনই সব বিজ্ঞানী এই আইডিয়াগুলোকে সত্য বলে মেনে নিবেন। তো, বিবর্তনবাদের দুটো বড় বড় দাবী হচ্ছেঃ

১] আপনি (অর্থাৎ মানবজাতি), ব্যাকটেরিয়া এবং সেইসাথে যতরকমের জীব এই দুনিয়ার বুকে আছে, প্রত্যেকেই অনেক অনেক অতীতের একটা সাধারণ পূর্বপুরুষ (common ancestor) থেকে এসেছেন, এবং

২] ব্যাকটেরিয়াসহ সকল জীব একটা কমন পূর্বপুরুষ বা জীব থেকে এমন একটা পদ্ধতির মাধ্যমে এসেছে, যে পদ্ধতিটা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় শুধুমাত্র "সুযোগ আর প্রয়োজনীয়তা" (Chance and Necessity) দিয়ে। যেহেতু,

সুযোগ আর প্রয়োজনীয়তাই পুরো কাজটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু কোনোরকম বুদ্ধিসম্পন্ন প্ল্যান বা উদ্দেশ্য ছাড়াই সব জীবের উৎপত্তি আর বিকাশ হয়েছে।

বুঝেছেন? না বুঝলে সমস্যা নেই। আমি বুঝিয়ে বলছি।

এই দুইটার মধ্যে প্রথমটা দাবী করছে, প্রকৃতির ইতিহাস নিয়ে এবং এটাই "কমন পূর্বপুরুষ" বা "সব জীবের কমন পূর্বপুরুষ" (Universal Common Ancestry) নামে পরিচিত। এটা দাবী করে যে, বর্তমানে অবস্থিত প্রতিটা জীবের বংশ ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, প্রতিটা জীবের উৎপত্তি হয়েছে একটা কমন পূর্বপুরুষ থেকেই। এর মানে হচ্ছে, আপনার, আপনার চাচাতো ভাই বোন, ফুপাতো ভাই বোন আপনাদের সবার কমন পূর্বপুরুষ হচ্ছেন আপনার দাদাজান, তেমনি দুনিয়ার সব জীবও একজন "দাদাজান" বা পূর্বপুরুষ থেকেই এসেছে।

আর দ্বিতীয়টা কি বলছে বুঝেছেন? এটা বলছে, বিবর্তনে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটা ঘটে সম্পূর্ণভাবে একটা জড় প্রাণহীন বস্তুর সাথে আরেকটা জড় বস্তুর মিথস্ক্রিয়া তথা ইন্টারেকশান অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল মেকানিজমের মাধ্যমে। এটা আরো বলছে, বিবর্তনের জন্যে কোনো বুদ্ধিমত্তার দরকার নেই, কিংবা কোনোরকম প্ল্যান প্রোগ্রাম ছাড়াই সবকিছু নিজে নিজে ঘটে গেছে। এটা আরো একটা কথা বলে। বলে, বুদ্ধিমত্তা বিবর্তনকে পথ দেখায় না, কারণ "বুদ্ধিমত্তা" ব্যাপারটাই এসেছে বিবর্তনের ফসল হিসেবে।

অবাক হচ্ছেন?

শুনুন, বিবর্তনবাদ যদি একটা ঘর হয়, তাহলে বলা যায়, এই দুটো হচ্ছে সেই ঘরের পিলার বা স্তম্ভ। এবং এই দুটো পিলার স্থাপনের কৃতিত্বটা চার্লস ডারউইনকে দেয়া হয়।

চার্লস ডারউইনের কথাকে সহজভাবে বলার চেষ্টা করা যায়। একটা জীবের মাঝে নানারকম বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা থাকে, এটাতো জানেন? সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর এলোমেলো বিচিত্রতা থেকে প্রকৃতি করে কি, শ্রেষ্ঠ আর পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে এরকম একটা বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেয়। এটাকে প্রকৃতির নির্বাচন বা "প্রাকৃতিক নির্বাচন"ও বলে। চার্লস ডারউইন এই প্রক্রিয়ার মাঝে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনকে একদম বাদ দিয়ে দিয়েছেন, এবং এর পরিবর্তে কারণ হিসেবে দাঁড়া করিয়েছেন, "সুযোগ আর প্রয়োজনীয়তা"কে (chance and necessity)।

তাঁর মতে চান্স বা সুযোগ হচ্ছে আসলে একটা জীবের মাঝে বিভিন্ন এলোমেলো

বিচিত্রতা এবং নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনের কাঁচামাল। আর প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে "প্রাকৃতিক নির্বাচন"। অর্থাৎ প্রকৃতি করে কি, জীবের মাঝে থাকা বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যের একটা এলোমেলো বিচিত্রতার (এটাকে আমরা এখন থেকে random variation বলবো) মাঝখান থেকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে দরকারী, এমন একটা বৈশিষ্ট্যকেই বেছে নেয়। নির্বাচন করে। এটাই হচ্ছে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন। উনার মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সবচেয়ে যোগ্যতম বৈশিষ্ট্যের জীবটা প্রকৃতিতে টিকে থাকে (বা নির্বাচিত হয়), বাকিগুলো প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকতে না পারার কারণে।

এটাই হচ্ছে বিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে একটা পূর্বপুরুষ থেকে নতুন নতুন জীবের উৎপত্তি হয়েছে তা নিয়ে ডারউইনের দেয়া আইডিয়া। (১)

রেফারেন্সঃ

(1) Dr. William A. Dembski, Dr. Jonathan Wells, The Design of Life, The meanings of Evolution.

ডিজাইন কি আদর্শ আর নিখুঁত হতেই হবে?

কোনো কিছুকে ডিজাইনড হতে হলে সেই ডিজাইনটা নিখুঁত বা আদর্শ হতে হবে, এরকম ভাবাটা ঠিক নয়। প্রথমত, আদর্শ বা নিখুঁত ব্যাপারটা পুরোপুরি আপেক্ষিক ব্যাপার। একেকজনের কাছে আদর্শ আর নিখুঁত হওয়ার স্ট্যান্ডার্ড একেকরকম। দ্বিতীয়ত, একটা ডিজাইন আদর্শ বা নিখুঁত নাও হতে পারে, তবুও সেটা ডিজাইন। যেমন, আপনার পকেটে থাকা মোবাইলটা ডিজাইন করা হয়েছে, তার মানে এই না যে এটা একটা নিখুঁত বা আদর্শ ডিজাইন। আপনি সবসময়েই অনেক রকম উপায় ভাবতে পারেন যে কিভাবে এই ডিজাইনটাকে আরো আরো উন্নত আর অসাধারণ করা যায়। নোকিয়া লুমিয়া অনেক উন্নত একটা ডিজাইন, তাই না? তার মানে কি এই যে অতি পুরানো আর মান্ধাতা আমলের নোকিয়া ১১০০ ডিজাইন করা হয়নি?

নোকিয়া লুমিয়া

নোকিয়া ১১০

কেউ যদি আপনাকে এসে বলে যে, "দেখুন, অমুক মোবাইলের ডিজাইনটা ভালো না, এরকম অসাধারণ একজন মানুষ এরকম বাজে মোবাইল ডিজাইন করতেই পারেন না। কাজেই এটা উনি ডিজাইন করেন নি, কিংবা কেউই এটা ডিজাইন করেনি অথবা এটা কোনো ডিজাইনই না।" তখন আপনি তর্ক করবেন না। কারণ, তর্ক করে দুটো মানুষের মাঝে শুধু সম্পর্কই খারাপ হয়, কিন্তু কেউ কারো কথা মেনে নেয় না। আরো নতুন যুক্তি শিখে এসে অপর পক্ষকে দেখে নিতে চায়। হারতে চায় না। ফলে, তর্কের ফলাফল কেবল শূন্যই না, বরং নেগেটিভ। এটা জেনে-বুঝেও তারাই তর্ক করতে থাকে যারা বোকা। আপনি তো আর বোকা নন, তাই তর্ক না করে আপনি ভাববেন। শুনেই মেনে নিবেন না।

কারণ, এখনতো আপনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, নিখুঁত হওয়া, বা আদর্শ হওয়া একটা ডিজাইন হওয়ার জন্যে কোনো শর্তই না। একটা ডিজাইন কেমন হবে, বা হওয়া উচিৎ তা শুধুমাত্র ডিজাইনারের চিন্তাভাবনা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদ্দেশ্য আর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

নানান রূপের ইভোলিউশান!

ভাষার মজা এর বৈচিত্র্যে। প্রতিটা ভাষাতেই কিছু শব্দ থাকে যেগুলো একাই নানান অর্থ বহন করতে বেশ দক্ষ। ইংরেজীও এর ব্যতিক্রম নয়। জীববিজ্ঞানের নিজস্ব ভাষার জগতে "Evolution" ঠিক তেমনি একটি শব্দ। এর প্রতিটা অর্থের মাঝেই আলাদা আলাদা মজা লুকিয়ে আছে। সমস্যাটা হচ্ছে, বিভিন্ন অর্থের কারণে এটি মাঝেমাঝে ভয়াবহ কিছু সমস্যারও জন্ম দিয়ে বসতে পারে। সাধারণ বিজ্ঞান জানা মানুষরাতো বটেই, এমনকি সুনির্দিষ্ট সায়েন্সের ফিল্ডে কাজ করা মানুষের পাশাপাশি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে পড়াশোনা করা মানুষও এই নিয়ে খুব বেশি ধারণা রাখেন না আগ্রহ না থাকার ফলে। পরবর্তীতে জীবনের নানা ক্ষেত্রে কিংবা পত্রিকার রিপোর্টের ভুল কোনো প্রতিবেদন পড়েও খুবই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যান এর শব্দার্থের বৈচিত্র্যতার ফাঁদে পড়ে। এই কারণে "ইভোলিউশান" শব্দটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া নিয়ে রাখাটা খুবই দরকার। এই লেখায় "ইভোলিউশান" শব্দটার চারটা প্রাথমিক ব্যবহার নিয়ে বকর বকর করা হবেঃ

#১

ইভোলিউশানের একটা অর্থ হচ্ছে "সময়ের সাথে পরিবর্তন"। ইউনিভার্সিটি অফ বার্কলের ইভোলিউশান ওয়েবপেইজটা ইভোলিউশান থিওরীর ভূমিকা টেনেছে ঠিক এইভাবেঃ

"At the heart of evolutionary theory is the basic idea that life has existed for billions of years and has changed over time."

(http:// evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/lines_01)

"ইভোলিউশানারি তত্ত্বের একদম কেন্দ্রে থাকা চিন্তাটা হচ্ছে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে জীবন অস্তিত্বে ছিলো, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।"

এই ক্ষেত্রে "ইভোলিউশান" কথাটা খুব সাধারণভাবে এটাই বলতে চাইছে যে, আজকের প্রাণীটা নিকট অতীত হতে কিছুটা অন্যরকম। আবার সেই নিকট অতীতের প্রাণীটা আরো অনেক অনেক দূরের অতীত হতে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত। জটিল লাগছে না একটু? দাঁড়ান। ব্যাপারটা 'অতি মাত্রায় সরলীকরণ'

করে বলছি আপনাকে, হ্যাঁ? তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে।

মনে করে দেখুন সেই সময়ের কথা যখন আপনি স্কুলে পড়তেন, ছুটোছুটি করতেন। আপনার সেই সময়ের একটা ছবি হাতে নিন। নিয়েছেন? আর যখন আপনি কুলুমুলু টাইপের কিউট চেহারা নিয়ে মানুষের কোলে কোলে ঘুরতেন আর সুযোগ পেলেই বিছানা বালিশ ভিজিয়ে খিলখিলিয়ে হাসতেন- সেই বয়সের একটা ছবি হাতে নিন। এবার এই দুটো ছবি নিয়ে আপনার বর্তমান ছবিখানা মিলিয়ে দেখুন। কি বুঝলেন? হ্যাঁ, স্কুলে পড়ার সময় আপনার চাঁদবদনখানির সাথে বর্তমানের হাঁড়িমুখটার অনেক পরিবর্তনের পাশাপাশি বেশ কিছু মিল পাওয়া গেলেও, যেখানে সেখানে আর্দ্র পরিবেশ তৈরী করে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতাওয়ালা সেই পিচ্চি আপনার চেহারার পার্থক্যটা বেশ চোখে পড়ছে, তাই না? কি সাইজ ছিলেন, কেমন চেহারা ছিলো, আর এখন কেমন বেঢপ হয়েছেন! এইবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনি এখন বিছানা না ভেজালেও কেন মানুষ আর আপনাকে কোলে নেয়ার কথা কল্পনাতেও আনে না?

এটা তো শুধু একটা প্রাণীর (হ্যাঁ, আপনি একটা প্রাণীইতো) জীবন চলাকালীন সময়ে ঘটা পরিবর্তনের উদাহরণ পেলেন। একইরকমভাবে একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি, যেমন গরু, আম গাছ, হাতি কিংবা মানবজাতির কয়েক লক্ষ বছরের টাইমলাইন ধরে এগুলেও কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ইভোলিউশানের এই অর্থটাতে বিতর্ক নেই এবং এটাকে মোটামুটি ফ্যাক্ট বলা চলে। ফসিল রেকর্ডেও এর বেশ প্রমাণ মেলে।

তবে, কোনো টাইম-স্কেলে এই "পরিবর্তন"টা হয়েছে, সেটা নিয়ে কিছু পাত্তা না দেয়ার মতো তুচ্ছ কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে। ডেটিং টেকনিক অনুযায়ী কোনো ফসিল ঠিক কতো বছরের পুরোনো সেটা হিসেব করে ফেলা যায়। ফসিলগুলোর স্ট্যান্ডার্ড ডেটিং টেকনিকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জীবন শুরু হয়েছিলো আজ হতে প্রায় ৩৫০,০০,০০,০০০ তিনশত পঞ্চাশ কোটি বা সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর আগে।

এরপর, প্রায় ১ বিলিয়ন বছর পরে ইউক্যারিয়টিক কোষ এলো যাদের একটা নিউক্লিয়াস আছে।

প্রায় এক বিলিয়ন বছর আগে বহুকোষী অ্যালজি (algae), যাদের অনেকগুলো কোষ থাকে, তাদের আবির্ভাব হয়।

এর আধা বিলিয়ন বছর পর প্রথম জটিল বহুকোষী প্রাণী (যেমন স্পঞ্জ) দেখা

যায়। এই সময়কালকে প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ড বলা হয়।

এর পরের সময়টা খুবই তাৎপর্য্যময়। ১০ মিলিয়নেরও কম সময়ের মাঝে, হঠাৎ করেই বেশিরভাগ বড় বড় animal phylai বিশাল বিশাল শারীরিক পার্থক্যওয়ালা প্রাণীগুলোর আবির্ভাব হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকেই বলা হয় ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ড। আর বলা নেই, কওয়া নেই, এই সময়টাতে ধড়াস করে হুট করে এত্তগুলো প্রাণীর আবির্ভাবের ঘটনাটাকে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ নামে চিহ্নিত করা হয়।

উল্লেখিত এই সময়কালগুলোর পেছনে বেশ কিছু ভালো প্রমাণাদি রয়েছে, এবং বৈজ্ঞানিক মহলে এই নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই বললেই চলে। কিছু ধর্মে, বিশেষ করে খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষেরা তাদের ধর্মের উপর ভিত্তি করে দাবী করেন যে, পৃথিবী এত পুরোনো নয়, বরং এর যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। উনাদের এই দাবীর পক্ষে প্রমাণ নেই বললেই চলে, এবং বেশিরভাগ প্রমাণই বিলিয়ন বছরের পুরোনো বৃদ্ধতর পৃথিবীর দিকেই নির্দেশ করে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইভোলিউশানের প্রথম অর্থ, যেটা বলছে যে, প্রাণের শুরু হচ্ছে কয়েক বিলিয়ন বছর আগে, এবং সময়ের স্রোতের সাথে এতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, এটা প্রায় বিতর্কমুক্ত একটা দাবী।

#২

ইভোলিউশানের দ্বিতীয় অর্থটা বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে ছোটখাটো পরিবর্তনের দিকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সময়ের সাথে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে ব্যাকটেরিয়া বাবাজীদের ভেতর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়। কিংবা সময়ের সাথে সাথে ফিঞ্চ পাখির চঞ্চুর সাইজে পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। এই ছোটখাটো পরিবর্তনগুলো, যেগুলো কি না আমরা মানুষের মাঝেও পর্যবেক্ষণ করতে পারি, এগুলো হচ্ছে একটা পপুলেশানের মাঝে একটা জিনের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের অনুপাতের মাঝে পরিবর্তনের ফসল।

জিন কি? ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার জীববিজ্ঞানেও আছে নাকি? আরে নাহ! আমাদের কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে না? ওই নিউক্লিয়াসের ভেতরে ডি এন এ নামে সুতার মতো কিছু কেমিক্যালস থাকে। এই বিশাআআআআল সুতার একেকটা অংশকে একেকটা প্রোটিন তৈরী করতে দেখা যায়। একটা প্রোটিন তৈরী করতে সুতার যে অংশটা কাজ করে, ঠিক সে অংশটাকে একটা জিন বলা হয়।
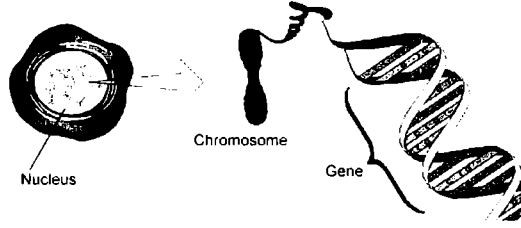
অর্থাৎ ডি এন এ একটা ইয়াআআআ লম্বা সুতা। এই ইয়া লম্বা সুতায় কিছু কিছু অংশ প্রোটিন তৈরী করে। ওই নির্দিষ্ট অংশগুলোকেই বায়োলজির ভাষায় জিন বলে। জিন থেকে তৈরী হওয়া প্রোটিনগুলোই একটা প্রাণীর শরীরের নানান রকম বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যে দায়ী। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকেই ফিনোটাইপ (বা শারীরিক বৈশিষ্ট্য) বলে।
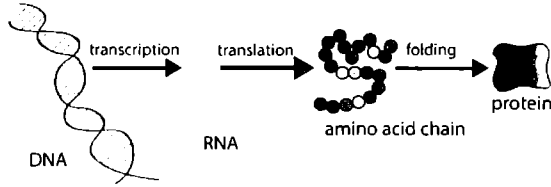
তো, এই একটা পপুলেশানের মাঝে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যর (বা ফিনোটাইপের) জন্যে দায়ী যে জিনটা, তার অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট (বা বিভিন্নতা) থাকে। পপুলেশানের বিভিন্ন জীবের ভেতরে ছোটখাটো পরিবর্তনগুলো এই ভ্যারিয়েন্টগুলোর অনুপাতের কারণে হয়ে থাকে।

এই জিনের মাঝে রাসায়নিক কোনো পরিবর্তন হলে সেটাকে মিউটেশান বলে। ইয়েস, স্পাইডার ম্যান, টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টার্টেল, হাল্ক এদের জিনে মিউটেশান দেখিয়েই কাহিনী ফাঁদা হয় আর কি! এখন খুব মন দিয়ে পড়ুন। একটা প্রজাতির মাঝে পরিবর্তনের কথা বলছিলাম না? মাঝে মাঝে কোনো পপুলেশানের ভেতরে জিনের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন (বা স্পেসিফিক মিউটেশান) ছড়ানোর ফলেও একটা পরিবর্তন আসতে পারে।

তবে এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে। জিনের মাঝে পরিবর্তন বা মিউটেশান বেশির ভাগ সময়েই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এমনকি প্রাণনাশের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর যদি দেখা যায় যে শুধুমাত্র আপনার ভেতরে

একটা স্পেসিফিক মিউটেশান হলো, যেটা আপনার পপুলেশানে আশেপাশে আর কারো মাঝে হয়নি, তাহলে সেই মিউটেশানটা আস্তে আস্তে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে যেতে যেতে ধীরে ধীরে ফ্রিকুয়েন্সি কমে আসবে। এজন্যেই, এই ধরণের পরিবর্তনের জন্যে জিনের ভেতরে মিউটেশানটার ফলাফল এমন হতে হয় যেটা কিনা ওই প্রাণীর জন্যে ক্ষতিকর না হয়ে, বরং খারাপ পরিবেশে টিকে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই মিউটেশানটাকে একটা পপুলেশানের মাঝে ছড়িয়েও থাকতে হয়।

ইভোলিউশানের এই দ্বিতীয় অর্থটাও বিতর্কমুক্ত। কোনো যুক্তিবাদী মানুষ এইরকম ছোটখাটো পরিবর্তন হওয়ার কথা অস্বীকার করতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে ইভোলিউশানের অর্থটা একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে "কমন পূর্বপুরুষ" থাকার কথা ইঙ্গিত করছে।

বুঝিয়ে বলি। মানুষ তো একটা প্রজাতি। আবার গরু একটা প্রজাতি, তিমি মাছ আরেকটা প্রজাতি। যদি শুধু গরুর কথা বলি, তাহলে ইভোলিউশানের এই দ্বিতীয় অর্থ বলছে যে, এই পৃথিবীর বুকে যত গরু আজ উদাস মনে ঘুরে বেড়ায় আর আনমনে ঘাস চিবিয়ে চিবিয়ে হাঁটতে থাকে এদিক সেদিক, তাদের সবার উৎপত্তিটা নির্দিষ্ট পূর্বপুরুষ "গরু" থেকেই। শুরুর এই প্রথম গরুটাকেই বলা যায় গরু নামক প্রজাতিটার "কমন পূর্বপুরুষ"।

ইভোলিউশানের এই দ্বিতীয় অর্থটা বলছে যে, সব প্রজাতিই সেই প্রজাতির কমন পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এসেছে এবং এই আসার সময় প্রজাতিগুলোর মাঝে ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে একই কমন পূর্বপুরুষ গরু হতে আসলেও অস্ট্রেলিয়ান গরুর সাথে ইন্ডিয়ান গরু এবং নিউজিল্যান্ডের গরুর বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

#৩

ইভোলিউশানের ৩ নং অর্থটা হচ্ছে, সব জীব- একেবারে ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মোলাস্কা, পোকা-মাকড়ের ঘর বসতি, গাছপালা, স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর সব্বাই-ই একটা নির্দিষ্ট কমন পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। সোজা ভাষায় ইভোলিউশানের তৃতীয় অর্থটা দাবী করছে যে, আপনি যদি এই গ্রহের প্রতিটা জীবিত প্রাণের আদি উৎস খুঁজে দেখেন, তাহলে দেখবেন প্রতিটা জীবই এসেছে একটা কমন পূর্বপুরুষ থেকে। অর্থাৎ, একটা কমন পুর্বপুরুষ ছিলো শুরুতে। আর কোনো জীব ছিলো না। সেই কমন পূর্বপুরুষটাই পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে হয়ে একেকসময়ে একেকরকম প্রজাতি তৈরী হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীর সকল জীব,

সকল প্রজাতিই, একটা মাত্র কমন পূর্বপুরুষের উত্তরসূরী বলে এই থিওরীটা দাবী করছে, তাই এই থিওরীটাকে "Universal common descent" বলা হয়। আর এটাই হচ্ছে "ইভোলিউশান"এর সবচেয়ে জনপ্রিয় অর্থগুলোর মাঝে একটা। পরিস্কারভাবেই একদম সোজাসাপ্টা বলে দেয়া যায় যে, এই থিওরীটাকে অবজার্ভ করে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এটাকে প্রমাণ করার জন্যে কিছু জীববিজ্ঞানী বেশ কিছু প্রমাণ দাঁড়া করানোর চেষ্টা করলেও এটা এখনও বেশ বিতর্কিত।

#৪

চার্লস ডারউইন একটা মেকানিজমের কথা বলেছিলেন। উনার ভাষায় এই মেকানিজমটা হচ্ছে undirected এবং unguided। উনি বলেছেন যে এই "নির্দেশনাহীন, গাইডবিহীন মেকানিজম"টাই বর্তমান প্রজাতিগুলোর মাঝে পরিবর্তন তৈরি করে। এবং এই পরিবর্তনগুলোই নতুন নতুন সব প্রজাতির জন্ম দেয়। এটাকেই বলা হয় "ডারউইনিয়ান ইভোলিউশান।"

ইভোলিউশান শব্দটার এই চতুর্থ অর্থ কী দাবী করছে, সেটাই এইখানে আস্তে ধীরে ভেঙ্গে বলছি। বুঝে বুঝে এক একটা লাইন পড়ে সামনে আগালে বুঝতে পারবেন। এটা বলছে যে, বর্তমান জীবগুলোর পপুলেশানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, সেই একেকটা বৈশিষ্ট্যের মাঝেই আবার হরেকরকম বৈচিত্র্য আছে। যেমন, আপনার গায়ের রঙ একটা বৈশিষ্ট্য। আপনার সাথে আপনার বন্ধুদের গায়ের রঙের বৈশিষ্ট্যের মাঝে অনেকরকম বৈচিত্র্য দেখতে পান না? তো, একটা পপুলেশানে যে প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য তাদেরকে খারাপ পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্যে, খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্যে সুবিধা দেয়, (সুবিধাওয়ালা বিশিষ্ট বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ধারণকারী) ঐ প্রাণীগুলোই পপুলেশানের অন্যান্য প্রাণীগুলোর চেয়ে বেশি বেশি উৎপন্ন হতে থাকবে। কিভাবে বেশি বেশি উৎপন্ন হবে? জন্মহার বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে।
এই পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়ে ডারউইন বলেছেন যে, প্রকৃতি এইভাবেই ঠিক করে, সিলেকশান বা নির্বাচন করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে, সুবিধা প্রদানকারী ঐ নির্দিষ্ট বৈচিত্র্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে (next generation) ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এই থিওরী বলছে যে, এইভাবেই বিভিন্ন সুবিধা প্রদানকারী বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আস্তে আস্তে জমতে থাকে, প্রজাতির মধ্য জড়ো হতে থাকে সময়ের সাথে সাথে, এবং একসময় নতুন একটা প্রজাতির জন্ম দেয় যা আগের প্রজাতির চেয়ে অবশ্যই আলাদা। ডারউইনের এই থিওরীর আধুনিক ভার্শানটাকে জেনেটিক্সের সাথে একত্রিত করে একটা নতুন রূপ দেয়া হয়েছে, যাকে নিও-ডারউইনিজম বলে ডাকা হয়। বিবর্তনবাদের সমস্যাগুলো কোথায় জানেন? এটি বলতে চায় যে, বিবর্তনের

পুরো ব্যাপারটাই অনিয়ন্ত্রিত, নির্দেশনাবিহীন, গাইডহীন একটা মেকানিজম। নির্দেশনাবিহীন, গাইডহীন এই মেকানিজমের আইডিয়াটাও ইউনিভার্সাল কমন ডিসেন্টের আইডিয়াটার মতোই প্রমাণ করা যায়নি এবং খুবই বিতর্কিত। গাইড ছাড়া, সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ছাড়াই নতুন নতুন জটিল প্রজাতি দূরে থাকুক, নতুন বৈশিষ্ট্য আসাও যুক্তিসঙ্গত নয়, এবং এর পক্ষে বেশ কিছু শক্ত প্রমাণ ইতিমধ্যে দাঁড়া করানোও হয়েছে। আগ্রহীরা Stephen C. Meyer এর Signature In The Cell এবং Darwin's Doubt বই দুটো পড়ে ফেললে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন একেবারে খুঁটিনাটি সহ। প্রাণের মতো জটিল তথ্যসমৃদ্ধ একটা ব্যাপার কখনোই কোন বুদ্ধিমত্তার নির্দেশনা আর গাইড ছাড়াই সময়ের স্রোতে "হয়ে যাওয়া"টা কেনো যুক্তিসঙ্গত নয়, সেটা নিয়েই পরবর্তী লেখাগুলোয় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রিয় লেজ

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে, 'ভাই, কোনো লেজটি আপনার সবচে' প্রিয়?' । আমি নাক-মুখ খিঁচে নির্দ্বিধায় বলে দেবো, 'ব্যাকটেরিয়ার লেজ' । কেন? কারণ, ধরার বুকে এত সহজ-সরল সুন্দরতম লেজ আর দ্বিতীয়টি নেই । আর সহজ-সরলের পাশাপাশি সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা মানুষের চিরন্তন । হুঁহুঁ বাবা! থাকতেই হবে ।

আমি যদিও আদর করে ব্যাকটেরিয়ার লেজ বলছি, বিজ্ঞানীরা কিন্তু এটাকে লেজ বলেননা । সবকিছুতে কঠিন কঠিন নাম না দিলে ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান লাগেনা । তাই বিজ্ঞানীরা একে "ফ্ল্যাজেলা" (একবচনে ফ্ল্যাজেলাম) বলে আমাদের মতো অঘামঘাদের দাঁত ভাঙ্গার পথ খোঁজেন । ফ্ল্যাজেলা আর লেজ যেহেতু একই ব্যাপার, তাই আমরা একে ব্যাকটেরিয়ার লেজ বলেই ডাকবো । দেখি কে কী করতে পারে!

আমরা কমবেশি সবাই জানি ব্যাকটেরিয়া এক ধরণের জীবাণু । এরা দেখতে কেমন? ব্যাকটেরিয়া দেখতে গোলগাপ্পু কিউট হতে পারে, লোহার রডের মতো সোজা হতে পারে আবার সাপের মতো সর্পিলাকারও হতে পারে । [১]

এদের মাঝে কিছু ব্যাকটেরিয়ার লেজ (আসলে ফ্ল্যাজেলা) থাকে । কারো একপাশে একটা লেজ থাকে, কারো বা একগুচ্ছ । কারো কারো দুইপাশেই লেজগুচ্ছ থাকে আবার কেউ কেউ এমন আছে যে সারা শরীর জুড়েই তীব্র লেজের ঘনঘটা । আণুবীক্ষণিক এই ব্যাকটেরিয়ার সুক্ষ্ম লেজগুলো দেখতে অনেকটা চুলের মতো । আর এটাতো সবাই জানিই যে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন কোষ দিয়ে তৈরী হলেও, ব্যাকটেরিয়া শুধু একটামাত্র কোষ দিয়ে তৈরী । তো সেই কোষের দেয়াল ভেদ করে এই লেজ(গুলো) বের হয়ে আসে আর এরাই ব্যাকটেরিয়াকে নড়াচড়া করতে, সাঁতার কেটে সুবিধাজনক জায়গায় যেতে সাহায্য করে । [২]

এই লেজ বড়ই মজার । কত মজার ব্যাপার যে এই লেজের মাঝে লুকানো আছে, তার কিছুটা আজ এখানে পকরপকর করার চেষ্টা করবো ।

খুব ভালোভাবে দেখলে দেখা যায়, ব্যাকটেরিয়ার কোষ ভেদ করে বেরিয়ে আসা এই লেজ আসলে চাবুকের মতো । পরিবেশ থেকে পাওয়া নানান রকম কেমিক্যাল

সিগন্যালে সাড়া দিয়ে এই লেজ করে কি, মোটরের মতো সাঁইসাঁই করে ঘুরে ঘুরে ব্যাকটেরিয়াকে ঠিক জায়গামতো নিয়ে যায়।
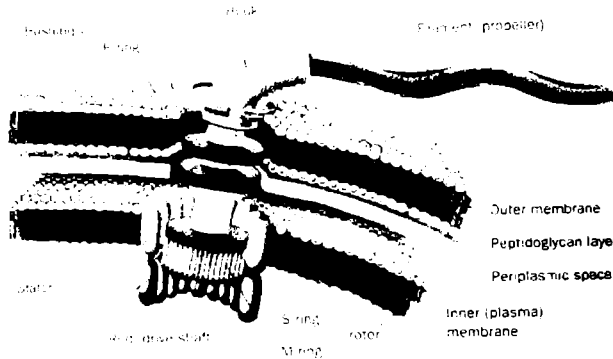
চিত্রঃ ব্যাকটেরিয়ার লেজের সাথে মোটরের মিল

এরকম একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার লেজ চল্লিশটারও বেশি বিভিন্ন রকমের প্রোটিন একত্রিত হয়ে তৈরী হয়। ভাবা যায়? প্রোটিন নিজেই এক অতি জটিল আণুবীক্ষণিক জিনিস। একদম সঠিক সাইজের, সঠিক সজ্জা আর সঠিক গঠনের না হলে, ঠিকভাবে ফোল্ডিং বা ভাঁজ না হলে প্রোটিন নিজেই তার কাজ করতে পারে না, অচল আর চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো ভুল গঠনের, ভুল ফোল্ডিং বা ভাঁজের প্রোটিন জীবদেহের ভয়ংকর অসুখের কারণ হয়, এমনকি একটা ভুল গঠনের প্রোটিন মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণির জীবননাশের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। [৩] যেখানে ঠিকঠাক মতো একটা প্রোটিন তৈরী হওয়াও বেশ জটিল আর সুক্ষ্ম একটা ব্যাপার, সেখানে চল্লিশটারও বেশী ঠিকঠাক প্রোটিন একত্রিত হয়, আবার একত্রিত হয়ে একটা অর্থপূর্ণ মোটরের মত ফাংশানাল লেজ তৈরী করে। ব্যাপারটা কেমন জানি মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো!

মানুষ যে মোটর ডিজাইন করে সেই মোটরে অনেকগুলো জিনিস একসাথে কাজ করে। বিশাল হ্যাপা বলা যায়। সেই মোটরে রোটর থাকতে হয়, স্ট্যাটর থাকতে হয়, ড্রাইভ শ্যাফট থাকতে হয়, বুশিং, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট থাকতে হয়, প্রপেলার থাকতে হয়। শুধু থাকলেই হয় না, সেগুলোকে ঠিক জায়গায়, ঠিক সাইজে সাজানো গুছানো থাকতে হয়। মজার ব্যাপার হলো গিয়ে, ব্যাকটেরিয়ার লেজের গঠনেও ভালোভাবে খেয়াল করলে রোটর, স্ট্যাটর, ড্রাইভ শ্যাফট, প্রপেলার, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট ইত্যাদি পার্টসগুলো খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলো একত্রিত হয়ে

কাজ করে, আর লেজটাকে হুবহু মানুষের বানানো মোটরের মত কাজ করতে, বাঁই বাঁই করে ঘুরতে সাহায্য করে। [৪] আমাদের দেখা ইলেক্ট্রিক্যাল মোটর যেরকম, ব্যাকটেরিয়ার লেজও (ফ্ল্যাজেলা) সেরকম তবে অতি আণুবীক্ষণিক একটা মোটর। যখন ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতরের পর্দা দিয়ে পজিটিভ চার্জের হাইড্রোজেন আয়ন যায় তখন সেটা লেজের ঘূর্ণণের শক্তি যোগায়, ঠিক যেভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ ইলেকট্রিক মোটরকে ঘোরায়। [৫, ৬] যতই এই সহজ সরল লেজ নিয়ে গবেষণা চলছে, ততই এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে বের হয়ে আসছে। [৭, ৮, ৯, ১০]

একটা ইলেট্রিক্যাল মোটর হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে তৈরী হওয়া ডিজাইনের একেবারে নিখুঁত উদাহরণ। একটা মোটরের বিভিন্ন পার্টস দেখলেই বোঝা যায় এর প্রত্যেকটা অংশের পেছনের নিখুঁত চিন্তাভাবনা আর অসাধারণ প্ল্যানিং। আসলে একটা মোটর হচ্ছে একটা আর্ট, শিল্প। থ্রী-ডি আর্ট বা তার চেয়েও বেশি কিছু বলা যায়। যেই থ্রী-ডি আর্টটা একটা অনন্য মাস্টারপীস, একটা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে। এই মাস্টারপীসের মাঝে থাকা এতগুলো উপাদানের প্রত্যেকটা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে আর কার্যকরী হয়, ঘুরতে থাকে। একেবারে প্রত্যেকটা পার্টস তার নিজের জায়গাতে ঠিকভাবে এবং ঠিক সময়ে থাকলেই কেবল একটা যন্ত্র চলতে পারে। একটা অংশও যদি এদিক ওদিক হয় তাহলে পুরো মেশিনটাই অকেজো হয়ে যায়। তাই খুব সাবধানে ঠিক অংশটা ঠিকভাবে তৈরী হতে হয়, সঠিক জায়গায় থাকার জন্যে নিখুঁত আর সুক্ষ্মভাবে প্ল্যানিং করতে হয়, সবকিছু অশেষ যত্ন নিয়ে বুদ্ধি খাঁটিয়ে ডিজাইন করতে হয়। সব যন্ত্রপাতিই পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সূত্রগুলো মেনে চলতে বাধ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সব সূত্র মিলেও কিন্তু একটা যন্ত্র তৈরী করে ফেলতে পারে না, কক্ষণো না। যতক্ষণ না কেউ একজন এসে সবকিছু নিয়ে গভীরভাবে ভেবে, প্ল্যান করে একটা নিখুঁত ডিজাইন করছে, সবকিছু ঠিকঠাকভাবে তৈরী করছে, এবং ঠিকভাবে একটার পাশে একটা বসিয়ে এটাকে চালু করছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মেশিন তৈরী হয় না।

"একটা গাড়ির ইঞ্জিন কোত্থেকে এলো" এই প্রশ্নটাকে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন বা সূত্রাবলী দিয়ে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। মোটর খুবই অসাধারণ আর খুবই জটিল একটা যন্ত্র এবং এর প্রতিটা বৈশিষ্ট্যই এমন ইউনিক যে একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনার ছাড়া একটা মোটর তৈরী হওয়া সম্ভব না। এটা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয়না, কমনসেন্স থাকলেই চলে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মোটর আর যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র গাড়ির ইঞ্জিনের হুডের
ঢাকা থাকে না। জীবের কোষের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যায়, এটা নানা
যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এক অদ্ভুত কর্মব্যস্ত নগরী। বিংশ শতাব্দীর শে
বায়োকেমিস্ট্রির অগ্রযাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, আজ আমরা
পাচ্ছি জীবের ভেতরের অধিকাংশ বায়ো-ক্যামিকেল সিস্টেম এ
মলিকিউলার লেভেলের মেশিন হিসেবেই কাজ করে। হ্যাঁ, একেবারে মে
মতোই! আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই মেশিনগুলোর মাঝে থাকা বে
বায়ো-মলিকিউলার মোটর অদ্ভুতভাবেই মানুষের তৈরী করা ইঞ্জিনের ডিজ
সাথে মিলে যায়। যদিও, এই বায়ো-মেশিনগুলো মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতি
আরো অনেক অনেক বেশি সুক্ষ্ম আর ডিজাইনের দিক থেকেও অসাধারণ।

আজ পর্যন্ত জীব-কোষের ভেতরে আমাদের আবিস্কার করা বায়ো-মেশিন
অতিসুক্ষ্ম আর অত্যন্ত জটিল গঠন, দুর্দান্ত কার্যক্ষমতা, আর অসাধারণ ডিজ
নৈপূন্যতা বারবার ধাক্কা দিয়ে মনে করিয়ে দেয় একজন সুপিরিয়র বিজ্ঞানী
একজন অসাধারণ আর্কিটেক্টের কথা, একজন ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রান্ডমাস্টারে
এবং একজন সুপারস্মার্ট বায়োলজিস্টের কথা।

কি অদ্ভূত! কি অসাধারণ! শুধুমাত্র একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার একটা
লেজের অসাধারণ দোলার জ্ঞানই সচেতন মানুষের উদ্ধত, অহংকারী মাথা

একজন অসাধারণ সত্ত্বার সামনে শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে নত করে মাটিতে লুটিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

রেফারেন্সঃ

1] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 74

2] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 78

3] Nelson and Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 4th edition, 150

4] David F. Blair, "How bacteria sense and swim," Annual review of Microbiology 49 (October 1995): 489-520

5] David F. Blair, "Flagellar movement driven by proton translocation," FEBS Letters 545 (June 12, 2003): 86-95;

6] Christopher V. Gabel and Howard C. Berg, "The speed of the flagellar rotary motor of E. coli varies linearly with protonomotive force," Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 100 (July 22, 2003): 8748-51

7] Scott A. Lloyd et al., "Structure of the C-terminal Domain of FliG, a component of the rotor in the bacterial flagellar motor," Nature 400 (July 29, 1999): 472-75;

8] William S. Ryu et al, "Torque-generating units of the flagellar motor of E. coli have a high duty ratio," Nature 403 (January 27, 2000): 444-47;

9] Fadel A. Sametry et al., "Structure of the bacterial flagellar hook and implication for the molecular universal joint mechanism," Nature 431 (October 28, 2004): 1062-68;

10] Yoshiyuki Sowa et al., "Direct observation of steps in rotation of the bacterial flagellar motor." Nature 437 (October 6, 2005): 916-79

11] Dr. Fazale Rana, The Cell's Design, 69-70

বুদ্ধিমান সত্ত্বা

প্রারম্ভিকাঃ

এই লেখাটাতে সায়েন্সের সাথে আমার, আপনার এবং স্রষ্টার একটা সংযোগ ঘটানো হয়েছে। আমাদের ক্লাসগুলোতে সায়েন্সের গাদা গাদা বোরিং তথ্য দেয়া হয় শুধু, পেছনের দর্শনটা কেউ শেখায় না। আর এটা পড়ার পর হয়তো আপনি নিজে নিজেই বিজ্ঞানের নতুন কিছু জানার সাথে সাথে ভেবে বের করে ফেলতে পারবেন এটার সাথে আপনার সম্পর্কটা কি এবং নিজের জীবনটাকে কিভাবে যাপন করা উচিৎ, সবকিছুর মাঝে একটা সম্পর্ক তৈরী করে ফেলে বেশ মজা পাবেন। তো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যাক।

গোবরনামাঃ

১০০ বছর আগের একটা ফটো সামনে তুলে ধরা হলো। গোবরের ফটো বলে মনে হচ্ছে। দূরে আউট অফ ফোকাসে একটা গোয়াল ঘর, এবং অনেকগুলো গরুও দেখা যাচ্ছে। তাতেই অবশ্য প্রমাণিত হয়ে যায় না যে এটা গোবরের ফটো। যেহেতু এটা অতীতের ঘটনা, এবং ঘটনাটা ঘটার সময়ে আমি সেখানে ছিলাম না, সেহেতু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে এটা “গোবর”। এক্ষেত্রে এখন যে উপাত্তগুলো (Data) আমার কাছে আছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাকে অতীতের সেই ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

আমার সারাজীবনের পর্যবেক্ষণ থেকে যে পরিমাণ উপাত্ত আমার মাথায় জড়ো হয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এটা হাঁস কিংবা বিড়ালের বিষ্ঠা হতেই পারে না। হাতির হওয়াও সম্ভব না। এটা ম্যাচ বাক্স, কম্পিউটার, মানুষ কিংবা টর্চ লাইটের ছবিও না আমি নিশ্চিত। কারণ, এতদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার সাথে মিলছে না। তবে হ্যাঁ, ষাঁড়ের হতে পারে। আবার দূরে যেহেতু গোয়াল ঘর আর গরু দেখা যাচ্ছে তাহলে ওই গরুগুলোরও হতে পারে। তবে রঙ, আকার-আকৃতি দেখে এইটুকু নিশ্চিত যে এটা গরু জাতীয় কোনো নির্লজ্জ প্রাণীরই কুকর্ম!

এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার অতীতে ঐ ঘটনার সময়টাতে উপস্থিত থাকতে হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণও করতে হয়নি। ঘটনাটা যেহেতু অতীতের, ফলে আমি নিজে এক্সপেরিমেন্ট এবং পর্যবেক্ষণ করিনি, এবং তা

সম্ভবও নয়। শুধুমাত্র উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসার এই সায়েন্সটাকে বলা হয় Historical Science, আমি যার বাংলা করেছি "ইতিহাসের বিজ্ঞান"। এই বিজ্ঞানে শুধু Effect (গোবর) দেখেই তার পেছনের আসলে কার্যকারণটা (cause) কী ছিলো সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে চলে আসা যায়। এটাই নিয়ম।

আপনার তিনটা ঘটনাঃ

১ম ঘটনাঃ

আপনার ফোনে লাস্ট যে মেসেজটা এসেছিলো সেটা পড়ে কি মনে হয়েছিলো? মেসেজটাতো পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, নাকি? এটাতো নিশ্চিত যে মেসেজটা আপনাকে এমন একজন পাঠিয়েছে যে পড়তে এবং লিখতে জানে। জানে কিভাবে মেসেজ পাঠাতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটার পেছনে একটা বুদ্ধিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার কোনো সন্দেহ নেই। আপনি বুদ্ধিমান হলে সন্দেহ থাকার কথা না আর কি! হাহাহাঃ

অথচ মেসেজটা একটা ইঁদুর লিখেছে কিনা আপনি দেখেননি। আপনি সেখানে ছিলেন না। পর্যবেক্ষণও করেননি। তবুও আপনি নিশ্চিত এটার (effect) পেছনে কোনো বুদ্ধিমত্তাকে (cause) থাকতেই হবে।

এবার দ্বিতীয়ঃ

আমি যদি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে করতে গলা ফাটিয়ে দিনরাত বলতে থাকি-

"Angry Birds" গেইমসটার পেছনে কোনো বুদ্ধিমান সত্ত্বার হাত নেই, সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতিতে এলোমেলোভাবে (random) নিজে নিজেই এটা তৈরী হয়ে গেছে। শুধু তাই না, যে এন্ড্রয়েড ফোনে গেইমসটা চলছে সেটা স্যামসাং কোম্পানী বানায়নি। বরং সেটাও প্রকৃতিতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর থাকার ফলে তৈরী হয়ে গেছে। এমনকি এর গায়ে খোদাই করা স্যামসাং কথাটাও এইভাবেই এসেছে।

আমি আপনাকে হাজার (কু)যুক্তি দিয়ে বুঝালেও আপনি এটা মেনে নিতে পারবেন না। আমাকে পাগল ভাববেন, ঠিক? কারণ, আপনি জানেন সামান্য স্যামসাং শব্দটাও সময়ের স্রোতে ফোনের গায়ে খোদাই হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মিলিয়ন মিলিয়ন বছরেও না। অসম্ভব। সামান্য ৭টা ইংরেজী অক্ষর যেখানে সময়ের

স্রোতে ফোনের গায়ে খোদাই হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে এন্ড্রয়েড ফোন নিজে নিজে তৈরী হয়ে যাওয়াতো অনেক অনেক দূরের কথা।

আর গেইমসটার পেছনে যে হাজার হাজার লাইনের প্রোগ্রামিং কোড লেখা হয়েছে প্রোগ্রামিং এর ভাষা দিয়ে, এবং সেটা যে অন্ততপক্ষে একজন দক্ষ বুদ্ধিমান প্রোগ্রামার ছাড়া হওয়া কোনোদিনও সম্ভব না, এটাও আপনি ভালোভাবেই জানেন। আমি যতই আউল ফাউল যুক্তি দিই, প্রোবাবিলিটির অংক কষে আপনাকে দেখাই, আপনি যে টলবেন না সেটা আমি নিশ্চিত।

অথচ ফোন কিংবা গেইমসটা প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগে। অতীতে। আপনি নিজের চোখে দেখেননি এটা কিভাবে প্রস্তুত হয়েছে। তবুও আপনি অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত জানেন এই ফোন আর গেইমসের (effect) পেছনে অনেকগুলো বুদ্ধিমত্তার পরিশ্রম (cause) জড়িত।

৩ নং গল্পঃ

আমার বিড়ালটাকে কী-বোর্ডের উপরে ছেড়ে দেয়ায় সে তার উপর কিছুক্ষণ এলোমেলো দৌড়ালো। খটাখট করে অনেক কিছু টাইপ হয়ে গেলো খুলে রাখা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলটাতে। বিড়ালটাকে নামিয়ে ফাইলটাকে “Random” নামে সেইভ করলাম। এবার আমি বিড়াল নিয়ে একটা রচনা লিখলাম টাইপ করে। ফাইলটাকে “Essay” নামে সেইভ করলাম। দুইটা ফাইলেরই সাইজ হলো 50 KB.

এরপর আপনাকে ঘাড় ধরে এনে আমার কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে ফাইল দুটো দেখিয়ে, মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বললাম, “ঠিক করে বল ব্যাটা, কোনো ফাইলটা আমি টাইপ করেছি? এখানে একটা আমার টাইপ করা, আরেকটা আমার বিড়ালের।”

কাঁপা কাঁপা হাতে ফাইল দুটো ওপেন করেই আপনি বুঝে যাবেন “Essay” ফাইলটা আমার টাইপ করা। কেনো? কারণ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্রতিটা অক্ষর সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ লেখা হয়েছে। শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্য সাজানো হয়েছে। বাক্যগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে সেগুলো এক একটা অর্থবোধক অনুচ্ছেদ তৈরী করেছে। সবগুলো অনুচ্ছেদ মিলে একটা রচনা তৈরী করেছে। এটা কোনোভাবেই আমার বিড়ালের পক্ষে করা সম্ভব না। এরকম সাজানো গুছানো রচনার নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিমত্তার হাত রয়েছে। যেহেতু এখানে আপনাকে দেয়া অপশান মাত্র দুইটাঃ আমি আর আমার বিড়াল, সেহেতু আপনি

–'এবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনীতে যা, তুই সেখানে দেখবিঃ তিনি অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাদের সাথে খেয়েছেন, কাজ করেছেন, কত কি। মানে এখন আমি যা যা তোর সাথে করি, অনেকটা সে-রকম। তাই না ?'

আমাদের সবাই মাথা নাড়লাম। রূপমও মাথা নাড়ল।

–'তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঐ আয়াতে 'আউলিয়া' অর্থে আমরা 'বন্ধু' শব্দটা নিতে পারব না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যদি 'আউলিয়া' শব্দটি দ্বারা 'বন্ধু'ই বোঝাতেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই অমুসলিমদের সাথে ওঠা-বসা করতেন না। তাহলে প্রশ্ন এখানে, 'আউলিয়া' শব্দের কোন অর্থ বোঝানো হয়েছে? হ্যাঁ, এখানে 'আউলিয়া' শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে অভিভাবক। আল্লাহ্ আমাদের বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা অমুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না।'

একজন অভিভাবক হলো সে-ই, যে আমাদের যাবতীয় গোপন খবর জানবে, আমাদের শক্তি, আমাদের কৌশল, আমাদের দুর্বলতা জানবে। এখন আল্লাহ্ বলেছেন, অমুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না। মানে, অমুসলিমদের কাছে তোমরা তোমাদের সিক্রেট বলে দিয়ো না। কারণ এতে কোনো এক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে। বিপদ হতে পারে।

–'কী রকম বিপদ?', তারেক জিজ্ঞেস করল।

সাজিদ বলল–'যেমন, ইসলামের প্রথম জিহাদ কোনটি? বদর যুদ্ধ, তাই না ?'

–'হ্যাঁ।', আমি বললাম।

–'সেই যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? মাত্র ৩১৩ জন। আর প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার, তাই তো?'

–'হু।'

–'আর, সেই যুদ্ধের আগে মুসলিমরা যদি অমুসলিমদের কাছে গিয়ে বলতঃ জানো, আমরা না মাত্র ৩১৩ জন নিয়ে তোমাদের সাথে লড়ব। এটা কি ঠিক হতো? নাহ, হতো না। এই তথ্য ফাঁস হলে কি হতো? প্রতিপক্ষের মনে সাহস বেড়ে যেত। তারা যুদ্ধে শারীরিকভাবে জেতার আগেই মনস্তাত্ত্বিকভাবে জিতে যেত। এটা কি শুভ হতো? আজকের দিনে কোনো দেশ কি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে? আমেরিকা কি তার সামরিক শক্তির কথা চীন বা রাশিয়ার কাছে শেয়ার করে? করে না। ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ও বলছেনঃ 'ওদের তোমরা অভিভাবক হিসেবে নিও না।'

fertilization থেকে। এই কোষগুলোতে ছিলো ডি এন এ, যাতে লেখা Genetic Code অনুযায়ী পরবর্তীতে টিস্যু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তৈরী হয়েছে। সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে এক একটা সিস্টেম বা তন্ত্র তৈরী করেছে যেমন নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তথা পরিপাকতন্ত্র, ইউরিনারী সিস্টেম অর্থাৎ রেচনতন্ত্র ইত্যাদি। সবগুলো সিস্টেম আবার একত্রিত হয়ে একসাথে অর্থপূর্ণভাবে কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করার ফলেই তৈরী হয়েছে আমার পুরো শরীর। এই শরীরটা ব্যবহার করে আমি এখন লিখছি আর আপনি পড়ছেন।

এই যে ডি এন এ তে Genetic Code লেখা আছে, যেটা আমার শরীরের গঠন কেমন হবে না হবে তার পুরোটাই ঠিক করে দিচ্ছে এটা কি প্রথম কোষটাতে এমনি এমনি চলে এসেছে? অর্থবোধক একটা মেসেজ, একটা প্রোগ্রামিং কোড এবং একটা গোছানো রচনা নিজে নিজে আসতে পারে না এটা আপনি জানেন। ডি এন এ কিন্তু প্রোগ্রামিং কোডের মতোই Genetic Code বহন করে। বহন করে অর্থপূর্ণ মেসেজ, যে মেসেজ বলে দেয় একটা শরীর কিভাবে রচিত হবে।

একটা প্রাণীর শরীর তো অনেক অনেক জটিল ব্যাপার। সেটার কথা বাদ দিয়ে যদি তার ভেতরে থাকা ডি এন এর ভাষা, সজ্জা এবং অর্থবহতার দিকে তাকাই তাহলে এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, অবশ্যই অবশ্যই এর পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বা (Intelligence) রয়েছেন।

সেই বুদ্ধিমান সত্ত্বা কিন্তু নিজেকে সবকিছুর স্রষ্টা দাবী করে আরো একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন আমাদের ম্যানুয়াল হিসেবে। চলার পথ হিসেবে। জীবনকে যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে। সেই পদ্ধতি যে শুধু থিওরিটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যালও, সেটারও প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহকের মাধ্যমে।

আচ্ছা, এবার নিজেকে একটা প্রশ্ন করি।

আমরা সেই মেসেজ অনুযায়ী পুরো জীবনটাকে যাপন করছিতো?

ইজাজুল কুরআন

আজ কিছু তথ্য শেয়ার করবো। আপনি কুরআন নিয়ে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকলে তথ্যগুলো অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে আপনার সামনে আগেও এসেছে। তবে আমি আজ যেটা শেয়ার করবো সেটা শুধুই তথ্য নয়, তথ্যের চাইতেও বেশি কিছু, যাকে আরবীতে ইজাজ বলা হয়। ইজাজ হচ্ছে এমন কিছু যা আপনাকে হতভম্ব করে দেয়। একটা এক্সাম্পল দিই।

ধরে নিচ্ছি, আপনি কানে হেডফোন লাগিয়ে লাউড সাউন্ডে মিউজিকে বুঁদ হয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। যদিও আপনি পরিস্কারভাবে জানেন মিউজিক শোনা ঠিক না, এটা অন্তরের জন্যে খুবই খুবই ক্ষতিকর, এটা আপনার মহামূল্যবান অন্তরকে অত্যন্ত সুন্দর উপায়ে আজেবাজে ইসলাম বিরোধী মেসেজ দিয়ে, এমনকি শিরকি মেসেজ দিয়ে দিয়ে আপনাকে আস্তে আস্তে এমনভাবে কলুষিত করে দেয় যে আপনি বুঝতেও পারেন না। যাহোক, সব জেনেশুনেও আপনি এখনো ছেড়ে দিতে পারেননি, তবে আজ বা কাল নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন, তাওবা করে ফিরে আসবেন।

তো আপনি মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ব্যস্ত সড়ক পার হচ্ছেন। ডান দিক ধেয়ে আসা ট্রাকের তীব্র হর্ণ আপনি শুনতে পাননি, খেয়ালও করেননি। ঠিক এক ফুট দূরত্বে যখন ট্রাকটা চলে এলো তখনই টাইম স্লো হয়ে গেলো। আপনার মাথা ধীরে ধীরে ডানদিকে ঘুরে ট্রাকটাকে দেখতে লাগলো, ঠিক একই সাথে আপনার চোখ দুটো বিস্ময় আর ভয়ে বড় বড় হয়ে যেতে থাকলো।

এবং এই সময়টাতেই আপনার পুরো শরীর, হাঁটুর জয়েন্ট আর পা দুটো এমনভাবে জমে গেলো যে আপনি আর নড়তে পারছেন না। আপনার মুখ ধীরে ধীরে হা হয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড হতবাক হয়ে বুঝতে পারছেন যে এখন যা ঘটছে এর চেয়ে অবশ্যম্ভাবী আর কিছু নেই, এবং এখনই আপনি টম এন্ড জেরী কার্টুনের টমের মতো চ্যাপ্টা রুটি হয়ে যাবেন। যা আপনাকে বুঝিয়ে দেয় যে এটা obvious এবং এই অবভিয়াস ঘটনাটার বিস্ময় যখন আপনার উপর পুরোপুরি ভর করে আপনাকে নিশ্চল করে দেয় তখন সেই ঘটনাকে আরবীতে ইজাজ বলে। ক্লিয়ার?

আজকের লেখাটার প্রভাব পুরোপুরি আপনার বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার আর কল্পনার

ক্ষমতা কতটা তীব্র তার উপর নির্ভর করছে। আমি কেবল কিছু তথ্য আপনাকে

দেবো, সেই তথ্যগুলো কতটা অসাধারণ তা নিয়ে ভাবনা আর কল্পনায় ডুবতে আমি হয়তো ১% হেল্প করতে পারবো, বাকি ৯৯% নির্ভর করবে আপনার মাথা খাটানোর ক্ষমতার উপর। যেহেতু আপনার একটি মাথা আছে, তার ভিতরে গ্রে ম্যাটার, হোয়াইট ম্যাটার সহ একটা ব্রেনও আছে নিশ্চিত। আশা করি, এই ব্রেইনটা আপনি এতদিন ইউজ করে এসেছেন, ফলে এটা পুরোপুরি নিস্তেজ আর অন্ধকার হয়ে যায়নি। অনেকক্ষণ মজা করলাম। এখন ঢুকে পড়া যাক।

একটা হাতঘড়ি আর ক্যালেন্ডার কল্পনা করুন।

হ্যাঁ, আমি যাই বলবো এখন থেকে তা আপনাকে পরিস্কারভাবে কল্পনা করতে হবে। কল্পনাটা শুরু হবে রঙিন দিয়ে। শেষ হবে সাদাকালো তে। হাতঘড়িটার কথা ভাবুন। খেয়াল করুন (কল্পনাতেই) কয়টা বাজে? ক্যালেন্ডারের দিকে তাকান। তারিখ দেখুন আজকের। হঠাৎ কিছু একটা ঘটায় আপনার ঘড়ির কাঁটা স্লোলি উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করলো। ঘুরছে। ঘুরছেই। ঘোরার গতি বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ফ্যানের মতো ঘুরতে লাগলো। ক্যালেন্ডারের পাতাও উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে। আপনার চারপাশের দৃশ্যগুলোও বদলে যেতে লাগলো। সাঁই সাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মরুভূমিময় এক জায়গায় এসে আপনি স্থির হলেন। চারপাশের সব সাদা কালো। এবার আমি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলে যাবো। আপনি সেগুলো নিজের চোখে দেখছেন, সেভাবে কল্পনা করে নেবেন।

মুহাম্মাদ নামে অসাধারণ গুণাবলীর এক মানুষ এখানে বাস করেন। সবাই তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর জন্যে তাঁকে এক নামে চিনে। তাঁর সত্যবাদীতা, দয়াবান চরিত্র আর ন্যায়পরায়ণতার জন্যে সবাই তাঁকে ভালোবাসে। সবাই মানে কারা? মাক্কার লোকেরা। এরা খুবই খারাপ টাইপের মানুষ। এরা কন্যা সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলে, দূর্নীতি করে, হত্যা রাহাজানি আর অশ্লীলতায় এদের জুড়ি নেই। সুদ, মাদক, অসততা, অশ্লীল মিউজিক, নারী, বয়ফ্রেন্ড গালফ্রেন্ড, পরকীয়া নামের নানান রকম ব্যভিচারে সবাই লিপ্ত, এবং এটাই এখানকার স্বাভাবিকতা। একেকজন গোত্রের নেতাকে বলা যায় একেকজন মাফিয়ার ডন। নারীরা খারাপভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় কারো ঘরে মেয়ে শিশুর জন্মানোটা তার ভবিষ্যত সম্মানের পরিপন্থী ছিলো, এবং সেটা ভেবে তারা নিজের মেয়েকে মাটিতে পুঁতে ফেলতো জীবন্ত! ভাবা যায়? কল্পনা করুন সেই শিশুটির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা কষ্ট, অনুভব করুন পৃথিবীর আলোতে না আসতেই দুনিয়ার মানুষের বানানো

নিয়ম কানুনের তীব্র অত্যাচার তার ফুসফুসকে আঁটকে দিচ্ছে। কল্পনা করুন মানুষগুলোকে। যারা নারীকে শুধু উপভোগ করে, মাংসের পুতুল ভাবে। পশুর মত

তাকিয়ে থাকে যেখানেই দেখে। নারীদের কথা ভাবুন, যারা নিজেকে ঢেকে না চলে রূপ সৌন্দর্য দেখানোর জন্যে এমন ভাবে পোষাক পরতো যাতে তাকে সবাই সুন্দর বলে, আকৃষ্ট হয়। এরকম বুদ্ধি-বিবেকহীন পশুর মতো জীবন যাপন করতো তারা। সুদের কারবার করতো, গরীবরা হতো শোষিত, নির্যাতিত। মদ-মাদকে লিপ্ত একটা ড্রাগ এডিক্টেড জাতি ছিলো তারা। মোট কথা, সব দিক দিয়েই তারা ছিলো নিকৃষ্ট মানের ও মননের মানুষ। এই খারাপ মানুষের ভীড়ে একজন ছিলো আলোর ছটার মতন। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ।

এই লোকটি এতই অসাধারণ ছিলেন গুণেমানে যে সবাই তাঁকে সত্যবাদী বলে জানতো। তিনি কোনোদিন মিথ্যে কথা বলেননি। এটা সবাই জানতো। শারিরীক সুস্থতায় আর সৌন্দর্যে এই মানুষটা ছিলেন অনন্য। এক গাঁদা খারাপ মানুষের মাঝে যদি কাউকে বিশ্বাস করা যায় নির্দ্বিধায়, তো সেই মানুষটাই ছিলেন মুহাম্মাদ। কেউ কোনো ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখতে কাউকে বিশ্বাস করতে পারতোনা, কারণ সবাই খুবই খারাপ ছিলো। তবে মুহাম্মাদকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায়। কিছু গচ্ছিত রাখতে তাই সবাই মুহাম্মাদকেই খুঁজতো। একটা সমস্যা হয়েছে। কেউ সমাধান করতে পারছেনা। ন্যায়নিষ্ঠ আর বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান কে দিতে পারে? কে এমন আছে যে যার বুদ্ধিমত্তা আর ন্যায়পরায়ণতা থেকে আসা সিদ্ধান্ত এক বাক্যে মেনে নেয়া যায়। ইয়েস। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। এই অসাধারণ মানুষটা এই সব অসাধারণ গুণাবলী নিয়েই ছোট থেকে এখানে বেড়ে উঠেছেন। সবাই তাঁকে এক নামে চিনে তাঁর অসাধারণ সত্যবাদীতা, সত্যের সাথে আপোষহীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা আর সুন্দরতম চরিত্রের জন্যে।

মানুষটার বয়স চল্লিশ হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে মনোনীত করলেন নাবী হিসেবে, সমগ্র মানবজাতির জন্যে মেসেঞ্জার হিসেবে। এর আগে মানবজাতির এক এক জাতিকে এক এক সময়ে তিনি অন্যান্য নাবী-রাসুল (মেসেঞ্জার) পাঠিয়ে পাঠিয়ে পথ দেখিয়েছেন। তাদেরকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়েছেন নিজের বাণী আর মেসেঞ্জারের মাধ্যমে, যাতে মানুষ ভুল পথে না চলে যায়, ঠিক থাকে, পুরস্কারপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আস্তে আস্তে মানুষের সময়োপযোগী মেসেজ পাঠাতে পাঠাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন "চুড়ান্ত আর পরিপূর্ণ" মেসেজ পাঠানোর, কারণ মানুষ এখন জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় এই চুড়ান্ত আর

পরিপূর্ণ গাইডেন্সটা বোঝার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছে। ক্লাস ওয়ানের বাচ্চাকে ক্লাস নাইনের বইতো আর দেয়া যায়না। ধীরে ধীরে একটা একটা ক্লাস

শেষ করে যখন সে ক্লাস এইট পাশ করে তখনই তাঁকে ক্লাস নাইনের বই দেয়া হয়। সে পড়ে, চেষ্টা করে তখন তা বুঝতে পারে। চূড়ান্ত এই গাইডেন্স পাঠানোর জন্যে তিনি সিলেক্ট করলেন পৃথিবীর বুকে এযাবৎ আসা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অসাধারণ মানুষটিকে। তাঁর কাছে নিজের ফেরেশতার মাধ্যমে মেসেজ পাঠালেন। বুঝিয়ে দিলেন, আল্লাহ এক। উপাসনা শুধু এই এক আল্লাহরই জন্যে হতে হবে আর কারো জন্যে নয়। এবং এই মেসেজ আর চূড়ান্ত-পরিপূর্ণ গাইডেন্স সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

অসাধারণ মানুষটা প্রচন্ড ভয় পেলেন। কি হচ্ছে এসব? তাঁর স্ত্রী তাঁকে অভয় দিলেন। তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর কথা বলে দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে তাঁর মতো ভালো একটা মানুষের সাথে কক্ষনো খারাপ কিছু ঘটতে পারেনা। এবং নিজে সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নাবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর মেসেঞ্জার হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, এবং আল্লাহর এককত্বের ঘোষণা দিলেন নির্দ্বিধায়। চূড়ান্ত ঐশীবাণীকে মেনে নেয়া অসাধারণ আলোকজ্জ্বল সাহসী মানুষের মিছিলে সবার আগে, সর্বপ্রথমে কে ছিলেন? ছিলেন একজন নারী। একজন মহিয়সী নারী। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। নারী আবারো প্রমাণ দিলো যে সত্যের পথে হাঁটায় তাঁদের সাহসিকতার জুড়ি নেই। আলোর যাত্রা শুরু হলো।

মাক্কার মানুষ উনাকে প্রথমেই মেনে নিলো না। ওরা ভাবলো,

"আরে আমাদের সাথে, আমাদের মাঝেই বেড়ে ওঠা একজন ব্যবসায়ী একদিন এসে আমাদের বলছে যে, আল্লাহ তাঁকে রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহর মেসেজ আসে, এবং তিনি আমাদেরকে সেই মেসেজ পৌঁছে দিচ্ছেন! আর আমাদের বাপ দাদার পূজা অর্চনা, এতদিন যে অন্যায় অত্যাচার আর দূর্নীতি করতাম, সেই সব কিছুর জীবন বাদ দিয়ে এখন তাঁর কথা মেনে নিতে হবে? অসম্ভব। ওকে থামাও। ওকে থামাতেই হবে।"

কিন্তু তিনি থামলেন না। মানুষকে সেই মেসেজ শোনাতে লাগলেন। আল্লাহর একজন সম্মানিত ফেরেশতা এসে তাঁকে মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন আল্লাহর বাণী, আর তিনি তা মুখে মুখে শিখে নিয়ে মানুষকে গিয়ে বলতেন। মানুষ তাজ্জব হয়ে সেই বাণী শুনতো আর কেঁদে ফেলতো ঝরঝর করে। কল্পনা করতে পারছেন? আরবের মানুষের একটা অসাধারণত্ব ছিলো। ভাষা। আরবী ভাষা। বিশুদ্ধ আরবী

ভাষা। আরবের লোকেরা কথায় কথায় কবিতা বানাতো। আরবীতে তাদের চেয়ে দক্ষ আর কেউ ছিলোনা। একজন কবিকে তারা খুবই সম্মান করতো। অন্যদিকে

কবি নয় এবং একজন অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষের মুখ দিয়ে এমন কথা বের হচ্ছে যার শক্তিতে আরবের ভাষা নিয়ে খেলা করা, কথায় কথায় কবিতা তৈরী করা মানুষরা মুগ্ধ হয়ে, নাড়া খেয়ে বলতো, "এই কথা মানুষের কাছ থেকে আসা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এই কথা অন্যজগত থেকে এসেছে।" আর এই বলে তারা আল্লাহর এককত্ব আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসুল হিসেবে মেনে নিতো।

তবে অনেকেই মেনে নেয়নি। তাঁরা বুঝতে পারছিলো, এই মেসেজ ছড়িয়ে গেলে এর সত্য মানুষ জেনে যাবেই, সত্যের পথে এসে যাবেই। ফলে, ওদের সব দূর্নীতি, অন্যায়, অত্যাচার আর অশ্লীলতার জীবনব্যবস্থা ধসে পড়বে। উনাকে থামানোর জন্যে তাই ওরা একটা প্রস্তাব নিয়ে গেলো। প্রস্তাব দিলো,

১. তাঁকে ধন সম্পদ দিয়ে ধনী করে দেওয়ার।

২. আরবের সুন্দরী মেয়েদের এনে দেওয়ার।

৩. গোত্রের প্রধান হিসেবে ক্ষমতা দেওয়ার।

কিন্তু তিনি তো সত্যের প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর একমাত্র প্রভুর কাছ থেকে। তিনি তো আর ভন্ড নন, বা কোনোকিছুর লোভে এই চরম দুঃসহ কষ্টের জীবন বেছে নেননি। তাই তিনি সরে দাঁড়ালেন না। আজীবন সত্যের সাথে আপোষহীন, ন্যায়বান এই মানুষটা তা কেন করবেন? তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ওদের বলে দিলেন যে, তাঁর হাতে এক হাতে চাঁদ আর এক হাতে সূর্য এনে দেয়া হলেও কেউ তাঁকে সত্যের প্রচার থেকে থামাতে পারবে না। নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো ওরা।

এর পরে উনার মুখে আল্লাহর বাণী শুনে সত্যকে স্বীকার করে নেয়া মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় ওরা বলাবলি করতে লাগলো যে নিশ্চয় সে পাগল, নয় তাঁকে জিনে ধরেছে, নয়তো সে জাদুকর। এই কথাগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করুন। ওরা উনাকে যা যা অপবাদ দিচ্ছিলো সেগুলো নিজেরাই কিন্তু উনার মুখে উচ্চারিত আল্লাহর অসাধারণ বাণীগুলোর অসাধারণত্ব ঘোষণা করছিলো। ওদের অপবাদ থেকেই বুঝা যাচ্ছিলো যে,

উনি যা বলতেন তা কোনো মানুষের পক্ষে বলা বা তৈরী করা অসম্ভব ব্যাপার।

এরকম অসাধারণ কথা কোনো সাধারণ মানুষ বলতে পারেনা, সম্ভব না। ভাষার উৎকর্ষতার শীর্ষে থাকা মানুষগুলোর এই অপবাদগুলোও আল্লাহর বাণীর অসাধারণত্বের সাক্ষী।

ওরা উনাকে পাগল আর জিনে পাওয়া বলেছিলো। অথচ উনার বংশে, এমনকি উনার চল্লিশ বছরের জীবনে উনার সুস্থতা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি। কেউ কিন্তু একবারো বলেনি উনি এগুলো কপি করেছেন বা শুনে এসে বলেছেন। কারণ, বাণীগুলোর তথ্য এর আগে আসা বাণীগুলোর থেকে তথ্যের দিক দিয়ে সঠিক এবং ভিন্ন ছিলো, যেহেতু এর আগের সবগুলো বাণীই মানুষ অসততার কারণে বদলে নিয়েছে। সেগুলো ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক করে নেয়া এই অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর মানুষটির পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিলোনা। কোথাও থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে তথ্য সংগ্রহ করাও তাঁর জন্যে অসম্ভব ছিলো, কারণ তিনিতো পড়তেই জানতেন না।

সবচেয়ে অসাধারণ অপবাদ ছিলো, তাঁকে ম্যাজিশিয়ান বা জাদুকর ডাকা। আমরা ম্যাজিক চোখে দেখি। যখন কোনোকিছু চোখের সামনে ঘটতে দেখে বুঝে যাই যে এই ঘটনাটা অসাধারণ, অতুলনীয়, ব্যাখ্যার বাইরের একটা ঘটনা এটা, তখনই আমরা বলি, "ওয়াও, এটাতো পুরাই ম্যাজিক!" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদের কোনো ম্যাজিক দেখাননি। তিনি শুধু আল্লাহর কাছ থেকে ফেরেশতার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে আসতে থাকা বাণীগুলো তাদের সামনে বলতেন, আর ওরা শুধু শুনতো। কোনো কথা শুনেই সেটাকে "ম্যাজিক" বলতে হলে সেই কথাগুলোকে কতটা অসাধারণ আর ব্যাখ্যার বাইরের হতে হলে সেটাকে কতটা অসাধারণ হতে হয় তা কি আমরা কল্পনা করতে পারছি? তাই উনাকে ম্যাজিশিয়ান বলে ডেকে ওরা আসলে আল্লাহর বাণী যে কত্ত অসাধারণ সেই ঘোষণাই দিয়ে বেড়াতো নিজের অজান্তেই।

মজা না?

ধীরে ধীরে সত্যকে স্বীকার করে নেয়া মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলো, যারা আল্লাহর বাণী মেনে নিতো, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করতো পুরোপুরি। নিজের জীবনে শান্তির (আরবীতে ইসলাম) এই গাইডলাইন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া মানুষগুলো হচ্ছে মুসলিম, যারা ইসলামকে নিজের জীবনে মেনে নিয়েছে পরিপূর্ণভাবে, ঠিক যেভাবে এসেছে সেইভাবে। এই মানুষগুলো ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সার্বক্ষণিক সাথী (আরবীতে সাহাবী)। সাহাবীরা যখন আল্লাহর বাণীর কথা

শুনতেন, বা বলতেন বা মনে করতেন তখন তাদের চোখে একজনের মুখই ভেসে উঠতো। তা ছিলো, আমাদের প্রিয় নাবীর পবিত্র মুখ। তাঁরা আল্লাহর বাণীকে বই হিসেবে দেখেননি আমাদের মতো, তাই তাদের চোখে কোনো বই ভেসে উঠতো না। তাঁরা আল্লাহর বাণী শুনতেন নাবিজীর কাছ থেকে, তাই

নাবিজী আর আল্লাহর বাণী তাদের কাছে ছিলো অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা কোথাও থেকে পড়ে আল্লাহর বাণী শিখতেন না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেই শিখে ফেলতেন। এটার একটা খুব বড় আর গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য রয়েছে। খুব ভালো করে খেয়াল করুন এখন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আল্লাহর বাণী বলতেন তখন সাহাবীরা তা শুনেই শিখে নিতেন। তাঁর মানে একবার একটা বাণী বলে দিয়ে সেটাকে সম্পাদনা করার বা ঠিক করার কোনো প্রশ্নই আসেনা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যখন কথা বলি, তখন তা ভাষাগত দিক থেকে নিখুঁতভাবে ঠিক থাকে না, অর্থগত দিক থেকে অনেক ভুলত্রুটি থাকে, অনেকবার আমরা "আমম্মম-উমমম, ইয়ে, মানে" বলি, ঠিক? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহর বাণী বলতেন, তখন তা কিন্তু মুখেই বলতেন, এবং বাকিরা সবাই তা সাথে সাথে ঠোঁটস্থ মুখস্থ করে ফেলতো। তাই ভবিষ্যতে আর কোনোরকম বিকৃতি বা পরিবর্তন সাধিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না, এবং এখন পর্যন্ত এই মুখস্থ করে ফেলার ট্রেডিশানের কারণে তা অবিকৃতই আছে। ২৩ বছরে সবগুলো বাণী পরিপূর্ণভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পর সেগুলো একসাথে লিখা হয়, এবং আমরা সর্বপ্রথম বই আকারে পূর্ণাংগ পবিত্র আল-কুরান পাই আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সাজাতে, পরিচালনা করতে এবং এর মেসেজগুলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে। সমগ্র জগত জুড়ে যেসব বুদ্ধিমান আর সাহসী মানুষেরা আল্লাহর পাঠানো বাণীর সত্যতা জেনে, মেনে নিয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজিয়েছে, সেই মুসলিমদের অনেকেরই পবিত্র কুরআনের সবগুলো বাণী, অক্ষরে অক্ষরে ঠোঁটস্থ মুখস্থ। তাই আপনি কোনো পরিবর্তন করে আনলেই, তা অক্ষরে অক্ষরে ধরা খেয়ে যাবে। আর এই দুনিয়ার প্রতিটা মুসলিমই এই ১১৪টা সুরার (আমরা চ্যাপ্টার বলিনা, সুরা বলি) মাঝে ১০-২০টা সুরা মুখস্থ জানে। হ্যাঁ। সবাই জানে। বিশ্বাস হয়? এমন কোনো অসাধারণ আর মর্যাদাবান বই দুনিয়ার বুকে আসেনি, আর আসবেও না।

আজকের এই যুগে কুরআন পড়া কোনো ব্যাপারই না। ঠিক? গুগলে সার্চ দিলেই আপনি সুন্দর সুন্দর অনুবাদ পেয়ে যাবেন। যদিও আমাদের মনে রাখতে হবে, অনুবাদ মানুষের ভাষা। অনুবাদের শব্দ, ভাষা এই সবগুলো মানুষের সিলেক্ট

করা। আর তাই কুরআনের ভাষার অসাধারণত্ব অনুবাদে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়না। যাই হোক, আপনি চাইলেই দুইশ টাকা দিয়ে মার্কেট থেকে সুন্দর কুরআনের অনুবাদ কিনে আনতে পারেন। বা গুগলে সার্চ দিয়েই M. A. S. Abdel Haleem এর অসাধারণ ইংরেজী অনুবাদ The Quran এর ফ্রী পিডিএফ নামিয়ে পড়ে নিতে পারেন। এটা নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। বের করতে পারেন, এতে কয়টা আয়াত (আয়াত মানে সিগনেচার, বা চিহ্ন। কুরআনে ৬ হাজারেরও বেশি আয়াত রয়েছে), কয়টা শব্দ আছে বা কয়টা অক্ষর আছে। কম্পিউটার আর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এই বিশাল শব্দের কালেকশানে কোনো শব্দ কয়বার আছে, কোনো শব্দ কোনো পজিশানে আছে, কোন শব্দের অর্থ কী, কোন শব্দে কয়টা অক্ষর, কোন শব্দের কয়রকম অর্থ, কোন আয়াতে কোন শব্দ ঠিক কী অর্থ করছে, কেনো এরকম অর্থ করছে এই সবগুলো সব এখন আপনার কাছ থেকে শুধু কয়েকটা ক্লিকের দুরত্বে আছে। ঠিক না? কিন্তু আজ হতে দেড় হাজার বছর আগে এগুলোর কিছুই ছিলো না। আর তাই এগুলোর কিছু করা ছিলো পুরোপুরি অসম্ভব।

পবিত্র আল-কুরআন সাইনের (অর্থাৎ আয়াতের) বই, সিগনেচারের বই, সায়েন্সের (Science) এর বই না। এতে ভাষাগত সাইন আছে, ইতিহাসগত সাইন আছে, প্রজ্ঞার সাইন আছে, আছে বিজ্ঞানের সাইন। এখানে মানবজীবনকে পরিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্যে চুরির শাস্তি থেকে শুরু করে দেশ কিভাবে চালাতে হবে তারও দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে, সেগুলোর নির্দেশনা এখানে দেয়া আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। আমরা যারা মুসলিম তাঁরা উনার জীবন আর কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করার চেষ্টা করি। দেড় হাজার বছর আগে যখন বিভিন্ন সময় আর ঘটনার প্রেক্ষাপটে একটা একটা আয়াত নাজিল হচ্ছিলো, তখন ইতিমধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন কিছু অসাধারণত্ব পাঠাচ্ছিলেন যা তখন বুঝা সম্ভব ছিলোনা, যেটা আমরা আজ কম্পিউটার আর প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব দ্রুত জেনে ফেলেছি। এটার মাঝে শব্দের কিছু অলৌকিকত্ব আছে, যেটা দেড় হাজার বছর আগে পুরো কুর'আন জুড়ে এভাবে বজায় রাখা সম্ভব ছিলো না, এমনকি কুরআনে যে শব্দগুলো এভাবে আছে তাও জানা সম্ভব ছিলো না। সেই অনেকগুলো অসাধারণত্বগুলোর মাঝে শুধুমাত্র শব্দসংখ্যার ব্যাপারটা নিয়ে বলছি এখানে।

■ আমরা জানি, দুনিয়া (دنيا) মানে এই জীবন, আর আখিরাত (اخرة) মানে পরের জীবন। এই দুইটা শব্দ কুরআনে কয়বার এসেছে জানেন? দুইটাই ১১৫ বার করে এসেছে। পুরো কুরআন জুড়ে যেটা মানুষের পক্ষে মেইনটেইন করা সম্ভব না। আপনি বুদ্ধিমান, আর সচেতন মানুষ

■ হলে আপনি এতক্ষণে Allah is the most perfect one বলে ফেলেছেন অলরেডি, এবং আপনি জানেন আল-কুরান এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছ থেকেই আসা সম্ভব না। তবু আপনাকে আরো কয়েকটা দিচ্ছি।

■ পুরুষ (رجل) শব্দটা এসেছে ২৪ বার, আবার নারী (امرأة) শব্দটাও এসেছে ২৪ বার। এই বিশাল কুরআন জুড়ে একদম সমান সংখ্যক বার। ভাবা যায়?

■ Angel মানে ফেরেশতা (ملائكة), আর শাইত্বান (شيطان) হচ্ছে Devil. পুরো কুরআন জুড়ে এই দুইটা শব্দ কয়বার এসেছে জানেন? ৮৮বার। একেবারে সমান সংখ্যায়।

■ উপকার (خير) শব্দটা এসেছে ৫০ বার। অন্যদিকে ক্ষতিকর (ضر) শব্দটা এসেছে ৫০ বার।

আমাদেরকে প্রতি বছর আমাদের সম্পদের একটা অংশ গরীবদের দিয়ে দিতে হয়। যদি এই সিস্টেমটা সারা দুনিয়ায় মানা হতো তাহলে আজকের দুনিয়ায় কোনো গরীব থাকতোনা, না খেয়ে কেউ মারা যেতোনা। এই সিস্টেমটার নাম যাকাত। যাকাত দেয়া আমাদের জন্যে বাধ্যতামুলক, এবং এই যাকাত হচ্ছে মুসলিমদের সম্পদে গরীবের অধিকার। অর্থাৎ, আমরা যাকাত দিয়ে মনে করিনা যে আমরা একটা মানুষের উপকার করে ফেলেছি, বরং আমরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করি মাত্র। আল্লাহ বলেছেন, যাকাত দিলে তিনি সম্পদে বরকত বা blessings বাড়িয়ে দিবেন। পুরো কুরআন জুড়ে এই দুটো শব্দের মোট সংখ্যা জানেন?

■ পুরো কুরআনে যাকাত (زكاة) শব্দটা এসেছে মোট ৩২ বার, এবং বরকত (بركة) শব্দটা এসেছে ৩২ বার।

■ জিহবা (لسان) শব্দটা এসেছে ২৫ বার, বাক্য (الكلمة) শব্দটা এসেছে ২৫ বার।

ছোটবেলার একটা প্রশ্ন করি ।

সারা বছরে মাসের সংখ্যা কয়টা?

-১২ টা ।

আর এক বছরে কয় দিন?

-৩৬৫ দিন ।

- পুরা কুরআন জুড়ে মাস (شهر) শব্দটা এসেছে ঠিক ১২ বার ।
- দিন (يوم) শব্দটা এসেছে ৩৬৫ বার ।

সুবহান আল্লাহ ।

আল্লাহ নিশ্চয়ই সবচাইতে নিখুঁত এবং সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ।

এভাবে একটা পুরো বইকে সাজানো কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব ।

আরো একটা কথা আমরা সবাই শুনেছি প্রায় সময়েই । কিন্তু উত্তরটা কি খুঁজেছি?

প্রশ্নটা হচ্ছে, কুরআনের পূর্ণাংগ অনুবাদ কেনো সম্ভব নয়? কোনো অনুবাদই কেনো কুরআনের সামগ্রিক অর্থকে তুলে ধরতে অক্ষম?

এটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ব্যাপক গভীরে যেতে হবে । সেটা জ্ঞানীদের (আলীমদের) কাজ । আমি শুধু অত্যন্ত সহজ ভাষায় সিম্পল আর ছোট্ট একটা উদাহরণ দিবো । যারা বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁরা এখান থেকেই পুরো জিনিসটা ধরে ফেলবেন ইন শা আল্লাহ ।

পবিত্র আল-কুরআন শুরু হয় যে বাক্যটা দিয়ে তা হচ্ছেঃ

" بسم الهه الرحمن الر حيم "

"বিসমিল-াহি আর-রাহমান আর-রাহীম"

বাক্যের শুরুতে একটা "বি" (بِ) দেখা যাচ্ছে না? এখানে এই "বি" হচ্ছে একটা Preposition । ইংরেজীতে এই Preposition টার অর্থ হচ্ছেঃ

১ । শুরু (beginning)

২ । উৎসর্গ (dedication)

৩। আনুষঙ্গিক বস্তু (accompaniment)

৪। কর্তৃত্ব, মাধ্যম (instrumentality)

বাক্যটাতে "বি" এর এই সবগুলো অর্থই প্রযোজ্য। ফ্যাঁকড়াটা লাগে অনুবাদের সময়। ইংরেজী বা বাংলাতে এমন একটা শব্দও নেই, যে শব্দটা এই একটা ছোট্ট আরবী অক্ষরের চার-চারটা অর্থের ব্যাপকতাকে একই সাথে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। আপনি যেভাবেই অনুবাদ করার চেষ্টা করবেন তা কেবলই অক্ষরটার আংশিক অর্থকে তুলে ধরবে। আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেভাবে বিস্তারিতভাবে বলতে চেয়েছেন, বুঝাতে চেয়েছেন শুধুমাত্র একটা অক্ষর দিয়েই, সেটা আপনার সীমিত মানবিক ক্ষমতা দিয়ে অনুবাদ করতে গিয়ে আপনি শব্দেও ধরতে পারবেন না।

এত গেলো শুধু একটামাত্র অক্ষরের কাহিনী, শব্দ বা বাক্য দূরে থাকুক। বিশ্বাস করুন, যদি এখন পুরো বাক্যটার ব্যাপকতা নিয়ে লিখতে যাই, তাহলে এই লেখাটা আরো দশগুণ বড় করলেও কুলোবে কিনা সন্দেহ আছে!

কুরআনের অসাধারণত্বের লিস্টে এইটা খুবই ছোট্ট উদাহরণ। আরো অজস্র অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। আপনাকে আমি বলছি না আজকেই আরবী শিখে ফেলুন, বলছি না আরবী ভাষার উপরে পি এইচ ডি করুন, আমি শুধু একটাই অনুরোধ করছি, পুরো কুরআন একবার অর্থবুঝে পড়ে ফেলুন। হ্যাঁ, আপনি বুঝবেন। এটা একদমই সহজ ভাষাতে অসাধারণ করে লেখা, সহজ মেসেজ দেয়া। এই কুরআন এসেছে আপনার সম্পূর্ণ জীবনকে গাইড করতে। আল্লাহ আপনাকে পথ দেখাতে এত সুন্দর কিছু বাণী পাঠিয়েছেন, শুধুমাত্র একটা মাত্র বই পাঠিয়েছেন, এই জীবন আর অনন্তের জীবনে পারফেক্টলি সফল হতে আর আপনি সেটা একবারো বুঝে পড়বেন না পুরোটা? এটা কোনো কথা? এখনই শুরু করুন কোনো ভালো অনুবাদ দিয়ে। নিরপেক্ষ মন দিয়ে পড়ুন। ভাবুন। মাত্র কয়েকদিন লাগবে পুরোটা শেষ হতে। আমার সবচাইতে প্রিয় অনুবাদটা ইংরেজীতে করা। M.A.S. Abdel Haleem এর এই অনুবাদটা সাবলীল, প্রাঞ্জল একইসাথে ভাবগাম্ভীর্যকেও ধরে রাখতে পেরেছে। শুরু করে দিন যেকোনো একটা নিয়ে। আপনি অভিভূত হয়ে যাবেন। সত্যকে পুরোপুরি চিনে ফেলবেন নিশ্চিত। মুগ্ধ হয়ে যাবেন। গ্যারান্টিড! কী সিদ্ধান্ত নিলেন? পড়ে শেষ করবেন তো?

ঘোষণা কর শ্রেষ্ঠত্বের

আমরা সবাই জানি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন পাঠিয়েছেন রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। কিভাবে পাঠিয়েছেন? সম্মানিত ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে। যেহেতু দুনিয়ার বুকে আসা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আমাদের সবার প্রিয় নাবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন, পৃথিবীর কোনো মানুষ তাঁর শিক্ষক হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি, আল্লাহ তাই তাঁর শিক্ষার ভার নিজেই নিয়েছিলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম উনাকে মুখে মুখে আয়াতগুলো (আরবী আয়াত শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন) শিখিয়ে দিতেন। নাবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথেই আয়াতগুলো তাঁর সামনে থাকা সাহাবীদের (আরবী সাহাবী শব্দের অর্থ সাথী) মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। এই ব্যাপারটার একটা বিরাট ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক গুরুত্ব রয়েছে, যা পুরোপুরি আল- কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কি সেটা?

যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে বাণী আসার সাথে সাথেই তাঁর সাহাবীদের শিখিয়ে দিতেন, কাজেই, উনি একবার যা বলে ফেলতেন তা পরবর্তীতে আর শোধরানোর কোনো সুযোগ ছিলো না। সেই সুযোগের দরকার হতো, যদি সেগুলোতে কোনো অসামঞ্জস্যতা থাকতো। সেগুলো যদি তাঁর নিজের তৈরী করা কথা হতো তাহলেই তাতে ভুল থাকতো, শোধরানোর প্রশ্ন আসতো। কিন্তু যে বাণী সবচেয়ে পারফেক্ট আর প্রজ্ঞাবান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিজের, তাতে কি করে অসামঞ্জস্যতা বা ভুল থাকার প্রশ্ন আসতে পারে? তাই অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে এতে আজ পর্যন্ত কোনো অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়নি। এমনকি এর লেখক নিজে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বলেছেন, এর মতো একটি সুরা বানিয়ে নিয়ে আসার জন্যে, অথবা এর মাঝে কোনো অসামঞ্জস্যতা খুঁজে বের করার জন্যে। তাই আমরা রেগে যাই না, উল্টো নন-মুসলিমদের, এমনকি মুসলিমদেরকেও স্বাগতম জানাই যখন তারা এই চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করে।

আমরা খুশি হই।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমনটাই হওয়ার কথা।

পবিত্র আল-কুরআনের সুরা আল-মুদ্দাসসিরের তিন নং আয়াতে একটা মজার ব্যাপার আছে। তিন নং আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

وربك فكبر

(উচ্চারণ: ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির)

Translation: Declare the greatness of your Lord.

আরবী পড়তে হয় ডানদিক হতে বামদিকে। এই আয়াতটি শুরু হয়েছে "ওয়া" (و) দিয়ে। ইংরেজীতে আমরা কোনো বাক্য শুরু করার সময় কি করি? আমরা বড় হাতের অক্ষর (Capital letter) ব্যবহার করি। তেমনি আরবীতে ২১টিরও বেশি ক্ষেত্রে "ওয়া" (و) ব্যবহৃত হয় । এর মাঝে একটি হলো, কোনো বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হওয়া। এখানেও বাক্যের শুরুতে "ওয়া" (و) ব্যবহৃত হয়েছে। এখন খুব মন দিয়ে খেয়াল করুন। বাকি অংশ কি বলছে? বাকি অংশে বলছে,

ربك فكبر

উচ্চারণ: রাব্বাকা ফাকাব্বির

Translation: Declare the greatness only of your Lord.

আয়াতটা মুখে উচ্চারণ করার জন্যে আমি উচ্চারণটা বাংলায় দিয়ে দিয়েছি। **"রাব্বাকা ফাকাব্বির"**। মুখে উচ্চারণ করুন। যখন আয়াতটা মুখে এটা উচ্চারণ করছেন কোনো অক্ষরটা সবার প্রথমে মুখে আসছে? রা (ر) আসছে, ঠিক? এবার খেয়াল করুন মন দিয়ে, উচ্চারণ করার সময় কোনো অক্ষরটাকে সবার শেষে আবিস্কার করছেন? একই অক্ষর রা (ر), ঠিক? এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে।

আচ্ছা, আবারও উচ্চারণ করুন **"রাব্বাকা ফাকাব্বির"**। এবার খেয়াল করুন দ্বিতীয় কোনো অক্ষরটি উচ্চারিত হচ্ছে? এবং শেষ থেকে দ্বিতীয় কোনো অক্ষরটি শুনতে পাচ্ছেন? রাইট। এবার শুনতে পাচ্ছেন, "ব্বা" (بّ)। প্রথম থেকে ২, এবং শেষ থেকে ২ নং পজিশানে "ব্বা" (بّ) শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ এরাবিক "বা" অক্ষরটি একসাথে দুইবার করে শোনা যাচ্ছে।

আরো একবার উচ্চারণ করুন **"রাব্বাকা ফাকাব্বির"**। প্রথম এবং শেষ হতে তিন নং পজিশানে কি শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন "কা" (كَ) অক্ষরটি।
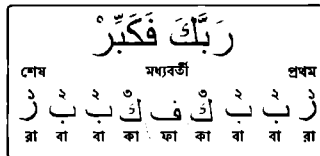
শেষ বারের মতো আরেকবার পুরোটা উচ্চারণ করলে আপনি প্রথম তিনটা এবং শেষ তিনটার মাঝখানে "ফা" (ف) অক্ষরটিকে আবিস্কার করবেন। এতক্ষনে আমরা যা কিছু পেলাম তার সবটুকুকে ছবিতে লিখে রাখছি "ফা" (ف) অক্ষরটিকে মাঝখানে চিহ্নিত করে। কি? কিছু বুঝতে পারছেন?

হ্যাঁ। আপনি যেটা খুঁজে পাচ্ছেন সেটাই প্যালিড্রোম (Palindrome)। ইংরেজীতে এবং বাংলায় এরকম বেশ কিছু প্যালিড্রোম আছে যেগুলোর সামনে এবং পেছন থেকে যেদিকেই পড়া হোক না কেন, একইরকম অক্ষর পাওয়া যায়। উদাহরণসরূপ ইংরেজীতে বলা যায়ঃ

Bob.

Race car.

A but tuba.

A Toyota's a Toyota.

A nut for a jar of tuna.

As I pee, sir, I see Pisa.

A lad named E. Mandala.

এবং বাংলায় উদাহরণসরূপ বলা যেতে পারেঃ

নতুন

নয়ন

রমাকান্ত কামার

মলম ইত্যাদি।

এখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা সেটা হলো, আল্লাহর বাণীগুলো কিন্তু হাতে

লেখা হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই কুরআনের সুরা আল আনকাবুতের ৪৮ নং আয়াতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেনঃ

...ولاتخطه بيمينك ...

...You didn't write anything down with your hand...

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার হাতে কিছু লেখেননি। আল্লাহ যা উনাকে বলেছেন, উনিও মানুষকে হুবহু ওটুকুই বলেছেন। কোনো সম্পাদনা, কাঁটা ছেঁড়া ছাড়াই। আমরা এখন সেভাবেই কুরআন পড়ছি, ঠিক হুবহু যেভাবে নাবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআন এসেছিলো এবং হুবহু যেভাবে উনি প্রথমবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন। প্রথমবার!

সমগ্র মানবজাতির জন্যে এখানে একটা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। সুরা আল-মুদ্দাসসিরের তিন নং এই আয়াতটার একদম সিম্পল অনুবাদ হচ্ছেঃ

Declare the greatness only of your Lord.

আপনি যেটা ট্রাই করবেন সেটা হচ্ছে,

"Declare the greatness only of your Lord" এই কথাটাকে ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানিজ, চাইনিজ, ইটালিয়ান, রাশান, উর্দু, হিন্দী, বাংলা বা ফার্সী অর্থাৎ যেকোনো ভাষায় কোনো ডিকশনারী ব্যবহার না করে, কোথাও না লিখে, শুধুমাত্র মুখে একবারই উচ্চারণ করে এমন একটা বাক্য বলবেন, যেটা প্রথমবারেই এটা বলবে যে

"Declare the greatness only of your Lord" এবং সেটা সামনে-পেছনে যেদিক থেকেই পড়া হোক না কেন অক্ষরগুলোর সজ্জা একই রকম (প্যালিনড্রোম) হবে।

সম্ভব?

না।

সুবহান আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই সবচেয়ে নিখুঁত আর সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই লেখাটিতে কোন মিরাকল নয়, বরং কুরআনের অনেকগুলো অনন্যতার একটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের অজস্র অসাধারণ সব মিরাকল রয়েছে।

এর মাঝে অনেকগুলো মিরাকলই হচ্ছে ভাষাকেন্দ্রিক। আমরা কোনোমতে শুধুমাত্র আল-কুরআনকে আরবী থেকে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতে পারি। ব্যাস, এটুকুই! আমরা কি কুরআনের ভাষার মাঝে লুকিয়ে থাকা অজস্র অজস্র মিরাকেলগুলোকে ভাষান্তর করতে পারি?

না। পারি না।

আমরা যেন ভুলে না যাই, কুরআনের প্রত্যেকটা আয়াতই এক একটা মিরাকেল।

আমাদেরকে শুধু গভীরভাবে কুরআন পড়তে হবে, ভাবতে হবে।

মিরাকেলগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে।

হোক প্রতিদিন শুধুই একটা আয়াত, তবুও কুরআন পড়া দিয়েই যেন দিনের আলোতে পথচলা শুরু হয় আমাদের।

সুরা রুমের অলৌকিকত্ব

পারসিয়ানরা তখন বেশ পরাক্রমশালী। রোমানদের হারিয়ে নাস্তানাবুদ করে দিলো। জেরুজালেমসহ বিজিত সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ভূখন্ড থেকে রোমানদের উচ্ছেদ করে দেয়া হলো।

তখন ৬১৫ কি ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ। মক্কাতে কুরাইশদের তীব্র অত্যাচারে মুসলিমরা নির্যাতিত, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত, রক্তাক্ত। কুরাইশরা মূর্তিপূজা করতো বলে আগুনের পূজারী পারসিকদের বিজয়ে তাদের উল্লাস আর আনন্দিত হওয়া ছিলো খুবই স্বাভাবিক। উল্টোদিকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেও শেষ নবী ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী হওয়ায় রোমান খ্রীষ্টানদের প্রতিই ছিলো নির্যাতিত মুসলমানদের আকুণ্ঠ সমর্থন। রোমানদের নির্মম পরাজয়ের এই টান টান উত্তেজনার সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু আয়াত অবতীর্ণ হলো। আয়াতগুলোর বাংলা অনুবাদের প্রতিটা কথা খুঁটিয়ে দেখা যাকঃ

"রোমানরা নিকটবর্তী দেশে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয় লাভ করবে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল। পরেও তাঁরই থাকবে। আর সেদিনটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে।"

[সুরা রুমঃ ২-৪]

মুসলিমদের কাছে আল্লাহর দেয়া এই ভবিষ্যতবাণী শুনে বিস্ময়ে মার অবিশ্বাসীদের চোয়াল ঝুলে পড়ে। বলে কী এরা! পারসিয়ানদের মতো পরাক্রমশালীরা হারবে! তাও কিনা আবার রোমানদের কাছে! রোমানরা এইভাবে

গো-হারা হেরে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরেও! এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা এই সময়ে আর কিই বা হতে পারে? কয়েক বছর কেনো, কয়েক যুগেও যে ওদেরকে পরাজিত করার চিন্তা পুরোপুরি হাস্যকর! রোমানরা নাকি আবার এমন দিনে বিজয়ী হবে যেদিন আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলমানরাও আনন্দে উৎফুল্ল হবে! হাহাহাঃ

এই নিয়ে মক্কার কাফিরদের একজন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধরে বসলো। এই আয়াতের সত্যতা নিয়ে সে বিশাল একটা বাজি ধরলো উনার সাথে।

ঘটনার ৬ বছর পর মক্কার কাফিরদের তীব্র অত্যাচারে জীবন বাঁচাতে মুসলমানরা মদীনাতে হিজরাত করতে বাধ্য হয়। এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও তারা খুন করে ফেলতে যায়। আল্লাহর রাহমাতে উনি নিরাপদে মাদীনাতে চলে যেতে সক্ষম হন। এক আল্লাহর কথা জানাতে গিয়ে ঘর-বাড়ি ছাড়তে হলো। ছাড়তে হলো আত্মীয়-পরিজন। ব্যবসা-ক্যারিয়ার, ধন-সম্পত্তি সব ফেলে যেতে হলো মুসলমানদের। ঠাই মিললো মদীনায়।

কিন্তু মদীনায় গিয়ে ঠাই মিললেও, শান্তি মিললো না। হিজরাতের দুই বছর পর মক্কার অবিশ্বাসীরা ১০০০ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে বসে হাতে গোণা মুসলমানদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে। বদরের প্রান্তরে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান জান-বাজি রেখে মুখোমুখি হয় এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যের। এই সামান্য ক'জন সৈন্য নিয়েও মুসলমানরা ছিলেন অকুতোভয়। তারা জানতেন, বিজয়ের সাথে সৈন্য সংখ্যার কোনো সম্পর্কই নেই, বরং বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেই আল্লাহর উপরেই ছিলো উনাদের সবটুকু ভরসা। আর আল্লাহও তাদেরকে সাহায্য করলেন।

এই বেখাপ্পা অসম যুদ্ধে মুসলিমরাই জিতে গেলো।

আজিব আর অসাধারণ এক বিজয়!

যে বিজয় এক আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ে মুসলিমরা যখন আনন্দে উৎফুল্ল ঠিক সেইদিনই তাদের কাছে আরেকটা অসাধারণ খবর পৌঁছুলো। পারসিয়ানদের হারিয়ে দিয়ে রোমানরাও বিজয়ী হয়েছে।

আট বছর আগে নাজিল হওয়া কুরআনের বাণী যে সত্য হবেই হবে এত জানা কথাই। এই বাণী যে একমাত্র সেই আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে যিনি সকল ক্ষমতা আর কর্তৃত্বের নিরঙ্কুশ অধিকারী। যিনি অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সব জানেন।

যিনি উপাসনার জন্যে একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা।

ভালোবাসা

সব মিলিয়ে টোটাল ২ বিলিয়ন ডলার দেয়া হচ্ছে। নগদে দেয়া হচ্ছে।

কিসের বিনিময়ে?

বিনিময় হিসেবে আপনাকে আপনার কাছে থাকা বেস্ট দুটো ক্যামেরা দিয়ে দিতে হবে।

এ আর এমন কি? উম্মম, আমার কাছে একটা মোবাইলে থাকা ক্যামেরা আছে, আর আব্বুর মোবাইলেও একটা আছে। ওটা সহ ম্যানেজ করে দিয়ে দেবো।

উহু, উঁহু! এইগুলো না। আপনার কাছে থাকা বেস্ট দুটো ক্যামেরা দিয়ে দিতে হবে। আপনার চোখ দুটো।

কিইই?

এহ! শখ কত! চোখ দিয়ে দিবো! আমি কি পাগল নাকি পেট খারাপ? কি করবো বিলিয়ন ডলার দিয়ে? লাগবেনা আপনার বিলিয়ন ডলার, দূরে গিয়ে মুড়ি খান। আমার চোখ আমার কাছেই থাকুক ভাই। ধন্যবাদ।

এরকম মোট কতটা অমূল্য ডিভাইস আমার কাছে আছে? আমি কি একটারও দাম দিয়েছি? একটাও কি আমি নিজে অর্জন করেছি? যোগ্যতার অর্জন? উঁহু! একটাও না। এগুলোর একটার যোগ্যও আমি নই। একটার জন্যেও আমি কিছু ব্যয় করিনি। তাহলে?

তাহলে আর কি? উপহার। উপহার। এত এত দামী উপহার আমরা কখন পাই? কার কাছ থেকে পাই? যে আমাদের ভালোবাসে। তীব্র, সুতীব্র ভালোবাসে।

এমনও হতে পারে কেও একজন এরকম অমূল্য ডিভাইস দুটি কম পেয়েছে। তারপরেও সে কি ভূলেও বলতে পারবে, তিনি আমাকে কম ভালোবাসেন? নাহলে আমাকে দুটো কম দিলেন কেন? নাহ! যদি কেউ বলে থাকে তাহলে সে অলরেডি পাওয়া একগাদা উপহারের প্রতি অকৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করছে। যা পেয়েছে তার জন্যে ধন্যবাদ তো দেয়ইনি, এমনকি নূন্যতম কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও তার মাঝে নেই।

আচ্ছা আমরা এরকম কি কি উপহার পেয়েছি? অসাধারণ একটা ব্রেইন পেয়েছি, যেটা দিয়ে না দেখে, না শুনেও আমরা শুধু চিন্তা করে করে অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারি, আবিস্কার করে ফেলতে পারি। আছে স্নায়ু। অনুভূতির উচ্চাসনে নিয়ে যেতে যাদের জুড়ি নেই। শুনতে পাওয়ার জন্যে দুই দুইটা কান। আর কোনোটা ভালো আর কোনোটা খারাপ তা আগে আগে বুঝে যাওয়ার জন্যে একটা নাক। টেস্ট বাড না থাকলে খাবার বা পুষ্টির স্বাদ বোঝাই হতোনা। আলু, পটল, তিতাকরলা আর বিরিয়ানি সবগুলোর আবেদন একই রকম হতো।

এভাবে বাতাস থেকে ছেঁকে ছেঁকে অক্সিজেনকে আলাদা করে রক্তে মেশানোর জন্যে দুইটা ফুসফুস নামের মেশিন, রক্তগুলোকে সারা শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে দিতে সবল একটা পাম্প মেশিন যাকে আমরা হার্ট বলি, রক্তকে ছেঁকে ময়লা আর আবর্জনা পরিশোধন করতে দুটো কিডনী, পরিপাকের জন্যে জটিল সব মেশিনে ভর্তি একটা অসাধারণ পরিপাকতন্ত্র আরো কত কি!!! এর একটাও যদি আমার না থাকতো, আমার কিই বা বলার ছিলো? কিচ্ছু বলার ছিলোনা। এই সবগুলোই আমাকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে কিছুদিনের জন্যে। শুধু এই প্রত্যেকটা নিয়ে দুই মিনিট করে গভীর ভাবনায় কখনো ডুব দিয়েছি কখনো? যারা একবার হলেও ডুব দিয়েছে নিশ্চয়ই এত কিছু পাওয়ার আনন্দে, এত এত গভীর ভালোবাসা অনুভব করে তাদের চোখ দিয়ে পানি নেমে এসেছে।

শারীরিক এই উপহারগুলোই শুধু নয়। সেই ভালোবাসার জন, আমার জন্যে এই বিশাল মাটির গোলককে কত শত রঙেই না রাঙিয়েছেন। রাঙিয়েছেন এর উপরে ছড়ানো আকাশের সামিয়ানা। সূর্যের আলোকে ঝুম বর্ষায় নেমে আসা পানির ফোঁটায় ফোঁটায় সাত রঙে চিরে নিয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে দেয়ার নিয়ম করে দিয়েছেন সেই অসাধারণ শিল্পী। চারপাশের জগতকে এমন একটা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন যাতে আমরা বাঁচতে পারি, থাকতে পারি, দেখতে পারি, আর বুঝতে পারি তাঁকে। অনুভব করতে পারি, উপভোগ করতে পারি উনার দেয়া অজস্র সব বিস্ময়। এত অসাধারণ একজন আর্কিটেক্ট, এত্ত অসাধারণ একজন ইঞ্জিনিয়ার আর বায়োলজিস্ট আমাদের মত এত তুচ্ছ সৃষ্টিকে এত অসাধারণ ভালোবেসে নিজের অটোগ্রাফ, নিজের সিগনেচার, নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন চারিপাশে। আমাদের ভিতর থেকে বাইরের বিস্তৃত দিগন্তে সেই আর্টিস্টের সিগনেচার ছড়ানো। সবটুকু চিহ্ন দিয়ে আমাদের এত পরম মমতায় আগলে রেখে শুধু একটাই চাওয়া তাঁর- আমরা যেন তাঁকে চিনি। তাঁর ভালোবাসাকে অনুভব করি। অনুভব করি তিনি আমরা না চাইতেই কি কি করেছেন আমাদের জন্যে। তিনি শক্ত খুলি দিয়ে সযত্নে

সাথে রেখে একটা শক্তিশালী মস্তিস্ক দিয়েছেন যা দিয়ে আমরা গভীরভাবে জানবো, অনুভব করবো তাঁকে ।ভালোবাসবো তাঁকে । কৃতজ্ঞ তায় বুকটা ভরে উঠবে । যদি কৃতজ্ঞ না হই, ভালো না বাসি তাহলে? তাহলে আর কি? যে ভালোবাসে, তাঁর ভালোবাসাতো আর যাকে ভালোবাসা হয় সেই মানুষটা ভালোবাসলো কি বাসলো না, তার উপর নির্ভর করে না । আমি যদি আমার আব্বু আম্মুকে ভালো নাও বাসি, আমার জন্যে তাঁরা যে এত এত্ত করেছেন তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞ নাও হই, তার পরেও আমার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা কমবে না । তাঁরা আমার জন্যে যা করার তা করেই যাবেন, করেই যাবেন । আমাদের জীবনকে এই বাবা-মায়ের মতো অসাধারণ দুটো অমূল্য উপহার দিয়ে যিনি সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি আমাদের আসলেই কতটা ভালোবাসেন সেই অনুভূতি কি আমাদের এই শক্তিশালী মস্তিস্কও ধারণ করতে পারবে? পারবে না । আমরা তাঁকে ভালো না বাসলেও তিনি খেতে দেবেন, রাতে শান্তিতে ঘুমুতে দেবেন । দুনিয়া জুড়ে তাকিয়ে দেখো । যারা তাঁকে মানে না, গালি দেয়, তাঁর কথা শোনে না, তাদেরকে কি তিনি চাইলে মূহুর্তেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন না? পারেন । কিন্তু তিনি করেন না । আমাদের কৃতজ্ঞ তা, ভালোবাসায় তাঁর অসীম করুণা আর সু-বিশাল সাম্রাজ্যের একটা কণাও বাড়ে না, কমেও না । কিছুই যায় আসেনা তাঁর । কিন্তু আমাদের? হ্যাঁ । আমাদের যায় আসে । তিনি তো আমাদের অন্ধকারে রাখতে চাননি কোনোদিন । তাই সত্যের আলোতে ভিজিয়ে দিতে বারবার তিনি আমাদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নিয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে আমাদের কাছে সত্য কথাগুলো পৌঁছে দিয়েছেন । তাঁর দেয়া মস্তিস্ক ব্যবহার করে আমরা বুঝে যাই, জেনে ফেলি যে তিনি আছেন, তিনি একজনই । এরপর আমরা চাইলে উনাকে অস্বীকার করতেই পারি, অকৃতজ্ঞ হতেই পারি, তাঁকে কোনোদিনও ধন্যবাদ না দিতেই পারি । এতে তাঁর কিছুই যায় আসেনা । কিন্তু যদি তাঁকে ভালোবেসে ফেলি? যদি কৃতজ্ঞ লাগে? যদি তাঁর প্রভুত্বের নিচে নিজেকে দাস হিসেবে দেখতে ভালো লাগে? যদি তাঁকে মিস করি? যদি তাঁর অসীম জ্ঞান আর প্রজ্ঞার উপরে ভরসা করে তিনি যা বলেন তাই শুনে মেনে নিই? সেই মহা পবিত্র সত্ত্বা আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি এত এত্ত এত্তত্ত বেশশি খুশি হন যে, আসমানের সমস্ত ফেরেশতাদের ডেকে এনে সেই দাসের বিনীত কৃতজ্ঞ তা দেখান । তাঁর দাস যখনই ভুলতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে মাফ চায়, তিনি এত খুশি হন যে সেই নগন্য দাসের পাহাড় সমান অবাধ্যতা আর বেয়াদবীর অপরাধ তিনি আকাশ সমান

ভালোবাসা আর ক্ষমা দিয়ে মুছে নেন । হ্যাঁ । এত্ত ভালোবাসেন আমাদের তিনি ।

এত ভালোবাসেন বলেই তিনি চান না আমরা তাঁর অবাধ্য হই । তাই তিনি যুগে

যুগে বারবার জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ন্যায় বিচারক। দুনিয়ার বুকে যারা অন্যায় করে বেড়ায়, অত্যাচার করে বেড়ায়, তাঁর এত এত্ত ভালোবাসার মানুষগুলোকে কষ্ট দেয়, তাদের তিনি ছেড়ে দেবেন না। তাদের বিচার তিনি করবেনই। এই জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্যে, আমাদের ভালো চয়েস, খারাপ চয়েস গুলোকে মূল্যায়ন করার জন্যে তাই তিনি জান্নাতের অনুপম শান্তি, আর জাহান্নামের অবর্ণণীয় কষ্ট রেখেছেন। তিনি কাউকে শাস্তি দেবেন না, শুধু যার যা প্রাপ্য, ন্যায় বিচার করে তাকে সেটা বুঝিয়ে দেবেন। কি করলে কে পুরস্কার পাবে, আর কে ফেইল করবে এটা তাই তিনি বারবার, বারবার, বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানার জন্যে বলে দিয়েছেন। শুধু একবার বললেইতো হতো। না। তিনি বারবার বলেছেন, যেন আমরা ভুল না করি, ভুল পথে না চলে যাই। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, দুনিয়ার মায়ার বিভ্রান্তিতে পড়ে যেন বরবাদ না হয়ে যাই কোনোভাবেই সেজন্যে তিনি কত বিস্তৃতভাবে শয়তানের পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন, তাকে অনুসরণ করতে মানা করে দিয়েছেন, কত সুন্দর করে বলে দিয়েছেন এই দুনিয়া একটা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই না। বারবার বলে দিয়েছেন, তাঁর কথা শুনতে, তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রেখে কাজ করে যেতে, তখন তিনিই আমার সব সামলাবেন। আমাকে আরো বেশি করে আগলে রাখবেন। অনন্তকালের জন্যে পুরস্কার দেবেন যেটা আমরা কল্পনাও করিনি। সামান্য কয়েক বছরের এই দুনিয়ায় একের পর এক শুধু ঝড় ঝাপ্টাই আসবে। এভাবেই এখানের জীবনকে সাজানো হয়েছে। কাজেই, সেটাকে ভয় পেয়েতো লাভ নেই। সেটার মোকাবিলা আমাদেরকেই করতে হবে, তাই প্রস্তুতিও আমরা সেভাবেই নেবো। সামান্য কয়েকদিনই তো মাত্র। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এই সামান্য কয়েকদিনের কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসার প্রতিদানে যিনি অসীম আর অনন্তের চাদরে জড়িয়ে আমাদেরকে চিরস্থায়ী পুরস্কারের জগতে স্বাগতম জানাতে অপেক্ষা করছেন গভীর মমতায়, তাঁকে ইনশাল্লাহ আমরা নিরাশ করবোনা। প্রতিদিন নতুন উদ্যমে হেঁটে যাবো সবাই একসাথে। তাঁর দেখানো আলোতে, তাঁর দিকে, তাঁর পথে।

তাঁকে ইনশাল্লাহ আমরা ভুলবোনা। এক মূহুর্তের জন্যেও না। আমাদের না বলা ভালোবাসা, জমে ওঠা কৃতজ্ঞ তার সবটুকু বলা হবে দিনে অন্তত পাঁচবার।

আমাদের সিজদাগুলো মুখরিত হোক কৃতজ্ঞতা, চাওয়া পাওয়া আর গভীরতম ভালোবাসায় ভেজানো নীরবতার রূপালী আলোয়।

আমাদের প্রতি প্রাণে বাজুক একটাই সুর-

“সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আপনাকেই”।

থইথই ভালোবাসায় জাগবো বলে

যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি, তখন থেকেই আমাকে পরিপূর্ণ স্বাক্ষর একজন মানুষ বলা যায়। বাংলা, ইংরেজী, আরবি ভালোভাবেই পড়তে, লিখতে জানতাম। জানতাম ঠিকভাবে ক্যালকুলেশান করতে। ধুমিয়ে নানান কিসিমের কমিক্স পড়া শুরুটা হয়েছিলো ক্লাস ওয়ানেরও বেশ আগে। ক্লাস ফাইভে এসে সেই অভ্যেস নানান কিসিমের বইতে গিয়ে ঠেকে। তখন আমার বয়স ৯। এক গম্ভীর, কৌতুহলী ঝাঁ চকচকে কিশোর।

স্বাক্ষরতার গল্পটা অতটুকুতেই শেষ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো। আজ যখন হিসেব মেলাতে বসলাম, দেখি কিছুই মিলছে না। এলজেবরা, ক্যালকুলাস, ত্রিকোণমিতি, বিচ্ছিন্ন গণিত, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, কৃষি শিক্ষা আরো কত কি পড়তে হয়েছে হাবিজাবি। শেষে বায়োলজির একটা শাখায় অনার্স শেষ করে যখন মাস্টার্স শেষ করার পথে, তখন আবিস্কার করলাম, বাহ! ২৪ বছর তো শেষ করে ফেলেছি।

কী অর্জন করেছি?

কয়েক টুকরো একটু ভালো মানের কাগজে ছাপানো ডিগ্রী নামের হাস্যকর কিছু কৌতুক, যা আমার প্লাস্টিকের ফাইলে জমা হয়েছে সময়ের সাথে। এই তো! তো কি? হয়েছেটা কি? সমাজের ফালতু অন্ধ মানুষগুলো কাগজগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেশ তালি বাজাতে জানে, তাতে আমার লাভটা কোথায় বাপু? আমার জীবনে এর প্রভাবটা কোথায়? এগুলো না থাকলে মানুষ হিসেবে কি কম কিছু হতাম? নাকি এগুলো পেয়ে মানুষ হিসেবে আমার 'আমিত্বের' কোনো উন্নতি হয়েছে? বলি, ফলাফল টা কি হলো দিন শেষে?

সত্যি বলি?

শুনুন।

যোগফল জঘন্য একটা শুন্য।

আমার প্রাপ্তি হলো বি-শা-ল একটা ঘোড়ার আন্ডা। যেটা না যায় ভাজা, না যায় খাওয়া। ৯ বছর বয়সের পর থেকে এই ১৫ বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর তার সিলেবাসের পাঠ্য গুলো আমাকে এমন কিছু শেখায়নি যাতে আমি বদলে যাবো,

উন্নত একজন মানুষ হয়ে যাবো। কিছু তথ্য শিখেছি, যেগুলো দিয়ে দক্ষ হওয়া যায় কোনো কাজে, রুজি-রোজগার করা যায়, কিন্তু মানুষ হয়ে ওঠা যায়, মনুষ্যত্বকে চিনে-বুঝে নিয়ে নিজেকে উন্নত একজন মানুষে কীভাবে রূপান্তরিত করে ফেলা যায় সেই জ্ঞান? সেই শিক্ষা যে আমি আমার ক্লাস লেকচার আর পাঠ্যবইতে পাইনি। যা একটু-আধটু ছিলো, তা ছিলো কেবলই গিলে নিয়ে পরীক্ষার খাতায় বমি করার জন্যে, জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে সেগুলো শেখানো হয়নি, উৎসাহিত করা হয়নি।

শুধুমাত্র, হ্যাঁ, শুধুমাত্র সামাজিকতা রক্ষার জন্যে, পেটে দু'টো খাবার পুরে নিয়ে বিলাসিতা করবার জন্যে অমূল্য সময়, শ্রম আর অর্থের (=জীবনের) কি বিপুল অপচয়!

হ্যাঁ! এটা ঠিক যে, তিন বছর আগে আমি কিছুটা বদলেছি। কীভাবে? তিনটা সাবজেক্ট আমার জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে।

১. দর্শন

২. যুক্তিবিদ্যা

৩. ইতিহাস

এই তিনটা বিষয়ের একটাও আমার পাঠ্য সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তি হতে পড়া হয়নি (ভাগ্যিস)! র‍্যান্ডমলি এটা সেটা পড়তাম বলে এই বিষয়গুলোও কিভাবে কিভাবে যেন ফালতু বিনোদন দেয়া উপন্যাসের বস্তার ফাঁকফোকর গলে আমার সামনে এসে গিয়েছিলো। এই তিনটা বিষয়ই নানান সময়ে, নানান আঙ্গিকে আমার সামনে এসে আমাকে দেখতে সাহায্য করে, তুলে ধরে আয়না। ২০বছর বয়সে আমি জীবনে প্রথম একটু একটু করে উপলব্ধি করতে শুরু করি,

"কোথাও কোনো একটা ভুল হচ্ছে। ভয়ংকর কোনো ভুল। নিশ্চয়ই এমন হওয়ার কথা না।"

-প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে একজন উন্নত স্বাক্ষর ব্যক্তি হওয়া ছাড়া আর কোনো সাহায্যই করেনি।

-মানুষ হতে সাহায্য করেনি? সত্যি সত্যি উন্নত হতে সাহায্য করেনি?

-না। একটুও না।

আমরা কি নিজেকে প্রশ্ন করবো না এখনো? আমরা কি করছি? সত্যিই কেন করছি?

আমরা কি উন্নত মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি আসলেই? নাকি সমাজ বলে দিয়েছে এভাবে এভাবে চললে টাকা আসবে, স্বাচ্ছন্দ্য আসবে, খেয়ে পরে আরামে বেঁচে থাকবে, আর তাই আমরা সেই পথ বেছে নিয়েছি? সত্যি করে কি আমরা ভাবতে পারিনা? নিজের কাছে সৎ হয়ে? আরে, শুধু খেয়ে পরে বাঁচে তো পশু। হ্যাঁ, পশু হিসেবে তাই আমাদেরকেও খেয়ে পরেই বাঁচতে হয়। কিন্তু আমরাতো পশুর চাইতেও বেশি কিছু, তাইনা? আমাদের বিবেক আছে, আত্মা আছে, বুদ্ধি আছে। আমাদের ভিতরের সেই আত্মা আর বিবেক-বুদ্ধির যত্ন আত্তি, খাবার দাবারের প্রয়োজন কিন্তু এই সমাজ মিটাচ্ছেনা। এটা কি আমরা খেয়াল করেছি? এই মুহুর্তেও কি খেয়াল করতে পারছি?

থামুন। ভাবুন প্লিজ। আস্তে আস্তে পড়ুন লেখাটা। দৌড়াবেন না আর। অনেক তো দৌঁড়ালেন জীবনে। অনেক দূরে এসে গেলেন তো, দেখুন না। আজ একটু বসে বসে ভাবলে কিচ্ছু হবে না। খাবারের অভাবে, যত্নের অভাবে আমাদের ভেতরে সবচেয়ে দামী সেই গুণগুলো, যেগুলোর জন্যেই আমরা একেকজন উন্নত বিবেকবান মানুষ হয়ে ওঠার কথা সময়ের স্রোতে, সেগুলো শুকিয়ে, বিকলাঙ্গ হতে হতে আজ মৃতপ্রায়। কিছুতেই আর আমাদের বোধদয় হয় না, কিছুতেই আমরা জাগি না। আমরা কিছুই বুঝি না আর চারিপাশ থেকে। কিভাবে জাগতে হয় আমাদের তাই মনে নেই। আমরা যে ঘুমুচ্ছি আমাদেরতো তাই জানতে দেয়া হয় না, জাগবো কিভাবে? আমাদের যা গেলানো হয়, আমরা তাই গিলি আর ঢেঁকুর তুলে ঘুমুতে যাই। এইতো আমাদের জীবন।

বলতে পারেন পশুর জীবন যাপনের সাথে আপনার জীবন যাপনের সত্যিকার বিভেদটা আসলেই কি আছে?

আপনি কে?

কোথা থেকে আপনার উৎপত্তি?

আর কোথায় আপনার সর্বশেষ ঠিকানা?

আপনার করণীয় কি মানুষ হিসেবে?

এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর গভীরতম উত্তর আজও জানা হয়নি বলে কখনো, কোনোদিন কি অস্থিরতায় ছটফট করেছেন? সব বাদ দিয়ে, সব ভুলে গিয়ে

পাগলের মতো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানার সুতীব্র ক্ষুধা কি আপনার ভেতরের আত্মাটাকে জ্বালিয়ে, কষ্ট দিয়ে ভুগিয়েছে? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো?

আপনার উত্তর যদি "না" হয়, তাহলে আপনাকে অভিনন্দন।

হ্যাঁ। আপনার আত্মা মরে গেছে। অনেক আগেই মরে গেছে। টেনশানের কিছু নেই। এই মৃত্যুতে আপনার কোনো অনুভূতিই হবে না। যাদের আত্মা মরে গেছে, তাদের এসব কথায় কিছুই আসবে যাবে না। আপনি আপনার আগের জীবনে ফিরে যান, এই লেখাটা পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না আপনার। কেটে পড়ুন এবং জীবন এনজয় করতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। বেস্ট অফ লাক।

আর আপনার উত্তর যদি "হ্যাঁ" হয়, তাহলে আমি আপনাকে ঠিক কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। খুব বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে আপনার আত্মা মৃতপ্রায়। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ, একে বাঁচিয়ে তুলুন। যেভাবেই পারেন, প্লিজ। আপনি হয়তো একটু একটু করে বুঝতে পারছেন, আমাদের আত্মাগুলোকে মেরে ফেলে আমাদেরকে শুধু ছুটে চলার এক নিস্প্রাণ যন্ত্রমানবে পরিণত করার ভয়াবহ চক্রান্ত করা হয়েছে। এবং সেই চক্রান্ত ইতিমধ্যে অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। প্লিজ, আড়মোড়া ভাঙ্গুন। উঠে বসুন এখনই। ঠিক করুন, জীবন থেকে এতগুলো হারিয়ে যাওয়া বছরকে কিভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। প্ল্যান করুন। সিরিয়াস প্ল্যান। আগান সামনে। আর সময় নেই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর নিশ্চিতভাবে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত থামবেন না। জাগুন। জেগে উঠুন এক্ষুণি। আর দেরী না। এক সেকেন্ডও না।

জীবন তো মাত্র দুইটাই।

আত্মা মরে গেলে আপনার আর জেগে ওঠা হবে না। এখনো দেরী হয়ে যায়নি। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। জেগে উঠুন প্লিজ। আত্মার সাথে সাথে শরীরটাও লাশ হওয়ার আগেই ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসুন।

ভুলে যাবেন না। আপনার আর আমার কিন্তু টাকা দিয়ে বিলাসিতা কিনতে ছুটে চলা একটা মেশিন হবার কথা ছিলোনা কোনোদিন। আমার, আর আপনার বুকে এক মহাকাশ ভালোবাসা থইথই করার কথা ছিলো। কথা ছিলো সেই ভালোবাসার মহাকাশ থেকে স্বপ্নের মেঘ ঝরিয়ে ঝুম বর্ষা নামানোর। সব চরাচর ভিজিয়ে দেয়ার।

আমাদের যে মানুষ হবার কথা ছিলো। সত্যি সত্যি মানুষ!

বার্তাবাহকের মর্যাদা

আল্লাহ বলেছেন,

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।"

(সূরা আল আহযাব: ৩৬)

এখানে একটা কথা আল্লাহ একদম ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন। প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা! কী ভয়াবহ ঘোষণা! আল্লাহর আদেশসমূহ, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা, সিয়াম আদায় করা, ছেলে মেয়ের মাঝের পর্দার বিধান মানা, সুদী কারবারে কোনোভাবেই জড়িত না থাকা, ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা ইত্যাদি আদেশ যদি আমি না মানি তাহলেই আমি পথভ্রষ্ট। ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এগুলো আল্লাহর আদেশের সরাসরি অবাধ্যতা। এটা চোখ বুজে বলে দেয়া যায়। আমরা যারা আল্লাহর আদেশগুলো মানি না, মানতে চাইনা, নানান অজুহাত দেই, আজ নয়, আগামীকাল থেকে করবো ভাবি, লজিক দাঁড়া করাই এগুলোর বিরুদ্ধে, তারাই তো পথভ্রষ্ট। যদি এখুনি অনুতপ্ত হয়ে, লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে আল্লাহর পথে ফিরে না আসি আর উনার আদেশ না মানি এবং পাঁচ মিনিট পরে মারা যাই, তাহলে কি আমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে থাকা অবস্থায় বিদায় নেবো না? পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো না?

এটাতো গেলো শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতার কথা। আল্লাহ বলে দিয়েছেন শুধু আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীরা নয়, রাসুল(স) এর আদেশ অমান্যকারীরাও পরিস্কারভাবেই পথভ্রষ্ট। এক্কেবারে "প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট" বলে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। কোনো লুকাছাপা রাখেননি তিনি আমাদের প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার কথা জানিয়ে দিতে। অথচ এই অজ্ঞ আমরা রাসুল(স) এর আদেশকে থোড়াই কেয়ার করি। রাসুল(স) কিছু ব্যাপারে তাঁর ফলোয়ারদের সরাসরি আদেশ করেছেন, যেগুলো আজকের সমাজে আমরা পাত্তাই দেইনা। অথচ সেগুলো না মানলেও যে আমি আপনি পথভ্রষ্ট হিসেবেই চিহ্নিত হবো সেটা শেষ

বিচার দিবসের মালিক আল্লাহই ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের রসুল আমাদেরকে দাড়ি রাখতে স্পষ্ট আদেশ করেছেন। ৪০ বছর বয়সের পর, চাকরী পাওয়ার পর, বিয়ে-শাদীর পরে বা মরার ঠিক আগে আগে দাড়ি রাখতে তিনি বলেননি। ফ্রেঞ্চকাট বা চাপদাড়ির ডিজাইনের কথাও তিনি বলেননি। তাছাড়া আমি কবে মরে যাবো তাও তো আমি জানি না। বুড়ো হয়ে, দাড়ি রাখার সুযোগ পেয়েই যে মারা যাবো সেই গ্যারান্টি কি আমি নিয়ে এসেছি?

আচ্ছা, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আর কী কী বলেছেন তাঁর প্রেরিত রাসুল (স) কে নিয়ে?

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল, (সেই আল্লাহর) যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর প্রেরিত সেই উম্মী বার্তাবাহকের প্রতি যে নিজে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর যাবতীয় বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে, তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।"

(সুরা আল-আরাফ, ১৫৮)

"তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। আর সে প্রবৃত্তির তাড়নায় (মনগড়া) কথা বলে না।"

(সুরা আন নাজম, ২-৩)

"বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।"

(সুরা আলে ইমরান, ৩১)

"যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস!"

(সুরা আন-নিসা, ১১৫)

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্ব। বুঝতে পারলাম কেনো উনারও (সা) আনুগত্য করতে হবে, উনার কথা

শুনতে হবে। তো তিনি আমাদেরকে কী কী আদেশ করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন?

আমাদের রাসুল (স) স্পস্টভাবে আদেশ করেছেন,

"গোঁফ ছোট করে ছেটে রাখো, আর দাড়িকে ছেড়ে দাও।"

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য)

তিনি যে এখানে সেলুনে গিয়ে নাপিতের হাতে থাকা যন্ত্রের নিচে দাড়িকে ছেড়ে দেয়ার আদেশ করেননি সেটা রোদের আলোর মতোই স্পষ্ট।

আরেকটা হাদীস পড়লে আমরা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবো।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, পারস্যের সম্রাট কিসরা ইয়েমেনের শাসকের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহর কাছে দু'জন এম্বাসেডর পাঠান। এদের দাড়ি ছিলো কামানো আর গোঁফ ছিলো বড় বড়। রাসুলুল্লাহর কাছে তাদের এই অবয়ব এতই কুৎসিত লেগেছিলো যে, তিনি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলেন,

"তোমাদের ধ্বংস হোক, এমনটি তোমাদের কে করতে বলেছে?"

তারা উত্তর দিলো, "আমাদের প্রভু কিসরা।"

তিনি তখন বললেন,

"আমার পবিত্র ও সম্মানিত রব্ব আদেশ করেছেন, দাড়ি ছেড়ে দিতে ও গোঁফ ছোট রাখতে।"

(ইবনু জারির আত-তাবারি, ইবন সা'দ ও ইবন বিশরান দ্বারা নথিকৃত। আল-আলবানি একে হাসান বলেছেন।)

এখানে আল্লাহর জন্য "আদেশ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। খেয়াল করেছেন? আল্লাহর অবাধ্যতায় মগ্ন হওয়ার সময় আমাদের মনে রাখা উচিৎ, আল্লাহর একটি মাত্র আদেশের অবাধ্যতা করে শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো।

চার মাজহাবের শ্রেষ্ঠ চার ইসলামি স্কলার ইমাম আবু হানিফা(রহ), ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফিয়ী (রহ) আর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ) কী বলেছেন জানেন? তাঁরা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, শেইভ করা হারাম।

আমাদের সমাজে অনেক বিশিষ্ট এবং (অনেকের) অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গকে দেখবেন দাড়ি চেঁছে ফেলে পুরা গাল চকচকে বানিয়ে ফেলেন। অনেকে আবার সাথে বড়বড় গোঁফ রাখেন। অথচ এটাতো স্পষ্ট রাসুলের (স) বিরোধীতা। আমরা যেন তাদের অনুসারী না হয়ে, একমাত্র শ্রেষ্ঠ আর অনুসরণীয় মানব মুহাম্মদের অনুসারী হই এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে "প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট"দের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই।

শুধু দাড়ি রাখার কথা বললে আজ আর লেখা শেষ হবে না। তিনি আরো অনেক আদেশ ও নিষেধ করে গেছেন সেগুলোকেও জানতে হবে, এবং মানতে হবে। যেমন, তিনি মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন, এমনকি মজা করেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। উনার হাদীস থেকে আমরা জানি উনি নিজেও বেশ মজা করতেন। কিন্তু তাঁর একটাতেও অনর্থক কথা-বার্তা বা মিথ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি মিথ্যাকে এতই ঘৃণা করতেন। অথচ আমরা কথা-বার্তায় আড্ডাবাজিতে স্রেফ মজা করার জন্যে কতই না মিথ্যে বলি অনর্গল। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং তাঁর পথে চলা সহজ করুন।

তিনি আমাদের পায়ের গোড়ালির নিচে জামা পড়তে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন, অথচ আমাদের কাপড় গোড়ালি পেরিয়ে মাটির ধুলাবালি পরিস্কার করে।

বিদ'আত (দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু, যা তিনি করেননি এরকম কিছু) করতে নিষেধ করেছেন। ন্যায় কাজের আদেশ করতে আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে আদেশ করেছেন।

অথচ আজ আমরা ইসলামের সত্য নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে, দাঁড়াতে ভয় পাই। কাপুরুষের জীবনকে আমরা বেছে নিয়েছি, সম্মানিত জীবনের পরিবর্তে। আসলে কাকে ভয় করি আমরা? কার উপাসনা করি? কার পুজো করি? কার কথামতো চলি? আমাদের আসল মালিক আসলে কে? তোয়াক্কা করি কাকে? দুনিয়াকে, নিজের খায়েশ-প্রবৃত্তিকে, সমাজকে, নিজের উপার্জন কমে যাওয়ার আশঙ্কাকে, নিজের পরিচিতজনদের অসন্তুষ্টিকে, নাকি একমাত্র এবং কেবলমাত্র আল্লাহকে?

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ খেতে কড়াভাবে নিষেধ করেছেন, এমনকি সুদী কারবারে জড়িত থাকতেও মানা করেছেন। মাদক নিতে মানা করেছেন, অথচ সিগারেট ছাড়তে আমাদের কলিজা ছিঁড়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি স্বামী আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে "অসাধারণ" হতে বলেছেন, ভুলেও আব্বু আম্মুকে কষ্ট দিতে মানা করেছেন। মুসলিমদের সাথে বিনয় আর নম্রতার সাথে ব্যবহার

করতে আদেশ করেছেন, যদিও সেই মুসলিম রিকশাওয়ালা বা এই সেক্যুলার সমাজের নিচুস্তরের কেউ হয়। প্রতিবেশির হক আদায় থেকে শুরু করে যে ব্যক্তি শাসক হতে চায় তাকে শাসক হিসেবে নির্বাচিত না করার আদেশ, এভাবে জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক আদেশ করে গেছেন। তাঁর আদেশগুলো আমাদের মানতেই হবে। নইলে আল্লাহর কথামতোই আমরা "প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট"দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

এতদিন কি তবে ভুল পথে হেঁটেছি? আমার কি তবে আর রক্ষা নেই? আমিতো সলাত আদায় থেকে শুরু করে দাড়ি রাখা, কিংবা পর্দার বিধান থেকে শুরু করে পায়ের গোড়ালির উপরে জামা পরা, একেবারে প্রতিটা ক্ষেত্রেই আল্লাহর আর তাঁর রাসুলের (স) সরাসরি অবাধ্যতা করি। রাসুল (স) কে নিজের জীবনের চেয়ে কি আমি বেশি ভালোবাসি? নাকি নিজেকে, নিজের ক্যারিয়ারকে? জানি না। কিভাবে জানবো? উনার জীবনীই তো কোনোদিন ভালোভাবে মন দিয়ে পড়া হয়নি। উনাকেই তো চিনিনা, ভালোবাসবো কি করে? উনার আদেশ মানবো কিভাবে যদি উনার গুরুত্ব আর উনার আদেশের গুরুত্বই না বুঝি? তাই জানি না, মানিও না। হায়! আমিতো তবে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আমারতো ধ্বংস সুনিশ্চিত। আমার তো তাহলে আর কোনো আশা নেই। আমার তাহলে কি হবে?

না। ভুল কথা। আশা আছে।

তবে, এক্ষুনিই ফিরে আসতে হবে। এতদিনের ভূলের ভয়াবহতা বুঝতে হবে। মনেপ্রাণে অনুতপ্ত হতে হবে। ফিরতে হবে আল্লাহ আর রাসুলের (স) অবাধ্যতা থেকে। জানতে হবে কে আমাদের রাসুল (স)। তাঁর জীবনী জানতে হবে। পড়তে হবে তাঁর জীবনী নিয়ে রচিত বিশুদ্ধতম সীরাতসমূহ। শুনতে হবে তাঁকে নিয়ে, তাঁর সীরাত নিয়ে আলোচনা করা লেকচারগুলো। এতে করে তাঁকে আমরা চিনতে পারবো। জানতে পারবো এই অসাধারণ মানুষটা নবী হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে কিভাবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আর আমাদের কল্যাণের জন্যে নবুওয়্যাত পরবর্তী জীবনে কী দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই না গেছেন। কত অজস্র স্যাক্রিফাইস করে গেছেন শুধু আমাদের ভালোর জন্যে, আমাদের মঙ্গলের জন্যে। তাঁর বলে যাওয়া কথা আর আদেশগুলো (যেগুলো আমরা হাদীসে পাই) জানতে হবে। সীরাত পড়ার পর, শোনার পর, এই অসম্ভব সুন্দর মানুষটাকে চেনার পর, তাঁর বলে যাওয়া প্রতিটা শব্দের সাথে আমাদের অদ্ভুত ভালোবাসার একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে যাবে। সেগুলো মানতে আর কক্ষণো কোনো কষ্টই হবেনা। বরং আরো জানতে ইচ্ছে হবে। ইচ্ছে হবে এই মানুষটার মতো অসাধারণ হতে।

কুরআন আর সুন্নাহ আমাদেরকে মনেপ্রাণে গেঁথে নিতে হবে। পালন করতে হবে। কষ্ট হলে চেষ্টা করতে হবে। তবুও আল্লাহর দ্বীনের রশি আমাদেরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতেই হবে। দাঁত দিয়ে কামড়ে রেখে হলেও আঁকড়ে থাকতে হবে।

তাহলেই আমাদের আশা আছে। তাহলেই আশা করা যায়, আমাদেরকে আল্লাহ কবুল করে নেবেন। আশা করা যায়, আমরা সফলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

মন দিয়ে প্রতিটা কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখুন আল্লাহ কী বলেছেনঃ

“(হে নবী) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ফিরে এসো তোমার রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোনো দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবে না।

আর অনুসরণ করো তোমাদের রবের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিকগুলোর– তোমাদের ওপর আকস্মিকভাবে আযাব আসার পূর্বেই– যে আযাব সম্পর্কে তোমরা অনবহিত থাকবে। এমন যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে: “আমি আল্লাহর ব্যাপারে যে অপরাধ করেছি সে জন্য আফসোস। বরং আমি তো বিদ্রূপকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম।” অথবা বলবে: “কতই না ভাল হতো যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করতেন। তাহলে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম।” কিংবা আযাব দেখতে পেয়ে বলবে: “কতই না ভাল হতো যদি আরো একবার সুযোগ পেতাম তাহলে নেক আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।” (আর সে সময় যদি এ জওয়াব দেয়া হয়) কেন নয়, আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছিলে এবং গর্ব করেছিলে। আর তুমি তো অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে কিয়ামতের দিন আপনি দেখবেন তাদের মুখমন্ডল হবে কালো। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে যথেষ্ট জায়গা নেই? অন্যদিকে যেসব লোক এখানে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের সাফল্যের পন্থা অবলম্বনের জন্যই নাজাত দেবেন। কোনো অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না। আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।”

(সূরা যুমার: ৫৩–৬২)

আমি ভন্ড নইতো?

হঠাৎ করে একটা ধাক্কা দেয়া চিন্তা মাথায় আসলো। সেটা হলো নিজের মুনাফিক্বী বা ভন্ডামী নিয়ে। বুঝিয়ে বলি।

আমি বিশ্বাস করি আর নাই বা করি, মানি আর নাই বা মানি, এটাই সত্য যে মহাপবিত্র আল-কুরআন এক আল্লাহর বানী, এবং সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকেই দুনিয়ায় এই বাণী এসেছে। এটাই সত্য এবং অলরেডী প্রমাণিত। পবিত্র কুরআন নিজেই নিজের প্রমাণ। আমরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করি। আমাদের মাঝে কেউ ভাগ্যক্রমে আর কেউ বুঝে-শুনে মুসলিম। যেমন মুসলিমই হই না কেন, যদি "মুসলিম"ই হয়ে থাকি অর্থাৎ যদি ইসলামকেই আমার এই জীবনটাকে যাপিত করার একমাত্র পথ হিসেবে জানি এবং পালন করে থাকি, তাহলে আমরা এই একটা ব্যাপার কমবেশি জানি, প্রমাণ পেয়েছি এবং মনেপ্রাণে স্বীকার করি।

তাহলো, আল-কুরআন অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই দুনিয়ার কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। এই চুড়ান্ত আর পরিপূর্ণ রিভিলেশানের প্রত্যেকটা বাক্য, শব্দ, এমনকি অক্ষরগুলোও একমাত্র এবং কেবল মাত্র সবকিছুর ডিজাইনার আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, অবিকৃত রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। ঠিক?

যদি একমত হই তাহলে নিজের জন্যে এই প্রশ্নটা। আমি যদি সত্যিই পড়াশোনার মাধ্যমে খুঁজে পেয়ে, প্রমাণ পেয়ে বা না পেয়ে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে এই কুরআন দুনিয়ার বাইরের এক সত্ত্বার কাছ থেকে আমাদেরকে গাইড করার জন্যে, আমাদেরকে জ্ঞান দেয়ার জন্যে এবং সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাহলে তাঁর প্রতিফলন আমাদের জীবনে থাকবে। সবচেয়ে বড় প্রতিফলনটা কোথায় থাকবে? প্রশ্নটা নিজেকেই করতে হবে। নিজের বিবেকের জন্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখানেই থাকবে যে আমি কি নিয়মিত আল-কুরআন শিখছি? একটু একটু করে হলেও? আমি কি প্রতিদিন একটু একটু করে হলেও এর ভাষা শিখার চেষ্টা করছি? শিখার জন্যে কোনো স্কলার বা উস্তাতের কাছে যাচ্ছি? সেটাও সম্ভব না হলে এই যে ইংরেজীতে, এমনকি এখন বাংলাতেও অনলাইন এবং অফলাইনে এত সহজে কুরআন শিক্ষার এবং বোঝার কোর্স আছে তাতে কি ভর্তি হয়েছি বা হচ্ছি? আমি কি সত্যিই এই অসাধারণ বইটাকে এতদিন জানার চেষ্টা করেছি যেটা আমাকে, আমার চারপাশের মানুষকে পরিচালনা করার কথা? যে অসাধারণ বাণী আমি নিজে জেনে, বুঝে নিজের জীবনে প্রাণেপণে

প্রয়োগ করার কথা, পাশাপাশি এই যে দুনিয়ার সমগ্র মানুষের জন্যে যে কুরআন এসেছে তাদেরকে এই কুরআনের শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার কথা, সেই কুরআন কি আমি নিজে শিখেছি, শিখছি, বা অন্তত শেখার চেষ্টা কি করছি? আমার সাথে সেই কুরআনের প্রতিদিনের সম্পর্ক কেমন? আন্তরিকতার নাকি ধুলার আস্তরণের? শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের কথা বলছিনা, বলছি শেখার কথা, মূল এরাবিকে নিজের রাব্বের প্রতিটা বাণী বোঝার কথা, বোঝার চেষ্টার কথা।

দ্বীনের শিক্ষা আমাদের উপরে ফরজ করা হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার হলাম কি না, বায়োটেকনোলজিস্ট হলাম কি না, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হলাম কি না বা শক্ত একটা ক্যারিয়ার গড়লাম কি না সেটা নিশ্চয়ই এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটা মরণের ঠিক আগ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেট চালানোর জন্যে, এই ৫০-৬০ বছরের পিচ্চি জীবনটার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। অনন্তকাল যেখানে থাকবো সেখানের প্রস্তুতির জন্যে এই দ্বীনের শিক্ষা আবশ্যকীয়। এই দ্বীনের শিক্ষাই পারে আমাদের ক্যারিয়ারের কষ্টকে একটা মূল্য দিতে, মানুষের জন্যে কাজ করার একটা লক্ষ্য ঠিক করে দিতে। এই শিক্ষাটা শুধুমাত্র হুজুরদের জন্যে আর দাড়ি টুপিওয়ালাদের জন্যে নয়। যাদের কাছে মরণ আসবে এটা তাদের সবার জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ।

আবশ্যিক তথা ফরজের কথা বাদ ই দিলাম। কমনসেন্স কি বলে? যদি আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, আমাকে পরিচালনা করার জন্যেই এসেছে, এর কথাগুলো আমার জন্যেই, আমার জীবন কে ঠিকভাবে চালনা করার জন্যেই, তাহলেই কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কুরআন শেখার জন্যে পাগলের মতো দৌঁড়ানোর কথা না? আমার প্রভু, আমার আল্লাহ আমাকে কি বলেছেন সেটা অনুবাদ ছাড়াই একেবারে সরাসরি বোঝার জন্যে আমার কি মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা না? আল্লাহ নিজেই মানুষকে কুরআন শিখতে বলেছেন, একে নিয়ে ভাবতে বলেছেন, এর আলোয় জীবন গড়তে বলেছেন। এর জন্যে আল্লাহ কুরআন কে আমাদের শিক্ষার জন্যে সহজও করে দিয়েছেন, শুধু আমাদের কে চেষ্টাটা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের আহবান করছেন,

“আমি এ কুরআনকে উপদেশ লাভের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহনকারী কেউ আছে কি ?”

(সুরা ক্বামার: ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

সুরা ক্বামারে আমার আপনার প্রতি আল্লাহ এই আহবান চারবার করেছেন। তবুও কি সাড়া দিবো না?

আমার প্রিয় মানুষদের একজনের নাম হযরত উমার (রাঃ)। তিনি ছিলেন দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মাঝে একজন। এরপরেও তিনি কুরআনের কিছু আয়াত পড়তেন আর ঝরঝর করে কাঁদতেন পাগলের মতো। কেন? কারণ, কুরআনে মুনাফিক্বদের কথা এসেছে। তাদের বর্ণণা এসেছে, এসেছে তাদের জন্যে সবচেয়ে খারাপ রকমের শাস্তির কথা। আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ আছে যাদেরকে অনেক অনেক বুঝানোর পরেও, আন্তরিকতার সাথে দেখানোর পরেও কুরআনে বিশ্বাস করেনা। সবকটা সুযোগ পাওয়ার পরেও, আল্লাহর পরিস্কার সাবধানবাণী জানার পরেও এই অবিশ্বাসীরা যখন এক আল্লাহকে মানেনা, তাঁর পাঠানো বিধানকে অস্বীকার করে, তখন তাদের জন্যে অনন্ত শাস্তির কথা কুরআনে বর্ণিত আছে। এটা আমরা সবাই কমবেশি জানি। এটা কি জানি এই অবিশ্বাসীদের চাইতেও নিকৃষ্টতম এবং জাহান্নামের সবচাইতে ভয়াবহ শাস্তি নির্ধারিত আছে মুনাফিক্বদের জন্যে?

কারা এই মুনাফিক্ব? আল্লাহর পাঠানো জীবন বিধানকে মুখে স্বীকৃতি, অন্তরে স্বীকৃতি এবং কাজের মাধ্যমে প্রকাশ এই তিনটার যেকোনো একটা যদি আমার মাঝে না থাকে তাহলেই আমি মুনাফিক্ব। কেউ জেনে-শুনে-বুঝে মুনাফিক্ব। আর কেউ বুঝেই না যে সে আসলে মুনাফিক্ব। এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর। আপনি আমি ভাবছি, "আরিব্বাপ্রে, আমার নামটাতো ভাই মুসলমান নাম। আর নিজেরে যখন মুসলমান ঘোষণা দিছি, তাইলেতো জান্নাতের টিকিট আমার জন্যে কনফার্ম।

ভাই, হ্যাঁ, আল্লাহ পরম করুণাময়। তাঁর করুণা আর দয়ার কোনো শেষ নেই। তবে ভুলে যাওয়া যাবেনা তিনি কিন্তু একজন ন্যায় বিচারকও। আর এই কথাটাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। ন্যায় বিচার যখন তিনি করবেন, তখন কি আমরা পার পাবো? আমরা ঈমান এনেছি, আমরা সাচ্চা মুসলমান জাস্ট এই কথা বলেই কি আমরা পার পেয়ে যাবো? আল্লাহ কী বলেছেন আমাদের এই মানসিকতা নিয়ে?

"লোকেরা কি মনে করে রেখেছে,

'আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?

(*সুরা আনকাবুত*: ২)

এখানেই শেষ নয়। তিনি এত করুণাময়, এত দয়া আর মেহেরবানী তাঁর যে তিনি বারবার কুরআনে আপনাকে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে আমরা

আমাদের মেন্টালিটি ঠিক করি, এবং অবশ্যই সফল হই, শাস্তির অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। বাতিলদের দলে না চলে যাই। তিনি আরো বলেছেন,

"তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী(ঈমানদার) গন। তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"

(আল বাকারাহ: ২১৪)

আরো বলেছেন,

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী"

(আলে ইমরান: ১৪২)

কাজেই, জাস্ট "আমি মুসলিম" এটা মুখে দাবী করে, তারপর যা ইচ্ছে তা করে পার আমি পাবো না। আমাদের প্রতিদিনের ভন্ডামী নিয়ে, মুনাফিক্বী নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। বুঝতে হবে, ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসতে হবে। চিন্তা করে দেখতে হবে প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য মুনাফিক্বী আমার ধ্বংসের কারণ হবে নাতো? আমার মধ্যে মুনাফিক্বী নেই তো? আমি কি আল্লাহর আর রাসুলের (স) আদেশ মেনে চলি, নাকি নিজের খেয়াল খুশিমতো জীবনটাকে পরিচালনা করি? হয়তোবা আমার দাড়ি আছে, আমি হিজাব-নিক্বাব করি, কিন্তু এগুলাতো বাইরের ব্যাপার। ভিতরে? কিংবা এমন কোনো মুনাফিক্বী আমি করছি নাতো যেটাকে আমি মুনাফিক্বী হিসেবে জানিই না? হযরত উমার(রা) জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েও সেই অপ্রকাশ্য মুনাফিক্বীকেই বেশি ভয় পেতেন, ভাবতেন নিশ্চয় মুনাফিক্বীর এই ভয়ংকর আয়াতগুলো তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে আর আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে ঝরঝর করে কাঁদতেন আর তাঁর দাড়ি ভিজে যেতো।

আমরা এত্ত নিশ্চিন্ত অথচ আমরা কেউই জান্নাতের সুসংবাদ পাইনি। 'উমার(রা) এর জীবন থেকে এই শিক্ষা পাই যে সুসংবাদ পেলেও নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকতো না। আমরা বেশিরভাগ 'তথাকথিত মুসলিম' ই জেনেশুনে

আল্লাহর আর তাঁর রাসুলের (স) অবাধ্য, ফলে আল্লাহর ঘোষিত প্রকাশ্য পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। এ নিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

"আর যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।"

(সূরা আল–আহযাব: ৩৬)

অন্যদিকে, যারা জেনেশুনে অবাধ্যতা করেন না তাঁরা হয়তো অনেক বিষয়েই না বুঝে, না জেনে অবাধ্যতা করেই যাচ্ছেন, আর প্রকাশ্য পথভ্রষ্টদের কাতারে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করছেন। অথচ দ্বীনের জ্ঞান থাকলে, কুরআন অধ্যয়নের সাথে থাকলে এই সুযোগটা অনেক অনেক কম থাকতো।

আমি সমাজে নিজেকে মুসলিম বলি। আসলে ভিতরে আমি কি সেটা আমি আর আমার আল্লাহই ভালো জানি। সমাজের চোখে আমি বেশ ভালো, ফেইসবুকে আমি বেশ ভালো ভালো কথা বলি, আল্লাহর আর তাঁর রাসুলের (স) কথা বলি, তার মানে এই না যে আমার মাঝে ভন্ডামী নাই, মুনাফিক্বীর বীজ নাই। কুরআন আল্লাহর বাণী, এক আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, এবং সেই বানী অনুযায়ীই আমার পুরা জীবন সাজানোর কথা বলে আমি দাবী করি, অথচ নিজেই সেই কুরআনকে কখনো জানতে চাই না, স্টাডি করি না, শিখার চেষ্টা করি না। এটা কি আমার ভন্ডামী না? আমি নিজের জীবনকে কুরআনের আলোকে সাজাই না যেভাবে সাজিয়েছেন রাসুলুল্লাহ (স) আর তাঁর সাহাবারা। নানান রকম টালবাহানা করি। কেউ কুরআনের আলোয় জীবন সাজাতে বললে, কুরআনের কোনো আইন মনে করিয়ে দিলে সাথে সাথে মুখ ফিরিয়ে নিই 'পরে করবো' বলে। এটা কি আমার ভন্ডামী না? কেউ যখন কুরআন শিখতে বলে, জানতে বলে, এবং কুরআন অনুযায়ী চলতে বলে তখন তাঁকে বলি, নিজেকে বলি, "হায়রে! আমারতো সময় নাই। কত কাজ! কত ব্যস্ততা! পরে যদি সময় পাই দেখি।"

ভাইরে, আমাদের এই "পরে সময় পাওয়া" আর হবে না। আমাকে কাফনে পেচিয়ে কবরে শুইয়ে আসার পরে আমার ডিপার্টমেন্ট, অফিস, ফ্যামিলি সব আবার নিজের নিয়মেই চলতে থাকবে স্বাভাবিক নিয়মে। থাকবো না শুধু আমি। যে দুনিয়ার পিছে ছুটে আমি দ্বীন মানি না, সেই দুনিয়ার বুকেই গর্ত খুঁড়ে যখন শুইয়ে দেয়া হবে, তখন এটাই জিজ্ঞাস্য হবে যে আমার এই জীবন দ্বীনের জন্যে ছিলো কি না? এই ক্যারিয়ার, ফ্যামিলি, বন্ধু বান্ধবের জন্যে আজ আমি সময় পাই

না। এই দুনিয়ার ব্যস্ততায় যে আল্লাহ আর রাসুলের (স) অবাধ্যতা করে যাচ্ছি সেই অবাধ্যতাই কি ঐ জীবনের জন্যে একমাত্র সম্বল হিসেবে নিয়ে যাচ্ছি? অথচ এই দুনিয়ার নিজের এই সামান্য প্রাপ্তিগুলো কোনো কাজেই আসবেনা ওই অনন্ত দুনিয়ায়। আজ থেকে নয় বছর আগে দেয়া মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টটা, সাত বছর আগের ইন্টারের রেজাল্টটা ঐসময় আমার জীবন মরণ সমস্যা ছিলো। কিন্তু সেটা আজ যেমন আমার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে গেছে, তেমনি মৃত্যুকালে পুরো জীবনে নিজের সব প্রাপ্তিকেই মূল্যহীন মনে হবে। এটা চেইনের মতো। একটার পর একটা চাওয়া আসবে, আসতেই থাকবে, এর কোনো শেষ নেই। এর মাঝে কোনোদিন আর সময় হবে না।

আমরা ভুলে যাই এই ভালো রেজাল্ট, প্রমোশান, চাকরী আর প্রাপ্তিগুলো আল্লাহরই দেয়া নিয়ামাত। আমি ভুলে যাই যে আমার রিজিক, এই জীবনে আমার যা যা প্রয়োজন সব আল্লাহই দিবেন। তিনি সবই ঠিক করে রেখেছেন, নির্দিষ্ট করে রেখেছেন আমার জন্যে। আমার এই প্রাপ্তিগুলো, এই নিয়ামাতগুলো ঐ জীবনে কোনো কাজেই আসবে না, যদি না এই নিয়ামাত পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ হই। যিনি এই নিয়ামাত দিয়েছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর দেয়া জীবনবিধান মেনে চললে, তাঁর এই নিয়ামাত গুলোর সঠিক ব্যবহার করলেই কেবল এগুলো কাজে আসবে। অন্যথায় এই নিয়ামাতগুলোর হিসেব আমরা কিভাবে দেবো? এই নিয়ামাতগুলোই তো সেইদিন আমাদের জন্যে বোঝা হয়ে আসবে যেদিন আল্লাহ এগুলোর প্রত্যেকটার হিসেব নিবেন। এই দুনিয়ায় যা পেয়ে আমি-আপনি নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছি ঐ জীবনে তাই তো আমাদের জন্যে হিসেবের বোঝা হয়ে যাবে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তিনি আমাদেরকে দেয়া প্রত্যেকটা নিয়ামাতের হিসেব নেবেন।

"তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবেই।"

(*সুরা আত–তাকাসুর: ৮*)

কী জবাব দেবো? এই সুস্থ শরীর, প্রত্যকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চাবি ঘুরালেই, জগ ঢাললেই বিশুদ্ধ পানি, হাঁটার জন্যে পা আর জুতা, নিয়মিত এত খাবার, এত স্বচ্ছলতা, ইন্টারনেট কানেকশান, টাইপ করার জন্যে আঙ্গুল, ভার্সিটি-কলেজে পড়াশোনার চান্স, ডিগ্রী, জব, ক্যারিয়ার, আম্মু আব্বুর আদর, মাথার উপরে একটা ছাদ থেকে শুরু করে লিস্ট করলে এই নিয়ামাতের শেষ হবে কি? প্রত্যেকটা নিয়ামাত নিয়ে যখন জিজ্ঞেস করবে জবাব দিতে পারবো? সম্ভব?

জানতে হবে।

তবুও কি আমরা কৃতজ্ঞ হবো না? আমরা কি বুঝবো না শুধু সচেতনতার সাথে আল্লাহর জন্যে আমাদের করা কাজগুলোই আমাদের সাথে যাবে? আর কিছুই কাজে আসবে না, সঙ্গে যাবে না। কাজে আসবে শুধু আমার ভালো কাজগুলো। একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর জন্যে করে যাওয়া কাজগুলো। সেই কাজগুলো সম্পর্কে জানতে হলে আমাকে সচেতন হতে হবে, জানতে হবে নিজের দ্বীনকে। কুরআন শেখা শুরু করতে হবে, রাসুলের (স) জীবনকে জানা আর মানা শুরু করতে হবে। চিনতে হবে নিজের সাথে, আর আল্লাহর সাথে এতদিন ধরে করে যাওয়া ভন্ডামীগুলোকে। শোধরাতে হবে।

আজ থেকে নিজের মুনাফিক্বী সম্পর্কে,

ভন্ডামী সম্পর্কে ভাবার জন্যে, জানার জন্যে, সচেতন হওয়ার জন্যে, এবং পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে এইটুকুই কি যথেষ্ট না?

আজকেই কি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়নের জন্যে, কুরআনকে সরাসরি বোঝার জন্যে প্রথম পদক্ষেপটা নেবো না?

আসুন আল্লাহ আমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞ হই, তাঁকে সিজদায় গিয়ে কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাই মন থেকে। তারপর কুরআন অধ্যয়ন করা শুরু করি, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, চেষ্টা করি। বাকিটা তিনিই সহজ করে দিবেন ইন শা আল্লাহ।

টানটান থ্রীলারের অংশবিশেষ

যেন টানটান উত্তেজনার থ্রীলার পড়ছিলাম। আসলে থ্রীলার মুভিকেও হার মানায় এটা। কারণ, এটা গল্প নয়। একদম জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা। এত বি-শা-ল কাহিনীতো বলতে পারবো না, তবে ঘটনার সবচেয়ে মজার অংশটা এখানে আমার অনুভূতি অনুযায়ী শেয়ার করছি।

ঘটনার ফোকাস একজন টগবগে তরুণ। একদিন একজনকে ভুলে খুন করে ফেললো সে। নিজ দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলোনা তার। কারণ, তাকে পেলেই মেরে ফেলা হবে এটা সে বুঝতে পেরেছিলো। অবশেষে দেশ ছেড়ে অতি সন্তর্পনে পালাতে সে সক্ষম হলো। আরেক জায়গায় পৌছালো সে। হাতে কোনো টাকা নেই, পকেটে একটা পয়সা নেই। কোনো চাকরীও নেই যে টাকা কামাবে। বেকার এক যুবক সে।

নিজের জীবনের এই দূর্বিষহ কথাগুলো সে বলছিলো তার সামনের অচেনা একজন জ্ঞানী মানুষকে। এর চেয়ে দুঃসহ জীবন একজন পুরুষের জন্যে হতে পারেনা। আমি যখন পড়ছিলাম তখন তরুণের দূরাবস্থা আমার চোখে ভাসছিলো। নিশ্চয়ই তার বুকে বিশাল জমানো ব্যথা ছিলো। নিজের তীব্র কষ্ট, যন্ত্রণা আর দূর্দশার পাহাড়ের কাহিনী যখন সে তার সদ্য পরিচিত বয়োজ্যোষ্ঠ মানুষটিকে বলছিলো তখন তার বুকটা নিশ্চয়ই কষ্টে মুচড়ে হাহাকার করে উঠছিলো। সামনের অসাধারণ মানুষটা যুবকের সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তরুণের জীবনের এই ভয়াবহ ঘটনাগুলো শুনে এই প্রায় অপরিচিত জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান মানুষটা তাকে সান্ত্বনা দিলেন, অভয় দিলেন। বললেন,

“ভয় করো না, এখন তুমি অত্যাচারীদের হাত থেকে বেঁচে গেছো।”

আরো কী করলেন জানেন?

তিনি পুরোপুরি অপরিচিত এই দূর্ভাগা তরুণকে একটা অবাক করা অফার করে বসলেন। অনুরোধ করলেন, পলাতক, খুনী, গরীব, অবৈধ অভিবাসী, কাজকর্মহীন বেকার তরুণটা যেন তাঁর আদরের কন্যাকে বিয়ে করে। এবং সেই সাথে একটা জব অফারও দিলেন। অবাক তরুণের এক্সপ্রেশান কি ছিলো তা আমি জানিনা, তবে তার জায়গায় আমি থাকলে আমার নিচের চোয়ালটা লুজ হয়ে টুইংং করে ঝুলে পড়তো এটা নিশ্চিত। এই মানুষটা তার মেয়েকে বিয়ের করার প্রস্তাব

দিচ্ছেন? তাও আমাকে? আমার মতো একটা খুনীকে? এমন একজন ভয়ংকর পলাতককে যাকে তারই দেশের পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে মেরে ফেলার জন্যে? যার পকেটে একটা টাকা নেই? মাথা গোঁজার ঠাই নেই, এমনকি এক বেলা খাবারও নেই যার, তাকে? আজিইইব!

এরপর আমাদের ঘটনার নায়ক সেই ঝকঝকে তরুণ মুসা আলাইহিসসালাম, প্রজ্ঞাবান আর জ্ঞানী নাবী শুয়াইব আলাইহিস সালামের কন্যাকে বিয়ে করলেন।

এই অতি অসাধারণ ঘটনাটা আমাদের পরম প্রজ্ঞাময় রাব্ব সমগ্র মানবজাতির প্রতিটা সদস্যের অনুসরণের জন্যে তাঁর পাঠানো পরিপূর্ণ আর চূড়ান্ত গাইডেন্স পবিত্র আল-কুরআনের সুরা ক্বাসাসের শুরুতেই রেকর্ড করে রেখেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কুরআনে একটা ঘটনা বিবৃত করেন তখন সেটা আমাদেরকে শুধুমাত্র ইতিহাস জানানোর জন্যে করেন না, বরং এর প্রতিটা আয়াত, প্রতিটা শব্দ তিনি এত অসাধারণভাবে সজ্জিত করেন যেন তা নিয়ে আমরা গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করি, শিক্ষা নিই, সেই অনুযায়ী জীবনটাকে সাজাই, আর সামনের দিকে হাসিমুখে এক বুক সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই।

ইতিহাসের এই অসাধারণ মজার ঘটনা থেকে আমরা যারা তরুণ (বিশেষ করে যারা এখনো "আবিয়াইত্যা"), যাদের জীবনে একের পর এক শুধু দূর্ঘটনাই ঘটছে, ভয়াবহ দুঃসময় যাচ্ছে, নিজের চারপাশের ঘটে যাওয়া পরীক্ষাগুলো জীবনটাকে আরো কঠিন করে দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যাদের কেবলই কষ্ট আর দূর্দশা চেপে ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে, আর গলার ঠিক মাঝখানে জন্ম দিচ্ছে বড় বড় অসহ্য গ্রানাইট পাথরের, যাদের কাছে জীবনে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা, কিছু করতে পারাটা, কিছু অর্জন করাটা অসম্ভব হয়ে গেছে, তাদের জন্যে এক অসাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

সেটা হচ্ছেঃ

দু'আ করা। মন থেকে দু'আ করা। আল্লাহু আযযাওয়াজালের উপর পরিপূর্ণ ভরসা রেখে দু'আ করা। নিজের উপর নয়, নিজের কাজের উপরেও নয়, একমাত্র আল্লাহর উপরেই পরিপূর্ণ ভরসা করে, মনে পূর্ণ আশা নিয়ে এমনভাবে দু'আ করা যেন এই কথা হৃদয়ে থাকে যে, আমার পরম করুণাময় আর অসীম দয়ালু প্রতিপালক, যিনি আমার জন্মেরও আগে থেকে আমার আব্বু আম্মুকে দেখাশোনা ঠেইক কেয়ার করার মাধ্যমে আমার জন্যে এই জীবনকে সুন্দর করেছেন, আমার জন্মের সূচনালগ্ন থেকেই যিনি আমাকে চরম যত্নে প্রতিপালন করছেন, এবং এখনো প্রতিটা মূহুর্তে পরম আদরে আমার দেখাশোনা করছেন, তিনি অবশ্যই

আমার কথা শুনছেন, নিশ্চয়ই তিনিই এর দেখাশোনা করবেন, আর তিনি ছাড়া আমার দেখাশোনা করার তো আর কেউ নেই। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, আর আমরা সবাই কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী।

সুরা ক্বাসাস পড়ার সময়ে দেখবেন, ঠিক এই ঘটনার বর্ণণার আগেই মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন এই বলে যে,

رب أ ني لما أنزلت ألي من خير فقير

"হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই আপনি আমার প্রতি নাযিল করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী।"

আর তারপরেই মুসা আলাইহিসসালামের জীবনে যা অসম্ভব একটা ঘটনা ছিলো তা উপহার হয়ে এলো। আজ আমার আর আপনার জন্যে যেটা পরিপূর্ণ অসম্ভব মনে হচ্ছে, সেটা চলুন না আল্লাহকে গিয়েই বলি। সালাতে দাঁড়িয়ে যাই, সিজদাতে গিয়ে আল্লাহকে সব খুলে বলি মনে যত কথা আছে, স-ব। যত অসম্ভবই হোক না কেন তিনিই সব ঠিক করে দেবেন আমাদের জন্যে যদি তা আমাদের জন্যে কল্যাণকর হয়। তাঁর অসাধারণ রাহমাতের দরবারে উঠানো বান্দার হাতকে ফিরিয়ে দিতে তিনি বড়ই লজ্জা বোধ করেন। যতই চাইবো, ততই তিনি খুশি হবেন। আমরা যেন নিরাশ না হই যে কেন দু'আ কবুল হচ্ছে না।

একটা কাঁচে পাথর মারা হচ্ছে তো হচ্ছেই, তবু সেটা ভাংছে না। অনেক পাথর ছোঁড়ার পর অবশেষে একটা ছোট্ট পাথরের আঘাতে সেই বিশাল কাঁচটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে গেলো। কাঁচ কিন্তু ঐ শেষ পাথরের আঘাতে ভাঙ্গেনি, বরং আগে থেকে ছুঁড়ে আসা প্রতিটা পাথরের টুকরাই ঐ কাঁচের ভেঙ্গে পড়ার জন্যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। দু'আও ঠিক তেমনি। আমরা দু'আ করতে থাকবো, করতেই থাকবো প্রাণেপণে। দু'আর আন্তরিকতা যতো বেশি শক্ত হবে, রাব্বের উপরে ভরসা যতো বাড়বে, কাঁচের উপরে দু'আর আঘাত হবে ততোই শক্তিশালী।

দু'আর উত্তরটা "হ্যাঁ" হওয়াটা যদি আমাদের জন্যে কল্যাণকর হয়, তাহলে কাঁচ ভাঙ্গবেই। আমাদের যে তাকে ভাঙ্গতেই হবে।

এলার্ম! এলার্ম!!

আপনি জন্মসূত্রে অমুসলিম বা মুসলিম যাই হোন না কেন, আপনাকেই বলছি। কোনো ভনিতা ছাড়াই। প্লিইইইজ। মন দিয়ে শুনুন। খুব খেয়াল করে শুনুন। যথেষ্ট হয়েছে! আর কত?

জ্বি। এটা সায়েন্স ফিকশানের চাইতে বেশি কিছু। খুব খুব বেশি কিছু। হ্যাঁ, আমাকে, আপনাকে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। একেবারে এই দুনিয়ার বড় ঘটনাগুলো থেকে, পরের জীবনের বড় বড় সব, একদম স-ব ঘটনা পুরোপুরি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

কেউ মূর্তির, কেউবা আবার চাকরীর, কেউ টাকার, সুখের, সম্পদের, ডিগ্রীর, খ্যাতির, সম্মানের, সৌন্দর্যের, আর কেউ নিজের খায়েশের-প্রবৃত্তির পূজা করছেন। হ্যাঁ,হ্যাঁ, পূজাই করছেন আপনি। পুরাটা জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন এগুলোর জন্যে। আপনি জানেন এগুলো। হ্যাঁ, আপনাকে জানানো হয়েছে সব। আপনি জানেন যে শেষ পর্যন্ত, অনন্তের জীবনে এগুলো কাজে আসবে না, তবুও আপনি এগুলোর পিছনেই ছুটছেন তো ছুটছেনই।

কেনো?

উত্তর দেন।

নিজেকেই উত্তর দেন।

হ্যাঁ, আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, মেধা দেয়া হয়েছে। আপনি পড়তে জানেন, লিখতে জানেন, বুঝেন ভালো, আঁকেন ভালো, গণিতে ভালো, আপনার গলাও ভালো। গুড! ভেরি গুড! আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন যে আপনাকে দেয়া এই প্রত্যেকটা নি'আমাতের হিসেব দিতে হবে? দিতে হবেই। আপনি কিভাবে এইগুলা দিয়ে নিজের আরামের পূজা করেছেন, আপনার আসল গন্তব্যের কাজ ভুলে, সেইটা জিজ্ঞেস করা হবে। পাইপাই করে হিসেব নেয়া হবে প্রত্যেকটা দায়িত্বের। মনে আছে তো?

আল্লাহ একজনই।

আবারো বলছি, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, পূজনীয়, আর কেউ না, কেউ না।

উপাস্য একমাত্র তিনিই।

মূর্তির, চাকরীর, টাকার, সুখের, সম্পদের, ডিগ্রীর, খ্যাতির, সম্মানের, সৌন্দর্যের, আর নিজের খায়েশের-প্রবৃত্তির পূজা আপনার করার কথা না, এই গোলামী করার কথা না আপনার। আপনি মানুষ। বিবেক আর বুদ্ধিটা খাটান। আপনার এই সব গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র এক আল্লাহর গোলামী করার কথা। এইটাই আপনার জীবনের গন্তব্য, উদ্দেশ্য ও কাজ। এজন্যেই এই দুনিয়ায় আপনাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমি মনে করিয়ে দিলাম আবারো। কিভাবে করবেন গোলামী? কিভাবে আপনার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে গেছেন সব। উনাকে ফলো করলেই সব জেনে যাবেন। সব করা হয়ে যাবে।

আপনাকে সব জানিয়ে দেয়ার পরও, সব জেনেও আপনি বারবার অবহেলা করে যাচ্ছেন। কেন? সেটাও আপনাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। শাইত্বান আপনার প্রকাশ্য শত্রু, এটা আপনাকে আল্লাহ পইপই করে বলে দিয়েছেন, ভুলতে মানা করেছেন। শাইত্বান আপনাকে এই পরীক্ষায় পাশ করতে দিতে চায় না, তাই আপনাকে আক্রমণ করতেই থাকবে একটানা, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন। সে অবিরাম আপনাকে এই দুনিয়ার চাকচিক্য আর নানান প্রাপ্তির লোভ দেখায়ে আপনাকে আপনার আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দিবে, সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। এই দুনিয়াটা একটা ভ্রান্তি, প্রতারণা। এটাও বলে দিয়েছেন। এটা পরীক্ষার হল, যার ফলাফল ভোগ করবেন অনন্তকাল ধরে। বলে দিয়েছেন এটাও।

কী করলে এই পরীক্ষায় গোল্ডেন এ+ পাবেন, কী করলে ডাবল জিরো কপালে জুটবে তাও বলে পরীক্ষার হলে থাকা অবস্থাতেই আরেকজনকে পাঠিয়ে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন পরিস্কারভাবে। পরীক্ষার প্রশ্নগুলাও বলে দিয়েছেন, সঠিক উত্তরও জানিয়ে দিয়েছেন। দেননি? তারপরো আপনি অন্য কিছুর পূজা করে কেন নিজেকে ফেইল করাচ্ছেন? কেন দুনিয়ার প্রাপ্তির দিকে দৌড়াতে গিয়ে বারবার, বারবার, বারবার রেজাল্ট কার্ডের অনন্ত ফলাফলের কথা ভুলে যাচ্ছেন? কেন? কেন? অনন্ত শব্দটার মানে কি আপনি বুঝেন না? আপনার মাথায় ঢুকেনা? হ্যাঁ? আর কতবার বললে, আর কতজনের মৃত্যু দেখার পর বুঝবেন যে আপনিও এভাবেই হঠাৎ চলে যাবেন? আর কত কবরস্থান চোখে পড়লে আপনি চোখ মেলবেন? নিজের চোখে আর কয়জনের চলে যাওয়া দেখে নিজের চলে যাওয়াটার কথা মনে পড়বে? কবে ব্যাগ গুছানো শুরু করবেন? কবে? হঠাৎ করেই যাওয়ার সময় হবে, কেন ভুলে যান বারবার। কেন?

বুক কাঁপে না?

সেই কাঁপুনি কেন ভুলে যান?

আপনার বুকের গভীরে আপনিতো সত্যটা জানেন।

তবু মানছেন না কেন? কেন বদলাচ্ছেন না?

মনে রাখবেন, এখনই যদি না বদলান, এখনই যদি লজ্জিত হয়ে, অনুতপ্ত হয়ে, তাওবা করে ফিরতে না পারেন, প্রতিটা ভুলের সাথে সাথেই যদি তাওবা করে, মাফ চেয়ে না ফিরেন, হয়তো ভুলের উপরে থাকা অবস্থাতেই আপনার মৃত্যু হবে। আমার অনেক আত্মীয়কে, বন্ধুকে আমি দেখেছি ভুলের উপর থাকতে থাকতে ঐ অবস্থায়ই সে বিদায় নিয়েছে। আমাদের অবস্থাও কি ঐরকমই হবে? ওরাও অনেক মৃত্যু দেখেছিলো, অনেক ওয়ার্নিং শুনেছিলো। পাত্তা দেয়নি। যা করছিলো, থামায়নি। থমকে গিয়ে ভাবেনি, কি করছি আমি? তারপর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নিজেকে না বদলিয়ে হঠাৎ ডাকে বিদায় নিয়েছে।

আমিও কি এভাবেই অবহেলায় জীবন কাঁটাতে কাঁটাতেই বিদায় নেবো?

নিজেকে এই প্রশ্ন করি আসুন।

হয়তো সব জেনে, সব বুঝেও আপনি আর কখনোই বদলাবেন না।

সুন্দর আর আরামের রাস্তাটা জাহান্নামের দিকে গেছে জেনেও হয়তো আপনি ঐ পথই পছন্দ করছেন, হয়তো ঐখানে গিয়েই থামবেন। যদি তাই করেন, তাহলে মনে রাখবেন, পৃথিবীর জীবনে যদি আপনি জাহান্নামের পথেই হাঁটেন সব জেনে-বুঝেও, যদি আরাম আর খায়েশ পূরণ করতে গিয়ে সেই অবৈধ আনন্দের পথটাকেই নিজের জন্যে বেছে নেন, তবে জেনে রাখেন, আল্লাহ কারো উপর জুলুম করেন না, জোর করেন না। আপনার বেছে নেয়া গন্তব্যটাই, যে পথে আপনি সারাজীবন কাজ করে গেছেন, সেই গন্তব্যেই তিনি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। জোর করে আপনার সারাজীবনের কাজের বিরুদ্ধে তিনি আপনাকে জান্নাত চাপিয়ে দিয়ে আপনার উপর অন্যায় জুলুম করবেন না। নিশ্চয়ই তিনি ন্যায় বিচারক। অথচ, আপনার নেয়া প্রতিটা নিঃশ্বাস আপনাকে এখনো বলেই যাচ্ছে যে এখনো তাওবার রাস্তা খোলা। এই মূহুর্তে যে নিঃশ্বাসটা নিলেন, সেটা আপনাকে এইমাত্র এটাইতো বলে দিলো যে, এই মূহুর্তটাও আপনাকে ফিরে আসার জন্যেই দেয়া হয়েছিলো। বলে দিলো যে, ফিরে আসার রাস্তা খোলা এখনো। খোলা জান্নাতের রাস্তা আর দরজাগুলো। এখনো খোলা। আরো একটা মূহুর্ত কিন্তু চলে গেলো।

ফজরের সালাত চ্যালেঞ্জ

সম্ভবত আমার মতো আলসিয়া যারা আছেন তাদের সবারই জীবনে ফজরের সালাত একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিন এত করে চাই, তবুও ফজরের সালাত মিস হয়। এত আলসিয়া মানুষ আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। তাড়াতাড়ি শুতে যাই। ভয়াবহ এলার্ম সেট করি। কোনো লাভই হয় না। এমনকি, ঘুমের মাঝেই এলার্ম কিভাবে বন্ধ করে দিই সেটাও এক রহস্য। এটা নিয়ে প্রতিদিন আমার মন খারাপ হয়ে থাকতো। সারাদিন নিজেকে ফালতু মনে হতো। দিন যদি শুরুই হয় একটা চরম ব্যর্থতা দিয়ে, শাইত্বানের সাথে যুদ্ধে হেরে গিয়ে, কেমন লাগে? আর বেশি খারাপ লাগে কারণ, আমার সাথে শাইত্বান প্রায় বিনা যুদ্ধেই জিতে যায়, ব্যাটার বোধহয় যুদ্ধই করতে হয় না আমার সাথে। কেবল আমাকে কানে কানে বলে দেয়,

"এইতো আর পাঁচ মিনিট ঘুমিয়ে নাও। তারপরে নামাজ পড়বা আর কি! গতকাল তোমার উপরে যা ধকল গেছে!! ঘুমেরও দরকার আছে। আর পাঁচ মিনিটই তো মাত্র।"

আমিও খুশি হয়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে শুয়ে পড়ি। যা হবার তাই হয়। আমার প্রতি আমার রাব্বের ডাক অবহেলায় পড়ে থাকে। বিষন্ন লাগে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, অনেকদিন ধরে একদিনও ফজরের সালাত মিস হয়নি। নিজে উঠে, বাসার সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। কিভাবে? মাত্র চারটা কাজ করলেই হয়। দাঁড়ান, খুলে বলি আপনাকে।

প্রথমত, আপনি যত কাজের কাজীই হোন না কেন, দুনিয়ার যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন সব রাত ১০টার আগেই শেষ করবেন। দিনকে ওভাবেই সাজিয়ে নিন, সব কাজ শেষ করুন। কিভাবে করবেন? আমি কি জানি? ওইটাতো আপনাকেই বের করতে হবে। করতেই হবে। তারপর ভালোভাবে, সুন্দর করে ওজু করে, রাত ১০টা ০১ মিনিটে আপনার নিজেকে বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় আবিস্কার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মোবাইলে এমন সাউন্ডের এলার্ম বাছাই করুন যাতে ঘুম অবশ্যই ভাঙ্গে। হাতের নাগালে মোবাইল রাখেন কেন, হ্যাঁ? খুব চালাক, না? দূরে মোবাইল রাখবেন, যেন উঠে গিয়ে বন্ধ করতে হয়। আমার মতো অলস

অবোধদের জন্যে এলার্মের আওয়াজ সুমধুর না হয়ে বিরক্তিকর হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, মোবাইল দূরে রেখে দেয়ার পরে অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দুই গ্লাস পানি নিবেন। বসবেন। কারণ, পানি তো বসেই খেতে হয়। তারপর গ্লাস টেবিলে রেখেই শুয়ে যাবেন। চোখ বন্ধ করার আগে আল্লাহর সাথে একটু কথা বলে নিন, বলুন,

"ও আল্লাহ, আপনি ছাড়া আমাকে সাহায্য করার কেউই নাই, কেউ না। প্লিজ আমাকে সাহায্য করেন, যাতে ফজরের সালাত অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই পড়তে পারি। দয়া করেন ইয়া আল্লাহ । আমাকে সাহায্য করেন। আপনি হেল্প করলে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।"

তারপর, *"আল্লাহুম্মা বি-ইসমিকা, আমুতু ওয়াহইয়া"* বলেই চোখ বন্ধ করুন। আর কোনো কাজ নয়।

এলার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গবেই। এলার্ম অফ করতে উঠে টের পাবেন যে আপনার ব্লাডারেও এলার্ম বাজছে। হেহেহেঃ ওই এলার্ম থামাতে আপনাকে টয়লেটে যেতেই হবে। ব্যাস! আর কি লাগে?

চতুর্থত, আপনি যদি মহা আলসিয়া হোন? যদি "বিছানা ভিজাবো, তবু উঠবোনা যে উঠবোনা" টাইপের হোন সেইজন্যে আপনার জন্যে চূড়ান্ত স্টেপ। সিদ্ধান্ত নিন, কালকেও যদি ফজরের সালাত মিস হয় তাইলে আমার শাস্তি আছে। কি শাস্তি? শাস্তিটা হলো,

"যদি ঠিক ওয়াক্তে ফজরের নামাজ না পড়া হয়, কাজা হয়ে যায়, তাহলে আমাকে এক হাজার টাকা দান করে দিতে হবে ঐদিনই।"

আপনি অনেক ধনী হলে টাকার এমাউন্ট বাড়িয়ে নিন, আর গরিব হলে কমিয়ে নিন।

তবে মনে রাখবেন, রুলস হলো,

টাকার এমাউন্ট টা এমন হওয়া যাবে না যেটা দিতে আপনার কোনো অনুভূতিই হবে না । এমন হতে হবে, যেন সেটা দিতে কলিজায় আঘাত লেগে আপনি ব্যাকা হয়ে যান । সেটা দেয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আপনাকে অবশ্যই উঠতে হবে। যদি না উঠেন, তাহলে ঐদিন সকালেই টাকাটা দান করে দিবেন। হ্যাঁ, ঐদিনই ।

ফরজ ইবাদাত মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আপনি নফল ইবাদাত, দান, সাদাকা লুকিয়ে করবেন, কিন্তু ফরজ ইবাদাত গুলোর বেশিরভাগই একসাথে করতে হয়। এতে ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত হয় একজন আরেকজনকে সাহায্য করার মাধ্যমে।

কাজেই, আপনার নিজের ভাই-বোন, সম্ভব হলে আব্বু-আম্মু আর বন্ধু বান্ধবদেরকেও সংযুক্ত করুন এই আইডিয়াতে। নিজে উঠলে ডেকে দিন। তাঁরা উঠলে যেন আপনাকে অবশ্যই তুলে দেয় সেটার জন্যে অনুরোধ করুন।

আপনি ভাবছেন রাগ করবে? ধুরো না! উল্টো মজা পেয়ে, আপনার সুন্দর চিন্তা দেখে খুশি হয়ে অংশ নিবে দেখবেন। ভালো কাজে সবাই আনন্দের সাথেই অংশ নেয়।

আচ্ছা আপনার বন্ধুকেও চ্যালেঞ্জ করুন না। জান্নাতে একসাথে যেতে হবে না?

এই কথাগুলো অন্যকেও জানান। আইডিয়া শেয়ার করুন, আলোচনা করুন সবখানে। দ্বিধা করবেন না। ভালো কথা সুন্দর ফলবান গাছের মতো। একটা ভালো কথা বললে, ভালো কাজ করলে সেটা যদি কেউ করে তাতেও তো আপনার লাভ। আর সে না করলেও তো ক্ষতি নাই। আপনার ভালো কথা বলা, ভালো কাজের উপদেশ দেয়াটাইতো একটা অসাধারণ কাজ, যেটা আপনাকে আল্লাহর আরো কাছে নিয়ে যায়, প্রিয় করে তোলে। হ্যাঁ, শাইত্বান তো নিষেধ করবেই কানে কানে। সেটাই তো তার কাজ। আমরা সেটা পাত্তা দিবো কেনো?

আপনি ফিরবেন বলে

প্রথমে আপনাকে অতীতে নেবো।

তারপর বর্তমান দেখাবো।

তারপর ভবিষ্যত।

কিছুদিন আগেই। আপনি যেদিন পৃথিবীতে এসেছিলেন তীব্র কষ্টে আর যন্ত্রণায় আপনি কেঁদেছিলেন চিৎকার করে। আপনার মনে নেই। কিন্তু আপনি এটা জানেন। সেদিন আপনি বুঝেছিলেন কত নিকৃষ্ট আর যন্ত্রণাদায়ক এক জায়গায় এসে পড়েছেন আপনি। সেদিন আপনি একা শুধু কেঁদেছিলেন সবটুকু শক্তি দিয়ে। আপনার সাথে কেউ কাঁদেনি, কেউ না। জীবনের প্রথম অসহায় কান্নাতে আপনি একা ছিলেন। একদম একা!

আজ। যখন ভয়াবহ সমস্যা আপনাকে ঘিরে ধরে, কষ্টে বুক চিরে ফেটে যায়, তখনও আপনি বুঝতে পারেন পৃথিবীর বুকে আসার প্রথম দিন হতে আজকের দিনের একাকিত্বের বাস্তবতা একটুও ভিন্ন নয়। শুধু আপনিই বারবার বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে চান। আপনিই শুধু বারবার ভাবতে চান, চারপাশের মানুষগুলো আপনার। আপনার দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাগুলো তারা বুঝে নেবে। সত্যিটা জেনেও এত হাস্যকর ভাবনা ভাবেন কিভাবে আপনি? পারেনও বটে!

আর কয়দিন পরেই। আপনি মরে গেছেন। কি যে তীব্র কষ্ট পেয়েছেন মরার সময় আপনি! মনে আছে, মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর তিক্ত স্বাদের অভিজ্ঞতার কথা? তীব্র কষ্ট নিয়ে আপনি চলে গেলেন। একা। একদম একা। একা একা খাটিয়ায় উঠলেন আপনি। যে দুনিয়ার জন্যে, যে মানুষগুলোর জন্যে আপনি এই অনন্তের জীবনকে ভুলে ছিলেন, সেই অনন্তের জীবন অবশেষে আপনাকে ছুঁয়ে দিলো, আর সেই মানুষগুলোই আপনাকে একা রেখে আসতে যাচ্ছে অন্ধকার কবরে। আপনার মৃতদেহের কটু পঁচা গন্ধ যে আমাদের একদিনও সইবে না।

আপনি সার্টিফিকেট-ডিগ্রী, বাড়ি, গাড়ি, আরামদায়ক বিছানা, ভালো খাবার আর চাকরির পিছনে ছুটেছেন শুধু এই অনন্তের জীবনকে ভুলে। আপনি জানতেন এই দিনটা আসবে। আপনি তবুও প্রস্তুত হননি। কত অর্জন আপনার! দিবারাত্রি তীব্র টেনশান করেছেন, কষ্ট সহ্য করে গেছেন এই দুনিয়ার জন্যে। হাস্যকর সব অর্জন। আপনি হুলুস্থুল কষ্ট করে কত কিছু করেছেন। অথচ সেই দুনিয়ার অর্জন

থেকে আজ এক টুকরো সফেদ কাপড় ছাড়া আর কিছুই নিয়ে যেতে পারছেন না, কিচ্ছু না। আপনার ফাইলে বন্দী ভারী দেশি-বিদেশি সার্টিফিকেটগুলো কেজি দরে বেঁচে একটা আইসক্রীমও খেতে পারবে না কেউ।

একা একা আবার নতুন জীবন শুরু। এই নতুন জীবনটা কি হাসিতে কাটবে নাকি কান্নায়? সেটা আপনিই ঠিক করে এসেছেন, আপনিই চয়েস করে এসেছেন আগের জীবনে। বেশির ভাগ মানুষই ভুল চয়েস টা বেছে নেয়। একা একা কবরে কঠিন সব প্রশ্নের জওয়াব দিতে হয়। দুনিয়াতে সম্পূর্ণভাবে ঠিক মতো না চললে এই অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। আপনার বস, আপনার সুপারভাইজার, আব্বু-আম্মু, আত্মীয়স্বজন, ফ্রেন্ডস, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড যাদেরকে সুখ দেয়ার জন্যে এই দিনটাকে আপনি অবজ্ঞা করেছিলেন, তারা ঠিকই খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে। আপনার সাজানো দুনিয়া এক সেকেন্ডের জন্যেও থেমে যায়নি আপনার প্রস্থানে। আর আপনি? অনুভব করছেন কবরের তীব্র সংকীর্ণতা, টের পাচ্ছেন আপনার পাঁজরের হাড় একটার ভেতর আরেকটা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। নিজের তীব্র চিৎকার কি আপনার কানে পৌঁছাচ্ছে?

এরপর পুনরুত্থান। বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আজকেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে আপনি আসলেই সফল, নাকি ব্যর্থ? দুনিয়ার কয়েক মিনিটের অর্জনকে আপনি সাফল্য ভাবতে আজকের এই সত্যিকারের সাফল্যর অমিয় স্বাদ আর ব্যর্থতার সুতীব্র গ্লানিকে ভুলে গিয়ে। দুনিয়ায় আপনার প্রতিটা কাজ, প্রতিটা নিঃশ্বাস যেমন যেভাবে হওয়ার কথা ছিলো, সেইভাবে করেছিলেন তো? আপনার কাছে কি আজকের দিন সম্পর্কে কোনো বার্তা এসেছিলো? আল-কুরআন নামের একটা গ্রন্থ, শুধুমাত্র এই একটা বই অনুযায়ী আপনার জীবনের প্রত্যেকটা কাজ করার কথা, এই কথাগুলো আপনার কাছে পৌছেছিলো তো? কারো কথার মাধ্যমে, কোনো বইয়ের মাধ্যমে? কিংবা কোনো ব্লগ, ফেইসবুক নোটস বা স্ট্যাটাসের মাধ্যমে? নিশ্চয় পৌঁছেছিলো। বুঝে পড়েছিলেন তো সেই একটা মাত্র বই? আপনি কি গুরুত্ব দিয়েছিলেন? এতদিনের ভুলগুলো বুঝতে পেরে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে বদলে নিয়েছিলেন নিজেকে সত্যের আলোয়? নাকি যেমনই ছিলেন তেমনই রয়ে গিয়েছিলেন? পাত্তাই দেননি? আজ হিসেব নিকেশের দিন এসে গেছে। যে সমাজের চোখ রাঙ্গানি আর ক্ষণিকের আনন্দ আপনাকে এই অনন্তের জীবনের ওয়াদার কথা ভুলিয়ে দিয়েছলো, আজ সেই দিন।

এই নতুন জীবনকে অসাধারণ করে সাজানোর জন্যে একটা ম্যানুয়েল পাঠিয়েছিলো আপনাকে যে সবচেয়ে ভালোবাসতো সে। আপনার জন্মলগ্ন থেকেই

আপনাকে পরম ভালোবাসায় আগলে রেখেছিলো সে। আপনি তাঁকে চিনেননি। তাঁকে যেন চিনতে পারেন সেইজন্যে তিনি যুগে যুগে আপনার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন বার্তাবাহকের মাধ্যমে। এই আপনার জন্যেই পাঠিয়েছেন সবচেয়ে অসাধারণ বার্তাবাহক আর পরিপূর্ণ সেই অসাধারণ বার্তা কুরআনকে।

আহা! কত ভাবেই না আপনাকে জানিয়েছেন তিনি। আপনি শুনেননি, আপনি পাত্তাই দেননি। আপনি আপনার প্রতিটা কাজ যেভাবে করার কথা ছিলো সেভাবে করেননি। আপনি অনুতপ্ত হয়ে, ক্ষমা চেয়ে, পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসেননি।

কেনো? কিসের এই দেরী? আপনার প্রতিটা একাকিত্বে যিনি আপনার সত্যিকারের পাশে ছিলেন তাঁকে ভুলে আপনি দুনিয়ার মিথ্যা উপাস্য আর সাথীদের বিশ্বাস করছেন? কত সযতনে সাজিয়ে আপনার জন্যে মেসেজ পাঠিয়েছেন তিনি যাতে আপনি সত্যিই সফল হতে পারেন, এই দুনিয়ার জীবন আর পরের জীবন দুটোতেই, সেই মেসেজগুলো একবারো সম্পূর্ণ পড়ে দেখলেন না? কিভাবে পারছেন আপনি?

এখনো নিঃশ্বাস আছে আপনার। এখনই যান না তাঁর কাছে। খুলে বলুন সব ভুলের কথা। অনুতপ্ত হন। মাফ চান। ফিরে আসুন। পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসুন।

তিনিতো বলেছেন আপনি সত্যিই যদি মাফ চান, পুরোপুরি ফিরে আসেন, তিনি আপনার সব মাফ করে দেবেন, সব। যতোবার ভুল করে মন থেকে মাফ চাইবেন ততোবার। যত বড়, ভয়ংকর পাপীই হোন না কেনো, আপনি শুধু একবার তাঁর সামনে অনুতপ্ত হয়ে সবগুলো ভুল স্বীকার করে দাঁড়ান, সিজদায় ঝরিয়ে দিন অনুতাপের অশ্রুমালা। অবিরত। তাঁর পথে পূর্ণভাবে থাকার জন্যে প্রতিজ্ঞা করুন। তিনি তাঁর ক্ষমা আর ভালোবাসার বিশালতা দিয়ে আপনার অতীতের সব গ্লানি মুছে দেবেন। হ্যাঁ, তিনিই বলেছেন।

তিনি অপেক্ষা করছেন। আপনি ফিরে আসবেন বলে। আপনি একা নন, আপনি তীব্র ভালোবাসা পেয়েছেন, এটা বুঝবেন বলে।

মধ্যবিত্ত পাথর পিতা

এখন বাবাদের কথা বলবো।

মধ্যবিত্ত পাথর পিতার কথা।

একটা ছেলে হিসেবেই জীবন শুরু হয় তাঁর। হাইস্কুলের গন্ডীতে আসতেই শুনতে হয়,

"বাবা, ভালো করে পড়াশোনা কর। তোকে নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন।"

সেই স্বপ্ন ছেলের চোখে আঁকা হয়ে যায়। অল্প কয়েকজন সেই স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেয়। বাকিরা পারে না। বাবা মার চোখে চোখ রাখতেও লজ্জায় শতবার কুঁচকে যায় ছেলেটা। নাহ! কিছু একটা করতেই হবে। কিছু একটা খোঁজা শুরু করে সে। পায় না। খুঁজতে থাকে, খুঁজতেই থাকে। খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতা তাকে কুরেকুরে খায় দিনরাত। মাঝরাতে কখনো ফুঁপিয়ে কান্নার মতো শব্দ পেয়ে হকচকিয়ে যায় ছেলের বালিশখানা।

ছিঃ! ছেলেরা কাঁদে নাকি? কাপুরুষ কোথাকার!

কাপুরুষতার সামাজিক সংজ্ঞায় ছেলেটা কাঁদতেও পারে না। তারুণ্যের এক পর্যায়ে স্বপ্নটপ্নের কাঁথা পুড়ে ফেলে সে নিজ হাতে। কাঁথা পোড়া ছাই মুখে মেখে বেরিয়ে পড়ে টিকে থাকতে হবে বলে। কিছু একটা আঁকড়ে ধরে সে। মনের মতো কিছু না। কাজ চলে যায় আর কি কোনো রকম!

জীবনের প্রথম উপার্জনের টাকা হাতে আসে। বাবার হাতে পাঞ্জাবী আর মায়ের কোলে আলতো করে শাড়ির প্যাকেট দেখে কি যেন খোঁজে সে দুজনের মুখে। বাবার গম্ভীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা দু'আ আর মায়ের "টাকাগুলো নষ্ট করলি কেন" শুনে বুকের মাঝে আনন্দের সাথে সাথে কি একটা বিষাদ যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। একগাল হাসি দিয়ে উঠে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আকাশ দেখে ছেলেটা।

আকাশের নীলিমায় কিছু খোঁজে, নাকি চোখ উপচে আসা কাপুরুষতার ভেজা স্পর্শ লুকাতে চায় সে?

এর উত্তর না হয় শুধু ছেলেরাই জানুক।

বন্ধুদের আড্ডায় হারানোর সময় হয় না ছেলেটার। ও বিলাসিতার সময় কোথায়? বন্ধুরা ঠাট্টা করে।

"খুব ভাব হইসে তোর না?" "ব্যাটা কিপটা কোথাকার!" এসব কথার কি কোনো উত্তর হয়? আর বন্ধুরাওতো মীন করে কিছু বলে না। তবু বুকের ভেতর পাথর জমে। বলে ওঠে

না থাক! নাই বা বলি। সব কথা সবার জানতে নেই।

একটা মেয়েকে বেশ পছন্দ ছিলো ছেলেটার। ভেবে রেখেছিলো ওকেই বিয়ে করবে। মাকে বলেছিলো।

মাও বলেছিলো, "তুই চাকরীটা পেলেই আর চিন্তা নেই।"

ছেলে চাকরী পাওয়ায় মা এসে জিজ্ঞেস করে,

"বাবা, এবার বিয়েটা করে ফেল। ঐ মেয়ের ঠিকানা দে।"

ছেলের একগাল হাসি।

মা তবু চোখ দেখে ঠিক বুঝে নেয়।

তবু একটা মেয়ে ছেলেটার ঘরে জ্যোৎস্না হয়ে আসে। আসতে হয়। দুইদিন পরেই সেই জ্যোৎস্না কাকরোল, পটল আর টেংরা মাছের গন্ধে গ্রীষ্মের খটখটে রোদ্দুর হয়ে যায়। সন্তান আসে আবার এক চিলতে পূর্ণিমা হয়ে। ছেলের পড়াশোনা, রেজাল্ট খারাপের টেনশান আর এই নোংরা সমাজেই আদরের রাজকন্যা মেয়েটার বড় হয়ে যাওয়াটা পিতার কপালের ভাঁজের সংখ্যা বাড়িয়ে যায়। ছেলেটা পারবে তো কিছু করতে? টিকে থাকতে? মেয়েটা কারো সাথে প্রেম করছে না তো? বাসা ভাড়া, কারেন্ট-গ্যাসের বিল, বাজারের মোটা ব্যাগ আর চশমার পাওয়ারের সাথে সাথেই দায়িত্ব আর ব্যর্থতাগুলোকে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়া মনে হতে থাকে। কপালের ভাঁজের চাপে মুখের হাসি হয়ে যায় ডুমুরের ফুল। ছেলে একটা ভুল করলো, দেয় ধমক। মেয়ে কথা শুনলো না! জোরসে ঝাড়ি। বউয়ের মেসেজে বাজারের লিস্ট আসে। ঘরে ঢোকার পর এটা নেই, সেটা লাগবে। আবার বেরিয়ে যাওয়া। অসুখ, বিসুখ। টেনশান। খরচ। ইনকাম নেই, খরচ বাড়ে। বাড়ে দুরত্ব। সবার সাথে। জ্যোৎস্না হয়ে আসা সঙ্গিনীর সাথে। নিজের শত আদরের ছেলেটা আর রাজকন্যার সাথে।

রাজকন্যাকে বিয়ে দিয়ে বুকের ধন হারানোর হাহাকারও বাবাকে লুকোতে হয়।

বেয়ে পড়া চোখের জলটা লোকে দেখে। ভেতরের রক্তক্ষরণ?

দিন যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন ছেলেটা এসে হাতে একটা প্যাকেট দেয়। বলে, "দেখোতো আব্বু পাঞ্জাবীটা পছন্দ হয় কি না?"

কাঁপা কাঁপা হাতে প্যাকেট খোলে মানুষটা।

মানুষটা জানেন এই প্যাকেটে পাঞ্জাবী নেই। আছে ভালোবাসা। তাঁকে জড়িয়ে ধরার জন্যে তাঁর গায়ের মাপে একটা সফেদ ভালোবাসা। আবেগে ঠোঁট কেঁপে যায় মানুষটার। ছেলেটার আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকা মুখখানা বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। চোখের বেয়াদপ আর অবাধ্য নোনতা স্পর্শের ভার আজ তাঁর চোখ নিচু করে দেয়।

পাথর পিতার গম্ভীর মুখ ফুটে শুধু অনেক কষ্টে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে আসে,

"সুন্দর হইসে। আল্লাহ তোকে আরো অনেক বড় করুক।"

মধ্যবিত্ত পাথর পিতার মধ্যবিত্ত ছেলে বেরিয়ে যায় বাইরে।

আকাশে ঐ দু'টো উঁচু চোখ কি কেবলই নীল খুঁজে?

নাকি চোখে ভাসা কাপুরুষতার তারল্যটুকু শুধু উপরের পরম করুণাময় স্রস্টা ছাড়া আর কাউকে না দেখানোর তীব্র কোনো প্রতিজ্ঞা করেছে সে?

এর উত্তর না হয় শুধু ছেলেরাই জানুক।

আর প্রিয় বাবার জন্যে সালাতের দু'আতে প্রাণ হতে বেরিয়ে আসুক,

رَب ار حمهما كما ر بيائي صنغير

উচ্চারণ: রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা

"My Lord! Bestow on them your mercy as they did bring me up when I was young."

ও আমার প্রতিপালক! উনাদের উপরে আপনার রাহমাত বর্ষণ করুন যেভাবে তাঁরা আমাকে ছোট থেকে বড় করে তুলেছেন।

সুরা কাহাফের এক কণা

সুরা কাহাফের তাফসীরের লেকচার শুনছিলাম। শুধুমাত্র প্রথম ৮টা আয়াত নিয়ে আলোচনা শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পুরাটা শুনলে না জানি কি অবস্থা হবে! যাই হোক, আপনাদের সবার সাথে এইটুকু পড়াশুনা করার সময় আমার কী কী অনুভূতি হয়েছে সেটার সারসংক্ষেপ শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না।

সবচেয়ে অসাধারণ যে শিক্ষাটা পেয়েছি তা হলো, অবশ্যই অবশ্যই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কুরআন নাযিল করেছেন। এবং এই কুরআনের মাঝে তিনি কোনো বক্রতা রাখেননি। একটুও না। এই কুরআন একদম সোজা সাপ্টা কথা বলে। কর্তৃত্বের সাথে আদেশ দেয়। ঘুরায়ে প্যাঁচায়ে এমনভাবে কথা বলে না, যাতে সোজা পথ কোনটা তা নিয়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবো। একজন সত্যপন্থী মানুষ সহজেই এই কিতাব বুঝতে পারে এবং মেনে নিতে পারে।

শত বছর পার হয়, হাজার বছর চলে যায়। ১৯৫০ সালে যে সমকামীতাকে ঘৃণার চোখে মানুষ দেখতো, আজ সেই মানুষই সমকামীতাকে স্বীকৃতি দেয়ার আন্দোলন করে। আগে মানুষ এমন ঢোলা ব্যাগি জিন্স পরতো যে সেখানে দুই তিনজন একসাথে থাকতে পারতো, আর এখন এমন টাইট জামা পরছে যে সেখানে অক্সিজেনেরও প্রবেশ নিষেধ। মানুষ বদলায়, নিজেদের ভাবনা বদলে ফেলে। চারপাশের মানুষের চাপে নিজেকে বদলে নেয়। আদর্শ বদলে ফেলে। কম্প্রোমাইজ করে। খারাপ মানুষদের চাপে যেমন ভালো মানুষটাও আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি উল্টোটাও ঘটে থাকে। এই হচ্ছে হিউম্যান নেইচার। তাই এই মানুষকে পথ দেখাতে এমন এক কিতাব আল্লাহ পাঠালেন যার সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন, এবং এতে গাইডেন্স হিসেবে যা বলার সব সোজা সাপ্টা বলে দিয়েছেন। ২০১৪ তে এই কিতাব যে সত্যকে ধারণ করে, ১৯১৪ তেও তাই করতো, ১০১৪ তেও একই সত্য বলে এসেছে, এমনকি ২১১৪ তে যদি পৃথিবী থাকে, তখনও এটা একই সত্য বিবৃত করে যাবে। একচুলও বদলাবে না।

কী কী বলে এটা? সারসংক্ষেপ হিসেবে বলা যায়, এটা মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হতে সাবধান করে দেয়। বারবার বারবার সতর্ক করে দেয় যাতে মানুষ আল্লাহর শাস্তিতে না পড়ে যায়। কঠিন শাস্তি হতে বারবার সাবধান করে দেয়, যাতে মানুষ

সেই শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে। পরিপূর্ণ ঈমান এনে যারা ভালো ভালো কাজ করতে থাকে, ইবাদাত করতে থাকে, মানুষের জন্যে অবিরাম ভালো কাজ করতে থাকে, মানুষের জন্যে রাহমাত হয়ে যায়, আলো হয়ে যায়, তাদেরকে এই কিতাব অসাধারণ প্রতিদান আর পুরস্কারের সুসংবাদও দিয়ে দেয়। একেবারে অনন্তকাল ধরে অসাধারণ সব পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষণা দিয়ে দেয় এই সত্য কিতাব।

এটা পৃথিবীর কথাও বর্ণণা করে। পৃথিবীর সৌন্দর্য, পৃথিবীর জীবনের আকর্ষণ, অবিরাম চাহিদার অতল গহ্বর এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্তি, ধোঁকার পর ধোঁকা আর মায়ার ইন্দ্রজালের কথাও এটা ফাঁস করে দেয়। চিনিয়ে দেয় রিয়েলিটি আসলে কোনোটা। কেন পৃথিবীকে এত এত সাজ সরঞ্জাম, ডিগ্রী, চাকরী, টেকনোলজি, আরাম আয়েশের ফাঁদ আর বিলাসিতার কৃষ্ণগহ্বর দিয়ে এভাবে সাজানো হয়েছে? ৭ নং আর ৮ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটাও বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, এসবই এভাবে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীকে এভাবে সৌন্দর্য দিয়ে সাজানো হয়েছে, পরীক্ষা করার জন্যে। পরীক্ষা করার জন্যে যে, সব জেনেশুনে কারা পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনে? কারা ভালো কাজ করে? সুবহানাল্লাহ!

এবার চিন্তা করে দেখি একটু!

কত্ত দয়ালু উনি- তিনি যে এখন পরীক্ষা নিচ্ছেন সেটা বলে দিচ্ছেন বারবার। আমরা পরীক্ষার হলেই পরীক্ষায় মনোযোগ না দিয়ে ঘুরছি ফিরছি, ফেইল করার দিকে নিজেকেই নিজে ঠেলে দিচ্ছি প্রতি মূহুর্তে। আর এইদিকে পরম দয়ালু তিনি পরীক্ষার হলে থাকা অবস্থাতেও বলে দিচ্ছেন যে, এটা পরীক্ষার হল। যা করতেসো, তা করলে নিশ্চিত ফেইল করবা। এইভাবে এইভাবে করো, তাইলে টেনেটুনে হইলেও পাশ করবা। এইভাবে এইভাবে করলে A grade পাবা। আর যদি আরেকটু কষ্ট করো তাইলে তোমাকে ১০০ তে ১০০ দিবো। আর যদি মিনিমাম পাশও করতে পারো তাইলে খুশি হয়ে এত এত্ত অসাধারণ পুরস্কার দিবো যে আর কক্ষণো কোনো অতৃপ্তি, অসন্তোষ থাকবে না। এমন পুরস্কার দিবো যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখে নাই, কোনো কান কোনোদিন শুনে নাই, কোনো হৃদয় কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নাই। আর এই পুরস্কার পেতে থাকবা অনন্তকাল ধরে।

যে পৃথিবীর মোহে আমরা ডুবে গেছি, হারিয়ে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি, একবারও কি ভেবে দেখেছি, আজ এই মূহুর্তে আমি মরে গেলে এই পৃথিবীর কিচ্ছু যাবে না,

আসবে না, যেসব জব হোল্ডার, বিজনেসম্যান, গবেষক, বা পি এইচ ডি ধারী মানুষ ২০০০ সালে বিদায় নিয়েছেন, তাদের এখন কী অবস্থা একবার ভেবেছি? দুনিয়া তাদের ছাড়াই চলছে, কিন্তু তাদের এখন এই মূহুর্তে কি অবস্থা? এই অবস্থায় তো আমাকেও যেতে হবে শীঘ্রই। আমি চলে যাবো, তবু আমার অফিস চলতে থাকবে, আমার অনুপস্থিতিতে ডিপার্টমেন্টের কাজ থেমে যাবে না, আমার গবেষণা অন্য কেউ করবে, আমার স্ত্রী, স্বামী আর সন্তানের রিজিক্ব যেভাবে ছিলো সেভাবেই তারা তা পেতে থাকবে। দুইশ রকম অনর্থক বিনোদনের মজা ঠিকই থাকবে, নতুন নতুন টিভি সিরিয়াল, গানের এলবাম আর মুভি আসতেই থাকবে, কিচ্ছু থামবে না, কিচ্ছু না। শুধু আমার পরিপূর্ণ ঈমান আনার চান্স আর থাকবে না। সেইভাবে চলার সৌভাগ্য আর হবে না। ভালো কাজ করার সুযোগ আর থাকবে না। পরীক্ষার খাতা জমা হয়ে যাবে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। আমি যে ভালো কাজ পরে করবো বলে, আজ না কাল করবো বলে যে আমল ফেলে রেখেছিলাম, সেটা আর আমি করতে পারবো না। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে আপন গতিতেই ঘুরতে থাকবে। যে দুনিয়ার জীবনে আমরা ডুবে গেছি, হারিয়ে গেছি, সেই দুনিয়ার চুড়ান্ত পরিণতিও আল্লাহ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন ৮নং আয়াতে। বলে দিয়েছেন, "সবশেষে এসবকে আমি একটি বৃক্ষলতাহীন ময়দানে পরিণত করবো।"

অসাধারণ! সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ এতই দয়ালু! এতই মেহেরবান আমাদের আল্লাহ যিনি আমাদের সবকিছুর শুধু দেখাশোনা করেই ছেড়ে দেননি, কিভাবে সফল হতে হবে বারবার সেটাও শিখিয়ে দিয়েছেন। অথচ এতে তাঁর কোনো লাভই নেই। তাঁর তো কোনো কিছুরই অভাব নেই, কোনো চাহিদাই নেই। তবুও অদ্ভুত এক আদরে ভিজিয়ে বারবার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে সবচেয়ে যতন করে। সবটুকু স্নেহ, ভালোবাসা, আর রাহমাতের চাদরে জড়িয়ে। যাতে আমরা তাঁর দেখানো ইসলামে হালকা হালকা ভাবে নয়, একটু একটু নয়, নিজের মতো করে নিজের মত অনুযায়ী নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করি। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পন করে, সবকিছুর দাসত্ব হতে নিজেকে মুক্ত করে সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারি। এইখানে এবং অনন্তকালের জীবনে সফল হতে পারি। সত্যিকারের সফল।

আল্লাহ আমাদের সব্বাইকে সেই সফলতা চেনার তৌফিক দিন। সেই পথে একসাথে চলার তৌফিক দিন। আমাদের সব্বাইকে জাহান্নাম থেকে সম্পূর্ণরুপে নিরাপদ রাখুন। দশ সেকেন্ডের জন্যেও জাহান্নাম আর কবরের ভয়াবহতা আমাদের না ছুঁতে পারে। আমাদের সব্বাইকে একসাথে জান্নাতে ধুমায়ে আড্ডা মারার সুযোগ করে দিন। আ-মীন।

সাফল্য

১.

তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। আক্ষরিক অর্থেই তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। সহায়সম্বলহীন ঘরছাড়া গরীব একটা মানুষ। এইরকম ঘরবাড়িহীন লোককে আমরা জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলি। এই জীবন আমাদের কারোই কাম্য নয়। কিন্তু আমি যে প্রিয় মানুষটার কথা বলছি তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর বুকে এ যাবৎ আসা সবচাইতে সফল মানুষদের মাঝে একজন। প্রতিদিন সালাতে অন্তত পাঁচবার এই অসাধারণ সফল মানুষটার নাম আমরা উচ্চারণ করি। অসাধারণ এই মানুষটা হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

২.

পৃথিবীর বুকে সবচাইতে বড় প্রাসাদ যার ছিলো সেগুলোর মাঝে সবচাইতে অসাধারণ ছিলো তার প্রাসাদ। সে ছিলো আপাতঃদৃষ্টিতে একজন সফল শাসক। তার কথা অমান্য করার সাহসও কেউ করতো না। তার হুকুম তামিল করার জন্যে চাকর বাকর, প্রজা হতে শুরু করে এক বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিলো। ধন সম্পদ আর ক্ষমতার অনন্য এক উদাহরণ ছিলো সে। আমরা এইরকম একটা সফল জীবনই চাই। অথচ দুনিয়ার বুকে বিচরণ করা সবচেয়ে ব্যর্থ মানুষদের মাঝে আমরা তাকেই স্মরণ করি। ফেরাউন কে।

৩.

বছরের পর বছর নির্মম আঘাত সইতে হয়েছিলো তাঁকে। হতে হয়েছে রক্তাক্ত। তাঁকে যারা ভালোবাসতো, যারা তাঁর কথা শুনতো, তাদেরকে খুন করে ফেলা হয়েছে একের পর এক। করা হয়েছে অকথ্য, অবর্ণণীয় নির্যাতন। সবশেষে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে নিজের ভূমি ছেড়ে যেতে হয়। কারণ, তখনও তাঁকে খুন করার জন্যে খোঁজা হচ্ছে। সব ছেড়ে, নিজের ভূমি ছেড়ে যাকে লুকিয়ে লুকিয়ে পালাতে হচ্ছে তাঁর মতো ফালতু ক্যারিয়ারের অধিকারী, আর ব্যর্থ মানুষ কে হতে পারে? আমরা এমন জীবন চাই না। আমরা এমন জীবন থেকে মুক্তি চাই, রক্ষা চাই। এইরকম ব্যর্থ হওয়ার স্বপ্ন যেন আমাদের কাউকে না ঘিরে ধরে এই হলো আমাদের কামনা। অথচ এই মানুষটা হচ্ছেন পৃথিবীতে এই পর্যন্ত যত প্রাণ এসেছে, এবং ভবিষ্যতে আসবে, তাদের সবার মাঝে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সবচাইতে সফল। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী

ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম।

৪.

বিল গেটস না। আরেকজন। ধন সম্পদের এমন এক পাহাড় ছিলো তার যে সেইগুলো বিশাল বিশাল ভল্টে রাখতে হতো। কল্পনা করা যায়? তার অনেক অনেক ভল্ট ছিলো এইরকম। সবচাইতে উৎকৃষ্ট বাহন ছিলো তার, বাড়ির কথা বাদই দিলাম। রাস্তায় টাইট টাইট গেঞ্জি পরে মানুষকে মাসল দেখিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ দেখেছেন না? শক্তিশালী মানুষ? কিংবা রেসলিং তো দেখতেন ছোটবেলায়। ইয়া বিশাল বিশাল শক্তিশালী মানুষ। অবলীলায় একজন আরেকজনকে তুলে আছাড় মারছে শুধু শুধু। মনে পড়েছে? এইরকম বিশাল বিশাল কয়েকজন মানুষ লাগতো শুধু একটা ভল্টের চাবি বহন করতে। আবারো বলছি, শুধু চাবি বহন করতেই কয়েকজন মুশকো জোয়ানের ঘাম ছুটে যেতো। ভল্টটা কত্ত বড় একবার ভাবুন। এইরকম অনেকগুলো ভল্ট যার আছে সে কোনো লেভেলের জিনিস তা একবার ভাবুন। এর চেয়ে সফল আর কিভাবে হওয়া সম্ভব? এইরকম জীবন একবার পেলে আর কি লাগে? আমরাতো এমন জীবনই চাই। নিশ্চিন্ত জীবন। অথচ দুনিয়ার বুকে আরেকজন ব্যর্থ মানুষ হিসেবে তার নাম উঠে গেছে। কারুন তার নাম। চিনেছেন নিশ্চয়ই?

তার মানে কি গরীব হলেই সফল, আর ধনী লোক, ক্ষমতাবান লোক মানেই খবর আছে? এই কথাটা কি আমি একবারো বলেছি? তাহলে ভুল বুঝলেন যে?

ওয়েইট! আরেকজনের কথা বলি!

৫.

তাঁকেও বিশাল সাম্রাজ্য দেয়া হয়েছিলো। দেয়া হয়েছিলো অদ্ভুত কিছু অতিমানবীয় ক্ষমতা। চোখে দেখি না এমন প্রাণকে করা হয়েছিলো তাঁর হুকুমের আজ্ঞাবহ। প্রাণীদের কথা বোঝার অসাধারণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো তাঁকে। এত সম্পদ আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থদের লিস্টে নেই। বরং সফলদের লিস্টের শীর্ষে থাকা মানুষদের একজন। হযরত সুলাইমান। আলাইহিস সালাম।

৬.

ওমা!

তাহলে সফলতা আর ব্যর্থতার নির্ণায়ক কি?

আসলে আমরা সবাই, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মানুষই ডুবে আছি ক্ষতির ভিতরে। ডুবছি তো ডুবছিই। প্রত্যেকেই। ধনী বিজনেসম্যান, গবেষক, শিক্ষক, ঠেলাগাড়িওয়ালা, রিকশাওয়ালা, ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিনী সবাই ডুবে যাচ্ছি ক্ষতির মাঝে। কিসের ক্ষতি? সময় হারিয়ে ফেলার ক্ষতি। ঠিক কাজ না করে ক্ষতিতে অবিরাম ডুবতে থাকার ক্ষতি। ডুবে যাচ্ছি, তবু বুঝতে না পেরে কিছুই করছি না বাঁচার জন্যে। ডুবে যেতে যেতে সবচাইতে ভয়ংকর ক্ষতিতে চিরদিনের জন্যে ডুবে যাওয়ার ক্ষতি। কেউই এই ক্ষতি থেকে বাঁচবে না। কেউ না।

শুধু সেই বাঁচবে। সেই স্পেশাল। সেই বেঁচে যাবে।

কে? যে মাত্র চারটা কাজ ঠিকভাবে করবে। কি সেই চারটা কাজ? সংক্ষেপে বলি। আবারো বলে দিচ্ছি যে আমি সংক্ষেপে বলছিঃ

১। যে পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনবে

২। তারপরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ভালো কাজ করতেই থাকবে

৩। একই সাথে চারপাশের সবাইকে আন্তরিকতার সাথে সত্যের উপদেশ দেবে

৪। এবং নিজের চারপাশের মানুষদের আন্তরিকতার সাথে, ভালোবাসার সাথে ধৈর্য্য ধারণ করার উপদেশ দেবে।

৪টা সিম্পল কাজ। হ্যাঁ, এই চারটা সিম্পল কাজই করা এত শক্ত মনে করি আমরা। করতে পারি না। বেকুব আর কাকে বলে? কিভাবে এই চারটা কাজ নিখুঁতভাবে করবেন? সেটা জানতে সুরা আসরের তাফসীর পড়ুন, লেকচার শুনুন। এই সুরা আসরে মাত্র তিনটা পিচ্চি পিচ্চি আয়াত। এক বাক্যের এই সুরাটা দুই লাইনেই শেষ। কিন্তু এই সুরা আসরকে বলা যায় সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ। হ্যাঁ, সমগ্র কুরআনের। যদি শুধুমাত্র এই ছোট্ট সুরাটায় কি বলা হয়েছে ঠিকভাবে, সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি, এবং সেই অনুযায়ী চলতে পারি, তাহলেই আমরা পাশ করে যাবো। গ্যারান্টিড!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে অন্তত পাশ করার তৌফিক দিন, যাতে একফোঁটা শাস্তির ভয়াবহতাও আমাদের নাগাল না পায়। পুরস্কার হিসেবে যেন অনন্তকাল আড্ডা মারতে পারি, ঘুরাঘুরি করতে পারি আর শান্তিতে খোলা আকাশের নিচে সবুজ চাদরে ঘুমিয়ে যেতে পারি।

হৃদয়ের অবাধ্যতা

যে হৃদয় একবার তার প্রতিপালকের অবাধ্যতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, এবং জেনেশুনে, বুঝেও ডুবিয়েই রাখছে, সে হৃদয়ের জন্যে সাঁতরে বেঁচে আসা বড়ই কঠিন। বস্তুতঃ সে হৃদয় আজীবন নিজের খেয়াল আর খুশিরই ইবাদাত করতে চায়, আল্লাহর নয়।

জাস্ট দু'টো উদাহরণ দিই। নারী আর পুরুষ দু'দলকে নিয়েই।

শুধুমাত্র পর্দার ব্যাপারটাই ধরা যাক।

প্রথমে আমাদের সম্মানিত নারীদের কথা বলি।

ইসলাম ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়েছে। যে কাজে যে পারদর্শী, যে কাজে যে বেস্ট, তাকে সেই কাজ করার মাধ্যমে অসীম মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ইসলাম মেয়েদের বলেছে পর্দা করতে। কিরকম পর্দা করবে, কিভাবে পর্দা করবে মেয়েরা? আমরা আজকের পুরুষরা যেরকম চাই অবশ্যই সেইরকম নয়। বরং যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের আদেশ করেছেন আর সেই আদেশের প্রতিফলন হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন সেইভাবে। আল্লাহর আদেশ আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সবচেয়ে বেশি কারা গুরুত্ব দিতেন, এবং ঠিকভাবে, পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতেন? অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী, কন্যা এবং তৎকালীন মেয়ে সাহাবীরা। সেইজন্যে আমাদের তাকাতে হবে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর তাঁরা কে কিভাবে পর্দা পালন করতেন সেইদিকে।

অনেকে নিজের মাথায় আসা আইডিয়া আর চিন্তা চেতনার ইবাদাত করেন। তারা ইসলামকে নিজের সুবিধামত মানেন, বদলে নেন। ইসলামের জন্যে তাঁরা নিজেকে বদলাতে রাজী নন। কারণ, অভ্যাস! হৃদয়কে আল্লাহর অবাধ্যতায় অভ্যস্ত করে তুলেছেন তারা। তারা পর্দার বিধান আদেশ হিসেবে আসার পূর্বের নারীদের জীবনধারাকে অনুসরণ করার কথা বলেন। অনেকে আবার নিজের মাথার আইডিয়ার পুজো করে বলেন, পর্দার বিধান শুধুই নবীর স্ত্রীদের জন্যে এসেছে, বাকিদের জন্যে নয়। তাদের বলবো, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের

রাজকন্যা ছিলেন এবং যিনি জান্নাতি মর্যাদাবান নারীদের লীডার, তিনি কিভাবে পর্দা করেছেন সেটা অনুসরণ করার জন্যে। তাঁর সম্মানিত জীবনের ফোয়ারা থেকে এক ফোঁটা আলো দেয়ার জন্যে বলি, তিনি সেই মানুষ, যিনি অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর দাফন কাজ যেন রাতের বেলা চুপিসারে সম্পন্ন করা হয়। আশ্চর্য তো! কেন? কারণ, এতে করে তাঁর লাশের উপরে দেয়া কাফনের কাপড় ভেদ করে তাঁর শারিরীক অবয়ব পুরুষদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সুযোগ থাকবে না। যিনি ছিলেন সবচাইতে সম্মানিত নবীর আদরের দুলালী, যিনি হচ্ছেন জান্নাতের নারীদের লীডার, যিনি পৃথিবীর বুকে এ যাবৎ আসা সবচাইতে সফলতম নারী, তিনি নিজ হাতে যাঁতা পিষে গম গুঁড়ো করতে করতে হাতে ফোস্কা ফেলে দিয়েছেন, তিনদিন না খেয়ে থাকার পরেও তিনি দারিদ্র্যের বা চাহিদার দোহাই দিয়ে বাইরে পরপুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জব খুঁজতে বের হননি। খুব প্রয়োজনে ইসলাম নারীদেরকে বাইরে কাজ করার অনুমতি দেয়। অথচ উনার প্রয়োজনের সংজ্ঞাটা ছিলো আমাদের প্রবৃত্তির লোভকেন্দ্রিক প্রয়োজনের সংজ্ঞা থেকে অনেক অনেক ভিন্ন। বাইরের জব আর টাকা পয়সাকে নয়, নিজেকে দেখিয়ে দেয়াতে নয়, বরং ইসলামের সৌন্দর্যে নিজেকে সৌন্দর্যমন্ডিত করাতে সাফল্য খুঁজে পেয়েছেন, এবং আসলেই সফল হয়েছেন, তাঁর জীবনি অনুসরণ করেই আজকের নারীরা সত্যিকারের সফল হয়ে যেতে পারবেন।

অবশ্য যারা একবার আল্লাহর অবাধ্যতায় হৃদয়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন আর সমাজের নিয়মের পুজোতে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাদের জন্যে এই বিধানগুলো হয়তোবা কেবলই অত্যাচার হয়ে ধরা দেবে। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে এইসব চিন্তাধারার অনুসারীদের ক্ষমা করুন এবং হিদায়াত দিন। আমাকেও সঠিকটা বুঝে মেনে চলার তৌফিক দান করুন।

এবার মহান, বলীয়ান পুরুষদের কথা বলি।

আমরা নারীদের পর্দা নিয়ে কথা বলে বেশ সুখ পাই। বস্তুতঃ আমাদের পুরুষদের ইসলামিক পড়াশোনায় কোনোভাবে নারীদের কথা এলে সেটা উল্লেখ না করা পর্যন্ত আমাদের বেশ চুলকাতে থাকে। চুলকানীর একটা মজার দিক আছে। যতক্ষণ চুলকানো হয় ততক্ষণই মজা লাগতে থাকে, আরাম লাগে। বিশেষ করে মেয়েরা কেন পর্দা মানে না, কেন পরিপূর্ণ পর্দা করে না, এই নিয়ে আমাদের চুলকানী দিবা-রাত্রী। চুলকাতে চুলকাতে ঘা হয়ে গেছে, পঁচে তীব্র গন্ধ বেরুচ্ছে, তবু থামার নাম নেই। ভাইরে, থামেন। একবার বুঝিয়ে বলেছেন, দুইবার বলেছেন, তিনবার বুঝিয়েছেন, বুঝাচ্ছেন তো বুঝাচ্ছেনই। খুব ভালো। আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

নিজের স্ত্রী, কন্যা আর বোনকে আন্তরিকভাবে অবশ্যই আপনি বুঝাবেন, বুঝাতে হবে। না হলে এরাই তো বিচারের দিন আপনি বুঝাননি বলে আপনাকে জাহান্নামে ফেলে দেয়ার কারণ হয়ে যাবে। তাই অবশ্যই বুঝাবেন। পাশাপাশি একটা কথা। নিজের হিসেবের কথা মনে আছে তো? আপনার কবরে কিন্তু আপনি একলাই শুয়ে থাকবেন। আপনার বিচারের সময় আপনি একলাই দাঁড়াবেন। সেই দুঃসহ ভাইভাতে করা প্রশ্নগুলির উত্তরে যখন মিথ্যে বলবেন, তখন আপনার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে, আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই কথা বলে সাক্ষী দিবে আপনার বিপক্ষে। আপনাকেও তো আল্লাহ পর্দার বিধান দিয়েছেন। কই? মনে পড়ছে না? খুঁজে দেখুনতো ভালো করে। যে আয়াতে মেয়েদের পর্দার কথা বলা হয়েছে, সেই আয়াতের আগেই কিন্তু ছেলেদের পর্দার কথা বলা হয়েছে। চক্ষু সংযত রেখে চলার আদেশ করা হয়েছে।

হ্যাঁ।

আগে আপনাকে পর্দা করতে বলেছেন আল্লাহ, তারপর মেয়েদের। "মেয়েরা পর্দা করে না, তাই আপনি হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে লোল ফেলেন", "ওরা দেখায়, তাই আপনি দেখেন" ফ্রেন্ডসদের সামনে আওড়ানো এই যুক্তিগুলো আল্লাহর সামনে দিতে পারবেন? বুকে হাত দিয়ে বলেনতো? পারবেন না। আপনি জানেন আপনি দোষী। আপনার হিসেব নিকেশ করার জন্যে আপনাকেই বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হলেও আপনিই দোষী সাব্যস্ত হবেন, যদি সৎ ভাবে বিচার করেন। নন-মাহরামকে আপনি মেসেজ পাঠান, চ্যাট করেন ফেইসবুকে। বাহ! পর্দা যে আপনার জন্যেও এসেছে, আপনার জন্যেও যে পর্দা করার "আদেশ" এসেছে সেটা আপনি ভুলে যান, নিজের জীন্দেগীতে প্রয়োগ করতে চান না। নিজের কদর্য অভ্যাস, খেয়াল খুশি আর অন্তরের খায়েশের পুজোতে ডুবে আপনি কাকে অস্বীকার করছেন? আল্লাহকেই নয় কি? আপনাকে আল্লাহ চোখ সংযত করতে বলেছেন। শুধু বলেননি, আদেশ করেছেন। প্রভুর আদেশ কি দাস অমান্য করে? অমান্য করতে পারে? আপনি কি জেনেশুনে তাঁর আদেশের অবাধ্য হয়ে তাঁকে প্রভু হিসেবে অস্বীকার করছেন না তো? যদি তা না হয়, তাহলে রাস্তায় আপনার চোখ আকাশে বাতাসে থাকে কেন? রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মুসলিম অমুসলিম মেয়ে থেকে শুরু করে টিভি, নাটক, সিনেমার মেয়েটাকেও আপনি হা করে দেখেন। এমনকি বিলবোর্ডের ছবির মেয়েটাকে আপনার নোংরা চোখের জিহবা একবার চেটে নিতে ভুলে না। কেনো? আপনি না নিজেকে মুসলিম বলেন? ছিহঃ

এক কাজ করবেন প্লিজ। নিজের আম্মু, স্ত্রী বা বোনকে নিয়ে একদিন রাস্তায় বের

হন। তারপর চারপাশের পুরুষগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন খুব খেয়াল করে। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখুন, ঐ চোখগুলো আপনার আম্মু, আপু, স্ত্রী বা ছোট বোনের দিকে কিভাবে তাকায়, কি দেখে, কিভাবে দেখে। সত্যিই এই কাজটা একবার করে দেখবেন। প্লিইইজ। জানোয়ারগুলো চোখ উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হবে আপনার। রক্ত গরম হয়ে দাঁত কিড়মিড় কিড়মিড় করবে। ভেবে দেখুন, আপনিও যাদের দিকে এইভাবে তাকান তাঁরা, সেইসব নারীরা, আপনারই কোনো ভাইয়ের আম্মু, আপু বা স্ত্রী। হয়তো আজ তাঁরা ইসলাম বুঝছেন না, তাই জানছেন না, ফলে মানছেন না। আর সেই হিসেব তাঁরা নিজেরাই আল্লাহকে দিবেন। কিন্তু আপনি? আপনিও কি সব জেনেশুনে ঐ জানোয়ারদের একজন নন? যাদের চোখ আপনার উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়? সুরা ইসরার ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ আমাদের যিনার আশেপাশেও যেতে নিষেধ করেছেন। আবারো বলছি, আশেপাশেও যেতে মানা করেছেন। চোখের দৃষ্টি সংযত না করে তো আপনি চোখের যিনা করছেন। যিনার আশেপাশেও যেতে মানা করেছেন আল্লাহ, আদেশ করেছেন আপনাকে, আর আপনি যিনা করছেন তো করছেনই। নিজের চোখকে সংযত করতে না পারলে প্লিজ রাস্তায় যাবেন না। বের হবেন না ঘর থেকে। সেটাই আপনার অসুস্থ অন্তরের সুস্থতা আর আখিরাতে পরিত্রাণের জন্যে সহায়ক হবে ইনশাল্লাহ।

অবশ্য আপনি যদি একবার আল্লাহর অবাধ্যতায় হৃদয়কে ডুবিয়ে দিয়ে থাকেন আর সমাজের নিয়ম আর নিজের প্রবৃত্তির পুজোতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, আপনার জন্যে এই বিধানগুলো হয়তোবা কেবলই অত্যাচার হয়ে ধরা দেবে। আল্লাহ এইসব চিন্তাধারার অনুসারীদের ক্ষমা করুন এবং হিদায়াত দিন।

এই অন্ধকার সমাজের অনেকেই মনে করেন, বিয়ে করলেই এইগুলো ঠিক হয়ে যাবে।

হাহ!

যে মানুষটা বিয়ের আগে আল্লাহকে চিনতে পারেনি, আল্লাহর নিয়ামাতে ডুবে থেকেও আল্লাহকে জানতে পারেনি, এই তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতার যুগেও জানতে চায়নি আল্লাহকে, ভালোবাসতে পারেনি, সময় দেয়নি আল্লাহকে, অন্যায় করেও আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করেনি, সেই মানুষটা বিয়ের পর কোনো জাদুতে বদলে যাবে বলতে পারেন? সেই মানুষটাই যে বিয়ের পরে উল্টো নিজের সাথীকেই ইসলামের পথে হাঁটা হতে সরিয়ে দেবেন না, তার গ্যারান্টি আপনাকে কে দিয়েছে?

পর্দার বিধানে পুরুষ এবং নারী, উভয়কেই নিজের সবচেয়ে বড় দূর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। এখানে কারো যুদ্ধই কারোটার চাইতে কম নয়। নারী আর পুরুষকে আলাদা আবেগ দিয়ে, আলাদাভাবে আলাদা দূর্বলতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই, তাদের মাঝে তুলনা করার তো প্রশ্নই আসে না।

কথাগুলো আসলে নিজেকেই বলা, মনে করিয়ে দেয়া। একটা কথা লেখা হলে সেটা বারবার পড়া হয়, নিজেকে নিজেই স্মরণিকা দেয়া হয়। এই লেখাটা সবার আগে তাই ভুলোমনা, আর গুনাহর সাগরে নিমজ্জিত আমার জন্যে। আমার নিজের জন্যে। আরেকবার নিজের এই অবাধ্য পাপী নোংরা সত্ত্বাটাকে মনে করিয়ে দিইঃ

যে হৃদয় একবার তার প্রতিপালকের অবাধ্যতায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, এবং জেনেশুনে, বুঝেও ডুবিয়েই রাখছে, সে হৃদয়ের জন্যে সাঁতরে বেঁচে আসা বড়ই কঠিন। বস্তুতঃ সে হৃদয় আজীবন নিজের খেয়াল আর খুশিরই ইবাদাত করতে চায়, আল্লাহর নয়।

সাঁতরে বেঁচে আসার চেষ্টা করতে হবে। করে যেতে হবে। যুদ্ধ থামানো যাবে না। সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। নিজের দূর্বলতার কথা তাঁকেই খুলে বলতে হবে।

অবিরাম সিজদাতে আর দু'আতে বলতে হবে আল্লাহকেই। বলতে হবে ঘরে এবং রাস্তাতে।

সাহায্যতো কেবলমাত্র আমাদের পালনকর্তা আল্লাহর কাছ হতেই আসে। পিছনে ভয়ংকর ফেরাউনের সুসজ্জিত আর্মির আক্রমণের সময়ে সাগারের বুকে মুসা আলাইহিসসালামের লাঠির আঘাতটা ছিলো চেষ্টা। মনে রাখতে হবে, সমুদ্রকে একমাত্র আল্লাহই তাঁর বান্দার সাহায্যার্থে দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

চেষ্টা করলে সাহায্য আসবেই।

"আপনি কি দেখোনি, কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে, তাদের কি অবস্থা হয়েছে ? তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সে অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

(সুরা আলে ইমরান, ৩: ২৩)

অর্থাৎ তাদের বলা হয়, আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে মেনে নাও এবং তাঁর ফায়সালার সামনে মাথা নত করে দাও। এই কিতাবের দৃষ্টিতে যা হক প্রমাণিত হয় তাকে হক বলে এবং যা বাতিল প্রমাণিত হয় তাকে বাতিল বলে মেনে নাও। এখানে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর কিতাব বলতে এখানে তাওরাত ও ইনজীলকে বুঝানো হয়েছে। আর কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ লাভকারী বলতে ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের কথা বুঝানো হয়েছে।

আচ্ছা, তারা এরকম কেন করে? সেই কারণটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরের আয়াতে তুলে ধরেছেন স্পষ্ট করে।

তিনি বলেছেনঃ

"তাদের এ কর্মপদ্ধতির কারন হচ্ছে এই যে, তারা বলে:

'জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।' [২]

তাদের মনগড়া বিশ্বাস নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।"

(সুরা আলে ইমরান, ০৩: ২৪)

[২] অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করে বসে আছে। তাদের মনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তারা যাই কিছু করুক না কেন জান্নাত তাদের নামে লিখে দেয়া হয়ে গেছে, তারা ঈমানদার গোষ্ঠী, তারা উমুকের সন্তান,

উমুকের উম্মাত, উমুকের মুরীদ এবং উমুকের হাতে হাত রেখেছে, কাজেই জাহান্নামের আগুনের কোনো ক্ষমতাই নেই তাদেরকে স্পর্শ করার। আর যদিওবা তাদেরকে কখনো জাহান্নামে দেয়া হয়, তাহলেও তা হবে মাত্র কয়েক দিনের জন্য। গোনাহের যে দাগগুলো গায়ে লেগে গেছে সেগুলো মুছে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে সোজা জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের এমনি নির্ভীক বানিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে তারা নিশ্চিন্তে কঠিন থেকে কঠিনতর অপরাধ করে যেতো, নিকৃষ্টতম গোনাহের কাজ করতো, প্রকাশ্যে সত্যর বিরোধিতা করতো এবং এ অবস্থায় তাদের মনে সামান্যতম আল্লাহ ভয়ও জাগতো না।

আচ্ছা, আচ্ছা, একটু দাঁড়াই এইখানে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য করে আয়াতগুলো দিয়েছেন কেনো? তাদেরকে ঘৃণা করার জন্যে? আল-কুরআন না আমাকে সঠিক পথে চালিত করার কথা, পথ দেখানোর কথা? এই দুই আয়াত থেকে আমি কিভাবে ঠিক হবো? আমি কিভাবে পথের নির্দেশনা পাবো? এই দুইটা আয়াত তো মুসলিমদের নিয়ে নয়, মুসলিমদের কোনো সমস্যা নিয়েও নয়।

সত্যিই কি তাই?

এবার একটু গভীরভাবে ভাবি আসুন। আমাদেরকে কিতাব হিসেবে, পথের নির্দেশক হিসেবে আল-কুরআন দেয়া হয়েছে, তাই না? এবং প্রতিটা ব্যাপারে, প্রতিটা সমস্যায় আমাদের আল-কুরআন অনুযায়ীই বিচার করার কথা ছিলো, ঠিক? শাসন করার কথা ছিলো আল-কুরআন অনুযায়ী, যেকোনো ঝগড়া-বিবাদ আর অন্যায়ের বিচার করার কথা এর দেয়া সূত্রানুযায়ী, কোনো মানুষের মনগড়া নিয়মকানুন অনুযায়ী ঘর থেকে ভূ-খন্ড কোথাও তো চালানোর কথা ছিলো না। আমার ঘুম ভাঙ্গার কথা এর নির্দেশানুযায়ী ফজর কিংবা শেষ রাতের সালাত আদায়ের জন্যে, সারাটা দিন কাটানোর কথা এর নির্দেশানুযায়ী, ঠিক? আমরা কি তা করছি? এই কিতাব যাকে বাতিল বলে, আমরা কি আমাদের জীবন হতে তাকে বাতিল করেছি, আর যাকে সত্য বলে দাবী করে, সেই সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই কি আমাদের সময় কাটে? বুকে হাত দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তো? আমরা কি ২৩ নং আয়াতের সেই দলটাই নই, যারা কিতাবের ফয়সালাকে পাশ কাটিয়ে যায়, এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়?

এবার আসি ২৪ নং আয়াতে।

আমরা অনেকেই মুখে বা অন্তরের গভীরে কি ঠিক এই কথাটাই বলে যাই না, যেকোনো অন্যায় আর পাপে ঝাঁপ দেয়ার সময়?

'জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।'

আল্লাহ আমাদের এইরকম চিন্তাকেও তুলে ধরেছেন, এবং ঠিক এর পরেই ঘোষণা দিয়েছেনঃ

"তাদের মনগড়া বিশ্বাস নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।"

আমরা কি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে ঠিক জায়গায় আছি, নাকি ভুল জায়গায়? নিজেকেই নিজে বিচার করতে পারবো এখন। আমি কি সঠিক পথ অনুসরণ করছি, নাকি আমার পূর্ববর্তী সেইসব জাতি যারা কিতাব পেয়েও ধ্বংসের পথে হেঁটে গিয়েছে, তাদের পথে হাঁটা শুরু করেছি? আল-কুরআনে বর্ণিত সেইসব জাতিদের ঘটনাবলী যেনো আমার বুকে এই প্রশ্নের জন্ম দেয়।

আমরা যারা তাদের পথ অনুসরণ করে চলছি, সেই আমাদের পরিণতি কী?

তাদের পরিণতি নিয়ে কি আল্লাহ কিছু বলেছেন?

হ্যাঁ, বলেছেন। ঠিক পরের আয়াতেইঃ

"কিন্তু সেদিন কী অবস্থা হবে, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যেদিনটির আসা একেবারেই অবধারিত?

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং

কারো ওপর জুলুম করা হবে না।"

(আলে ইমরান– ০৩:২৫)

হ্যাঁ। তিনি আমাদের একত্রিত করবেন। সেই দিনটা আসবেই আসবে। আমাকে আমার উপার্জনের, অর্থাৎ এই দুনিয়ায় প্রতিটা মূহুর্ত খরচ করে আমি যা যা উপার্জন করে নিয়েছি পরের জীবনের জন্যে, তার পুর্ণ প্রতিদান তিনি দিবেনই দিবেন। ভালোর জন্যে অসাধারণ সব অকল্পনীয় পুরস্কার। আর উলটাপালটা, আউল ফাউল, অন্যায় আর জঘন্য কাজের বিনিময়ে সেই অনুযায়ী ন্যায়বিচার। ন্যায়বিচার তিনি দিবেনই। করে যাওয়া কাজের ফল হাতে হাতেই তিনি দিবেন।

দিবেনই। কারো সাথে আমি অন্যায় করলাম, আর আল্লাহ আমার বিচার না করার মানে এটাই যে, যার সাথে আমি অন্যায় করলাম, তার উপর আল্লাহ জুলুম করলেন। নাউযুবিল্লাহ। সেইটা কক্ষনো হবে না, কোনোওদিনও না। আবার আমার তাওবাহীন ভুল বা গুনাহের বিচার করে, তিনি আমাকে সামান্যতম অতিরিক্ত শাস্তিও দিবেন না। সেটা হয়ে যাবে আমার উপর জুলুম। আল্লাহ পরিস্কার বলে দিয়েছেন আয়াতের শেষে, তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না।

আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য হাতে হাতে বুঝিয়ে দেয়া হবে সঠিকভাবে বিচার করে। ন্যায়বিচার হবে। ঠিক যেমন কাজ আমি করেই চলেছি, সেই অনুযায়ী ফলাফল দ্রুত ধেয়ে আসছে আমার দিকে। এই ঘোষণা, এই ভাবনাই, আমার জিন্দেগীর মোড় এই মূহুর্তে ঘুরিয়ে দিবে পুরোপুরি। যারা ভাগ্যবান, ভাবতে জানে, না ভেবে ভেবে মস্তিস্কে তালা ঝুলিয়ে সেটাকে অকেজো করে ফেলেনি, তাঁরা ঠিক এই মূহুর্তেই ঈমান এনে, অনুতপ্ত হয়ে, তাওবা করে এবং ভালো কাজ করে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসবেন, সারা জীবনের জন্যে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকেও সেইসব ক্ষমাপ্রাপ্ত, এবং ফিরে আসা আলোর কাফেলার একজন হিসেবে কবুল করে নিন।

আ-মীন।

সুন্নাত

"আরেহ, সুন্নাত না মানলে কিচ্ছু হবে না"-

এই টাইপের ভাবনা দিয়েই ব্যাপারটা শুরু হয়। শেষে ফরজ, তথা আল্লাহর আদেশকে আর পাত্তা না দেয়ার মাঝেই এই অসাধারণ আলোর পথে যাত্রাটার সমাপ্তি ঘটে।

আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া শেষ ভাষণে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আর অনুসরণীয় মানুষটা , আমরা যেন কক্ষনো পথভ্রষ্ট না হয়ে যাই, সেজন্যে দু'টো জিনিস শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন। আবারও মনে করিয়ে দিই, "শক্ত করে" আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন।

কেনো? পথভ্রষ্ট না হওয়ার জন্যে। ভুল পথে না যাওয়ার জন্যে।

প্রথমটা হলো আল্লাহর পাঠানো কিতাব- "আল-কুরআন"।

কুরআন নামের বইটাকে গায়ের সব জোর দিয়ে দুইহাতে শক্ত করে বুকে চেপে রাখার কথা তিনি বলেননি। কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলো ঠিকঠাকমতো যত্নের সাথে পালন করে নিজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এর বাণীগুলোকে জিন্দেগীতে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন তিনি।

দ্বিতীয়টা হলো নবিজীর সুন্নাত।

উনি জীবনে যা কিছু করে গেছেন, নিজে করার পাশাপাশি আমাদেরকেও পালনের আদেশ দিয়ে গেছেন, বা নিষেধ করে গেছেন, এর সবই উনার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। পথভ্রষ্ট না হওয়ার, ভুল পথে, ভুল গলিতে গিয়ে যাত্রা শেষ না হওয়ার জন্যে তিনি কিন্তু উনার সুন্নাতকেও শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন। আবারও মনে করিয়ে দিই, "শক্ত করে" আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন।

উনি শুধু কুরআনকে আঁকড়ে ধরার কথা বলতে পারতেন। কিন্তু না, উনি উনার সুন্নাতকেও আঁকড়ে ধরার কথা বলেছেন শক্ত করে। এটা সাহাবায়ে কেরাম আর তাদের পরের জেনারেশান খুবই ভালোভাবে বুঝেছিলেন বলেই, উনারা একটা সুন্নাত পেলেই সেটাকে সাথে সাথে জীবনে ইন্সটল করে ফেলতেন। "সুন্নাত না মানলে কিচ্ছু হবে না", এই ধরণের বিধ্বংসী চিন্তা উনাদের মাথাতেও কখনো স্থান পায়নি। ফলে, সুন্নাতের পাশাপাশি কুরআনের আলোর পূর্ণ প্রতিফলনও

ছিলো উনাদের জিন্দেগীতে দেখার মতো।

শেষকথাঃ

আমরা যেনো মনে রাখি, সুন্নাত কোনো ফেলনা ব্যাপার না। আজ সুন্নাত না মানলে, কাল কুরআন না মানাটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। পথভ্রষ্ট না হতে চাইলে তাই কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। শক্ত করে। আল্লাহ যেন সঠিক পথের উপরে আমাদের প্রত্যেককে পর্বতের মতোই অটল আর অবিচল রাখেন। আ-মীন।

লোকপূজা

মাঝে মাঝে খুব আজিব লাগে!

চলনে-বলনে, কথা বার্তায়, চেতনা-মননে আমাদের মাঝে কী এক হীনমন্যতা যেন ঢুকে গেছে চুপিসারে। আমরা সূর্যের আলোটাকে পুরোপুরি ঝিলিকের সাথে প্রতিফলনের জন্যে তকতকে চকচকে মসৃন গাল বানিয়ে রাখি, দাড়ি কাটা পরিস্কার হারাম জানার পরেও। শুধু ছেলেরাই নই, আমাদের বোনেরা যখন ইসলাম জানতে করতে শুরু করেন তখন তারাও ছেলেদের দাড়ির মতোই পর্দার বিধানে এসে দোনোমোনো শুরু করেন। দাড়ি আর পর্দা এই দুটোকে ওয়ারড্রবের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারের কোণায় ছুঁড়ে ফেলে লুকোতে পারলেই যেন আমরা বাঁচি। অথচ আজ থেকে ৫০-৬০ বছর আগে আমার দাদা-দাদী, নানা-নানীর আমলেও ব্যাপারটা এমন ছিলো না। কাহিনী আসলে কোনো জায়গায়?

কাহিনী হচ্ছে সমাজের স্বীকৃতির পূজোতে! আমরা কবে, কিভাবে যেন তথাকথিত সুশীল, ঝাঁ চকচকে প্রগতিশীলদের সন্তুষ্টির কাছে নিজের আত্মাটা জমা দিয়ে ফেলেছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাছে আত্মসমর্পন করার বদলে। অদ্ভুত না? আমরা বুঝি না যে, আমরা পুরোপুরি ইসলাম ছেড়ে আসার আগ পর্যন্ত ওরা খুশি হবে না। আমরা বুঝি না যে, ওদের খুশি-অখুশিতে নিজের স্বকীয়তা আর স্বাধীনতা বিক্রি করে দেয়াটা অর্থহীন। আমরা অনুভব করতে ভুলে গেছি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর বাকি সব মতামত, খুশি-অখুশির ব্যাকরণ কষে যাওয়া কেবল ব্যর্থতারই নামান্তর। আমরা কাকে অনুসরণ করতে হবে, কাকে জীবনের আদর্শ মানতে হবে সব ভুলে গেছি। সপ্তাহে একদিন জুমু'আর সালাতে হাজিরা দিয়ে ঈমান বাঁচানোর হাস্যকর হিসেব কষি আমরা। আর জুমু'আর সালাত শেষে ধাক্কাধাক্কি করে বেরোনোর সময় গোটানো প্যান্টটা তাড়াতাড়ি ঝেড়ে, গোড়ালির নিচে ফেলে দিয়ে, মাসজিদ হতে ভুল করে শরীরে লেগে যাওয়া "ইসলাম"টাকে দ্রুত সরাতে পারলেই যেন বুকে হাত দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

আমরা মানুষের তৈরী নিয়ম-কানুনকে খুশি করে সচল, প্রগতিশীল সাজতে গিয়ে, আল্লাহর নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙ্গুলদেখিয়ে অচল হতে শিখে বসে আছি, আর আনন্দে দুলছি। আমাদের যট্টুক সুবিধে হয়, তট্টুক ইসলামকে মানি। আর যট্টুক মানুষকে খুশি করে না, নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যায়, তট্টুকের জন্যে বরাদ্দ রেখেছি ভাঙা-কুলো। এই জন্যেই আমাদের মত নামকা ওয়াস্তে মুসলিমদের আল্লাহ বড়

একটা ধমক দিয়েছেন সুরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে,

"...তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো?

সুতরাং, তোমাদের যারা এরকম করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে এরকম লোক দেখানো মুসলিমদের দল হতে সরিয়ে, সত্যিকারের ইসলামের পথিক হওয়ার তৌফিক আর সাহস দিন। তাঁর একনিষ্ঠ দাস হওয়া, আর তাঁর প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই সফলতাকে খুঁজে পাওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

নয়তো, মৃত্যুর পর একটা জানাযা ছাড়া আমার কপালে হয়তো আর কিছুই জুটবে না।

দাসের কথা

চাকরী যে করে, সে তাঁর কাজের জন্যে বেতন পায়। নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সে কাজ করবে, এটাই চুক্তি। একজন দাস বা বান্দার ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়।

যে দাস, সে প্রতিদিন, প্রতিটা ক্ষণের জন্যেই দাস। একজন মানুষ সবসময়ই দাসত্ব করে। কেউ টাকা-পয়সার দাস, কেউ সামাজিক মর্যাদার দাস, কেউ ডিগ্রীর দাস, আর কেউবা খ্যাতির। এদের প্রায় সবাই-ই আবার নিজ নিজ ইচ্ছা তথা প্রবৃত্তির দাস। মানুষ টাকা-পয়সা, স্ট্যাটাস, খ্যাতি, উচ্চতর ডিগ্রী কিংবা নিজের প্রবৃত্তিকে প্রভুর আসনে বসিয়ে পুজো করতে চায় আজীবন। তবু কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না, হতে পারে না।

এমন কেনো?

কারণ, মানুষকে তৈরীই করা হয়েছে দাসত্ব করবার জন্যে। এটাই মানুষের বাই ডিফল্ট পজিশান। সে দাসত্ব করবেই। সত্যকে খুঁজে না পেলে তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়ে। শান্তি পায় না। তখন সে মন গড়া কিছু তৈরী করে হলেও সেটার পূজো করে, দাসত্ব করে শান্তি খুঁজতে চাইবে।

চাক্ষুষ জগতে আর কোনো প্রাণীকে যা দেয়া হয়নি, মানুষকে সেটাই দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সত্য মিথ্যে যাচাই করবার জন্যে, বাছাই করে চলবার জন্যে বুদ্ধিমত্তা ও বিবেক। এই দুটো ব্যবহার করে সে যখন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারে, আর স্রষ্টার পাঠানো বার্তা হতে তাঁর সত্যিকার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তখন আর সকল দাসত্বের শৃংখল ভেঙ্গে সে শুধু সেই একমাত্র মহান সত্ত্বার সামনে মাথা নত করে দেয়।

আর একমাত্র তখনই মেলে শান্তি। সত্যিকারের তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি।

সেই একমাত্র সত্য এবং মহান সত্ত্বার বিশালতার সামনে অন্য সকল মিথ্যে প্রভুর দলকে পায়ে পিষ্ট করে সে যখন নিজের মাথাটাকে নত করে দেয়, তখনই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের শুরু হয়। তাঁর আত্মা এবং পারিপার্শ্বিক জগত প্লাবিত হতে থাকে শান্তির ফলগুধারায়।

এই দাসত্বটা কিন্তু খুঁজে নিতে হয়। মালিক একবারও জোর করেন না। মালিক জানেন যে মানুষের মাঝে তাঁর ইন্সটল করে দেয়া বুদ্ধি আর বিবেকই তাঁর

ব্যাপারে সত্যটাকে খুঁজে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। একজন মানুষ যখন সেটা খুঁজে পায় তখন সেই মহান বিশালতার সামনে সে নিজ হতেই নত হয়ে যায়। পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করে দেয়। একমাত্র প্রভুর আদেশ, প্রভুর কথাই তাঁর কাছে শিরোধার্য হয়ে যায়। বাদবাকী সব কিছুকেই ঠেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

প্রতিটা মানুষকেই এই পথটাতে হাঁটতে হয়। নিজে থেকে খুঁজতে হয়, পেতে হয়, চিনে নিতে হয়।

মুসলিম কিংবা এখনও মুসলিম হয়নি এমন পরিবারে জন্ম নেয়া প্রতিটা মানুষকেই এই যাত্রার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তারপর চয়েস করতে হয়। আত্মসমর্পন, নাকি বিদ্রোহ? বেছে নিতে হয় যেকোনো একটাকে। আর এটাই পরীক্ষা।

বিশাল, দুঃসহ এই ব্যক্তিগত যাত্রায় পাশ করার পর শুরু হয় আরেক অনন্য যাত্রা। নিজেকে উন্নত করার প্রয়াস। মানুষ হিসেবে। দাস হিসেবে। দুনিয়ার জীবনে তাঁর করতে থাকা সব কাজকর্মকে সে নিখুঁত আর সুন্দরতম করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে তাঁর একমাত্র প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে।

দাস যখন নিজ হতে মালিককে চিনে নিয়ে দাসত্ব বরণ করে নেয়, তখন খুলে যায় মালিকের সাথে বন্ধুত্বের দরজা। মালিককে, দয়াময় প্রভুকে খুশি করার জন্যে সে দিনে পাঁচবার দেখা করে। কথা বলে মন খুলে। আনন্দের সাথে।

জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া মানুষটার সব কাজকর্মই তখন কেবলই চারপাশের মানুষের জন্যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। নিঃস্বার্থ কর্ম। সে মানুষের জন্যে কাজ করে, নিজের প্রতিটা কাজই সুন্দর করে করতে থাকে। সেটা মানুষকে বা নিজেকে খুশি করবার জন্যে নয়। তাঁর মালিককে খুশি করবার জন্যে।

তাঁর সব কাজেকর্মেও সে তখন তাঁর মালিকের সন্তুষ্টিকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। এমনকি সে যখন স্ক্রীনের সামনে কিছু পড়তে বসে সে শুধু তাই পড়তে চায়, যা পড়লে তাঁর মালিক খুশি হবে। সে তাই দেখতে চায়, শুনতে চায়, যা তাঁর মালিককে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট করবে। সে শুধু তাই আপলোড করে, তাই লেখে যা তাঁকে তাঁর মহানুভব মালিকের আরো আরো কাছের একজন করে নেবে। তাঁর প্রতিটা ক্লিক, প্রতিটা বাটনের চাপ পর্যন্ত সে চিন্তাভাবনা করে দেয়।

সে আর অন্যায় করে না। করতে চায় না। এভাবেই একজন মানুষ ধীরে ধীরে কল্যাণ হয়ে ওঠে সকলের জন্যে। তাঁর নিজের জন্যে। আর তাঁর মালিক তাঁকে নিয়ে গর্ব করেন। এবং এটাই সাফল্য। আর এরকম সফল মানুষের সংখ্যা সব যুগেই ছিলো হাতেগোণা। এরাই মুষ্টিমেয়। এদের জীবনেতো আর কোনোকিছুরই

দরকার নেই। কারণ, এরা সত্যকে পেয়ে গেছেন। ফলে, সন্তুষ্টিকেও। বরং এদেরকেই আজ বড্ড প্রয়োজন পৃথিবীর।

আপনি যদি এই হাতেগোণা মুষ্টিমেয় কয়েকজন সফল আর অসাধারণ মানুষদের একজন হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অভিনন্দন। এই পৃথিবীতে নিয়মানুযায়ী নিশ্চয়ই আপনি তীব্র যন্ত্রণায় দিন পার করছেন। আপনার জন্যে এডভান্সড লেভেলের পরীক্ষার অপেক্ষা করছে, কিন্তু দিনশেষে আপনিই সফল হবেন ইন শা আল্লাহ। এটা আপনিও জানেন। তাইতো সব কষ্টের মাঝেও হাসিমুখে আপনি ঘুরতে পারেন সবার মাঝে।

ঠিক না?

বোতল

কল্পনা করুন।

একটা বোতল দাঁড়া করালাম। ঠিক পাশেই গাদাগাদি করে আরেকটা বোতল। তার পাশেই ঠাসাঠাসি করে আরেকটা। এভাবে একটার পাশে একটা করে বোতল সাজিয়ে পুরো পৃথিবীর উপরিভাগ ঢেকে দিলাম।

কল্পনার লাগামকে ছেড়ে দিন আরো।

পুরো পৃথিবীকে বাইর থেকে দেখতে বোতল গ্রহ মনে হচ্ছে। এই একটা বোতলের স্তরের উপর আবারও বোতল রাখা শুরু করি পাশাপাশি। সারি সারি অগণিত বোতলের দ্বিতীয় স্তরটাও পেয়ে যাবো।

কল্পনার নাটাই থেকে সবটুকু সুতো এবার ছেড়ে দিন।

স্তরের উপর স্তর বসাতে থাকি বোতলের। একটার উপর আরেকটা স্তর। বিলিয়নের উপর বিলিয়ন স্তর। ভাবুন। বিলিয়ন বলেছি কিন্তু! বোতলের উচ্চতা মেঘ ছাড়িয়ে আকাশের বিশালতাকে ছাড়িয়ে যাবার ফন্দী আঁটছে এখন।

ভাবুনতো! এইখানে মোট কয়টা বোতল হতে পারে? ভাবুন।

পরের অনুচ্ছেদে যাওয়ার আগেই ভাবুন সর্বমোট কয়টা বোতল এইভাবে রেখে রেখে আকাশ ছুঁতে হবে। বোতলের সংখ্যা ভাবুন। বোতলগুলো কত্ত কত্ত বেশি সেইটা নিজের চোখে একবার কল্পনা করুন। পরের অনুচ্ছেদে যেতে হবে না। দরকার নেই। আগে ভাবুন দয়া করে।

ভেবেছেন? এবার ভাবুন, আপনার গুনাহ কি এতই বেশি হয়ে গেছে যে সেগুলো এইভাবে বোতলগুলোর মতো পাশাপাশি রাখতে রাখতে পৃথিবী ছেয়ে ফেলার পরেও লেয়ারের উপর লেয়ার হয়ে আকাশকে ছুঁয়ে ফেলবে? হয়তো আপনি এত বেশি গুনাহই করেছেন।

মন ভেঙ্গে যাচ্ছে? কিভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন এই মুখ নিয়ে? কিভাবে রাসুলুল্লাহ(স) এর সাথে দেখা করবেন এত এত্তো গুনাহ নিয়ে এটা ভেবে বিষন্ন লাগে? ফিরতে ইচ্ছে করে আজ থেকেই কিন্তু পারছেন না নিজের গুনাহর কথা ভেবে? এত গুনাহ, এত গুনাহ! ও আল্লাহ।!

আপনার জন্যেই আজকের এই লেখাটি লিখছি শুধু আপনাকে একটি হাদীস শুনাবো বলে। আপনার মন ভালো করে দেবো বলে। খুব মন দিয়ে প্রতিটা কথা পড়ুন আর ডুব দিন। ভাবুন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি:

"আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

হে আদম সন্তান!

যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) চাইবে, তুমি যা করেছো তা আমি ক্ষমা করে দেবো আর আমি কোনোকিছুরই পরোয়া করি না।

হে আদম সন্তান!

তোমার গোনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।

হে আদম সন্তান!

যদি তুমি পৃথিবী প্রমান গোনাহ্ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করে দেখা কর, তাহলে আমি সমপরিমান ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

তিরমিযী এই ৩৫৪০ নং হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

আবারও পড়ুন, বারবার পড়ুন। চোখ ভিজে যাবে আপনার। আল্লাহ আমাদেরকে কত্ত ভালোবাসেন দেখেছেন? এত্তো ভালোবাসা কোথায় পাবো আমরা? কোত্থাও না।

ক্ষমা চাই আসুন। ফিরে যাই আল্লাহর দিকে, আল্লাহর পথে হাঁটা শুরু করি পরিপূর্ণভাবে, আসুন।

এখনই মাফ চাই। মন থেকে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মাফ করে দেবেন। তিনিই তো পরম করুণাময় আর ক্ষমাশীল। তাঁর কাছেই তো আমাকে ফিরতে হবে।

ভাই

সলাতে নিচে হাত বাঁধুক বা উপরে সে আপনার ভাই। সুরা ফাতিহা শেষে জোরে আমীন বলুক বা আস্তে, মনে রেখো সে আপনার ভাই। রুকুতে যাওয়ার আগে রাফউল ইয়াদাইন করুক বা নাই করুক, কক্ষনো ভুলে যেও না সে আপনার ভাই। তাশাহহুদ পড়ার সময় শুধু একবার আঙ্গুল দিয়ে সাক্ষ্য দিক, কিংবা সারাক্ষণ, মনে রেখো সেই আঙ্গুল আপনি যে আল্লাহকে ভালোবাসেন সেই একই রাব্বের একত্বকেই ঘোষণা দেয় সগর্বে। মিলাদ পড়ুক বা না পড়ুক, নিশ্চিত জেনে রেখো আপনার ভাই ঠিকই রাসুলুল্লাহ এর নাম শুনলেই "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" বলে প্রিয় নবীর জন্যে দু'আ করে। সলাতে সেই একই রাসুলের (স) জন্যে সাক্ষ্য দেয়, দুরুদ পড়ে তাঁর জন্যে প্রিয় আল্লাহর কাছে দু'আ করতে ভুলে না। এই মাসজিদে বা ঐ মাসজিদে সে সলাত পড়ে, তাতে কি? আপনার আল্লাহর জন্যেই তো সলাত পড়ে সে। আপনার রাসুলের (স) শেখানো নিয়ম মেনেই তো সলাত আদায়ের চেষ্টা করে সে।

হ্যাঁ, আপনার ভাইও একজন মানুষ। আপনার মতোই সেও ভুল করে। তাই আপনি যেমন সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে তীব্র আকুতি নিয়ে বলেন, "আমাদেরকে সোজা সরল পথ দেখাও", যাতে আপনি অজানা ভুলের হাত থেকে, ভুল পথে হাঁটা থেকে বাঁচতে পারেন, বিশ্বাস করোন আপনার সেই একটু অন্যরকম ভাইটাও আল্লাহর কাছে একইভাবে সোজা পথের দিশা চায়। দিনশেষে আমরা কেউই জানি না, শুধু আল্লাহই জানেন। তাইতো তাঁর কাছেই আমাদের এই আত্মসমর্পন আর সাহায্য চাওয়া।

আপনার যে ভাই আল্লাহকে একমাত্র প্রভু আর উপাস্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, মুহাম্মাদকে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, মনে রাখবেন, মানুষ হিসেবে ভুল করলেও সে আপনারই ভাই। তাঁর কোনো কষ্টে আপনারও কষ্ট হবে বুকে। ভাইয়ের ভুল ত্রুটি গুলোকে অবহেলা করোন আজ থেকে। ভুল কার নেই, বলোন? তাই বলে কি ভাইকে দূরে ঠেলে দেয়া কি কোনো বুদ্ধিমানের চিন্তা হতে পারে? পারে না।

আমাদের মাঝের বিভেদ নিয়ে ফায়দা লুটে যায় হায়েনার দল। আর কতো?

এবার সময় এসেছে এক হওয়ার। আরো মার খাওয়ার আগেই এক হওয়ার।

বদলানোর রামাদান

রামাদানটাই আমার কাছে একটা উৎসবের মতো লাগে। কেমন জানি সব কিছু নির্ভার নির্ভার হয়ে যায়, হালকা হালকা হাওয়ায় ভাসে দিনগুলো।

রামাদান শেষে আমাদের সবারই স্পিরিচুয়ালি একটা খারাপ লাগা বুকে বাজে।

"রামাদানটা এত দ্রুত শেষ হয়ে গেলো?", এই প্রশ্নের পাশাপাশি আরো একটা হাহাকার বুকে ঢেউ তোলে-

"এই রামাদানেও বদলাতে পারলাম না? এই রামাদানটাকেও জীবন পরিবর্তনকারী রাহমাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না?"

এই খারাপ লাগাটাই প্রমাণ করে আল্লাহকে আসলে আপনি ভালোবাসেন। খুব ভালোবাসেন।

রামাদানের মতো এত বড় বি-শা-ল সুযোগ পেয়েও আল্লাহর কাছের একজন হতে না পারার আকুলতা আপনার বুকে শোঁ শোঁ করে বয়ে যাওয়াই এর সবচাইতে বড় প্রমাণ। আপনার জীবনে যে আল্লাহ এত এত কল্যাণ, নিয়ামাহ আর বারাকাহতে ভরিয়ে দিয়েছেন আপনি না চাওয়া সত্ত্বেও, আপনি কিছু ডিজার্ভ না করা সত্ত্বেও, সেইটা একজন কৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে যখনই আপনি আপনার অন্তরে অনুভব করেন, তখনই মনে হয়-

"হায়! আমি যদি আমার আল্লাহর এত এত গভীর ভালোবাসার বিনিময়ে উনার নিষেধগুলো বর্জন করতে পারতাম, আর আদেশগুলো পালন করে করে উনার প্রিয় বান্দাদের একজন হয়ে যেতে পারতাম!"

নবীদের ঘটনা, কোনো সাহাবীর কাহিনী, কিংবা কোনো আল্লাহর প্রিয় বান্দার ঘটনাগুলো আপনাকে আনন্দিত করে, আত্মাকে প্রশান্ত করে উৎসাহিত করে তোলে কেনো জানেন? কারণ, আপনি আসলে ভেতরে ভেতরে ঠিক তাদের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। এটাই একজন মুসলিমের অন্তর! এটাই একজন মুসলিমের স্বপ্ন! আপনার স্বপ্নও সেই গন্ডীর বাইরে নয়।

আপনি মনে প্রাণে চাচ্ছেন ঘুরে দাঁড়াতে। শুধু শাইত্বান আপনাকে বারবার হতাশ করে দিচ্ছে।

আমি বলছি, ভাইয়া আমার, হতাশ হবেন না। প্লিজ। যে গুনাহ করেছেন, করে ফেলেছেন। মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। সেটা বুঝতে তো পারছেন আপনি! এইতো চাই! অনেকে সেটাও বুঝতে পারে না। আপনার ভেতরে এখনো ঈমানের শিখা আছে বলেই না তার আলোর ছটায় আপনি আপনার ভুলকে ঠিক ঠিক ভুল হিসেবেই চিনতে পারেন, সেই ভুলের কথা ভেবে খারাপ লাগে। এখনো অনুতাপে মন পোড়ে।

এখন শুধু একটা কাজ বাকি।

তাহলো, সেই ভুল কাজের জন্যে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া। যতবারই ভুলে ভুল হয়ে যাবে সাথে সাথে মাফ চেয়ে ফেলবেন মন থেকেই। এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবেন যে আর কখনোই শাইত্বানকে জিততে দেবেন না। আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন না তো আর কার কাছে চাইবেন? লজ্জা পাবেন না। শাইত্বান চায়, সে নিজে যেমন মাফ না চেয়ে ধরা খেয়েছে, আপনিও তেমনি ধরা খান। কিন্তু আপনি তো আপনার আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের কথা জানেন। তিনিও ভুল করেছিলেন। পরে সত্যিই অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ায় আল্লাহ উনাকে মাফ করে দিয়েছিলেন। এইখানেই শাইত্বানের সাথে আল্লাহর বান্দাদের পার্থক্য। আমরা মাফ চেয়ে নিজেদেরকে ঠিক করার চেষ্টা করবো, আর আল্লাহর কাছে দু'আ করবো যেন তিনি আমাদের মাফ করে দিয়ে উনার আদেশ মানতে আর নিষেধ এড়িয়ে চলতে হেল্প করেন।

উনার কাছে আমরা মাফ চাই না আর দু'আ করি না। এইটাই হলো মূল সমস্যা। আসুন মাফ চাই। দু'আ করি ঠিক হওয়ার। অবাধ্যতার কাজগুলো আজ হতে ছেড়ে দিই, আর আদেশগুলো আজ হতেই স্টাবলিশ করার চেষ্টা করি মন থেকে আন্তরিকভাবে দু'আ করার সাথে সাথে।

আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি রামাদানের। আজ থেকে যদি খারাপ গুলো ছেড়ে ভালোগুলো শুরু করি, তাহলে এই কয়েকদিনেই অনেকদূর এগিয়ে যাবো আল্লাহ চাইলে। আর রামাদান আসলে সেই ভালো কাজ গুলো আরো অনেক অনেক বুস্ট আপ হয়ে যাবে আল্লাহর সাহায্যে।

আসুন না, এখনই হাত তুলে আল্লাহর কাছে মাফ চাই। ফিরে আসি। সত্যি সত্যি তাওবা করি। নেক্সট ওয়াক্তের সলাত থেকে যেন আর কোনো অজুহাতেই সলাত মিস না হয়ে যায়, সেইজন্যে স্টেপ নিই। শাইত্বানকে আমরা জিততে দিবো না, দিতে পারি না। আমাদের উপরে তার কোনো ক্ষমতাই নেই কেবল হালকা ফিসফিস করা ছাড়া। ওই ব্যাটার ফিসফিসানি শুনে হেরে যাবো আমরা? আমরা

কি সেই বীর মুসলিম জাতি নই?

আমরা জিতবোই এইবার। এইবারের রামাদানের আগেই ৫ ওয়াক্ত সলাত পড়া নিশ্চিত করে ফেলবো। আর এই রামাদানকে যেভাবেই হোক না কেন জীবনের সবচাইতে বেস্ট রামাদানে পরিণত করার জন্যে আজ থেকেই প্রত্যেক সলাতে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবো যেন উনি সাহায্য করে সহজ করে দেন।

হয়তোবা এইটা আমার আপনার জীবনের শেষ রামাদান।

আর ইন শা আল্লাহ এই রামাদানটাই হবে আপনার আমার জীবনের সবচাইতে সোনালী রামাদান।

ঘুরে দাঁড়ানোর রামাদান।

ফিরে আসার রামাদান।

যারা গুনাহ করতে চায় না, খারাপ কাজ করে ফেলার সাথে সাথে, হ্যাঁ, একদম সাথে সাথেই আল্লাহর কাছে সেই ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে মাফ চায়, গুনাহের উপরে অটল থাকে না, তাদেরকে আল্লাহর সূরা আলে ইমরানের ১৩৫-১৩৬ নং অসাধারণ কিছু সুসংবাদ দিয়েছেন। বললে আপনার মনটা এত্তবড় হয়ে যাবে এখনি।

দেখুন না আমাদের এত্তো অসাধারণ করুণাময় রাব্ব আমাদেরকে কী বলছেন?

তিনি বলছেনঃ

"আর যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে,

অথবা কোনো গোনাহের কাজ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসলে,

আবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহ খাতার জন্য মাফ চায়

কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন

এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না,

এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে,

তিনি তাদের মাফ করে দেবেন,

এবং এমন জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান !”

কত্ত অসাধারণ আমাদের আল্লাহ!

আসুন, উনার ক্ষমার দিকে আমরা দৌড়ে যাই, দৌড়ে যাই সেই চমৎকার প্রতিদানের দিকে যার ওয়াদা আমাদের পরম ক্ষমাশীল আর নিরন্তর করুণাময় নিজ থেকেই দিয়েছেন।

ও রাহমান, ও রাহীম, আমাদেরকে এখনি ঘুরে দাঁড়ানোর তৌফিক দাও। আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আর অন্তরটাকে পবিত্র করে নিয়ে আপনার প্রতি সচেতনতায় আর ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত করে দাও দয়া করে।

আ-মীন।

রমাদানের শেষাংশ

রমাদানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শেষ। চলে যাচ্ছে প্রিয় রমাদান। হয়তো আমার আর আপনার জীবনের সর্বশেষ রমাদান। আর হয়তো আমরা এই অসাধারণ মাসটার দেখা পাবোনা আমাদের জীবনে। এই পবিত্র রমাদান এসেছিলো আমাদেরকে বদলে দিতে। পুরো রমাদান জুড়ে আমাদের প্রতিটা শরীয়াহ বিরোধী কার্যকলাপ সচেতনভাবে ছেড়ে থাকার কথা ছিলো। সর্বক্ষণ সচেতন থাকার কথা ছিলো আমাদের প্রিয় প্রতিপালকের প্রতি। পুরো রমাদান জুড়ে মাথায় থাকার কথা ছিলো যে আমরা একটা ট্রেইনিং এ আছি। নিজেদের আমূল বদলে নেয়ার কথা ছিলো। এমনভাবে বদলে যাবার কথা ছিলো যাতে এই রমাদানের পর থেকে অন্তত আগামী এগার মাস পরবর্তী ট্রেইনিং এর আগ পর্যন্ত আমরা শরিয়াহ বিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। অর্জন করতে পারি মহান আল্লাহর প্রতি সচেতনতা, তাকওয়া। বদলে যাওয়ার এই ট্রেইনিং কে তাইতো আমরা এত পছন্দ করি, সম্মান করি, মর্যাদা দেই, যেভাবে পছন্দ করতেন, সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসুল (স) ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণ।

আমরা এই জাহেলী যুগের জাহেলী ছেলেমেয়ে, ফেরেশতা হওয়া দূরে থাকুক, আমরা একেকজন পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষও হতে পারিনি। আর তাই আমাদের জন্যে এই সিয়ামের সাধনার গুরুত্ব অনেক। এই সিয়াম-সাধনাই পারে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পঙ্কিলতা হতে তুলে আনতে, মুত্তাকীন হিসেবে গড়ে তুলতে। আর সেজন্যেই এই সিয়াম আমাদের এত্ত প্রিয়, এত্ত সম্মানের। তাই আজ আসুন নিজেদের একটা প্রশ্ন করি। আমরা কট্টুক নিজেকে বদলেছি? ট্রেইনিং এর দুই তৃতীয়াংশে কি আমরা শরীয়াহ বিরোধী তথা হারাম হতে দূরে রেখেছিলাম নিজেকে? আসুন নিচের প্রতিটা পয়েন্ট নিয়ে একবার করে খুব মন দিয়ে ভাবি।

আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত সময়মতো আদায় করেছি কি প্রতিদিন? অনর্থক কথা, আড্ডায় সময় নষ্ট করিনি তো? মিউজিক শুনিনিতো ভূলেও? এমন কিছুর দিকে তাকাইনিতো যেদিকে আমার তাকানোর কথা ছিলোনা, যেদিকে তাকানো নিষিদ্ধ, হোক সেটা সামনাসামনি কিংবা ইলেক্ট্রনিক স্ক্রীনে? পবিত্র ইফতারের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, যখন সারাদিনের সিয়াম সাধনা পরিপূর্ণ হয়, ঠিক সেই সময়েই ইফতারের নামে পার্টি করিনিতো? ইফতারকে উপলক্ষ্য বানিয়ে পর্দা লঙ্ঘনের মতো শরিয়াহ বিরোধী কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের সিয়াম সাধনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করিনিতো?

কারো অনুপস্থিতিতে তাঁকে নিয়ে সমালোচনায় মাতিনিতো? এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করিনিতো বা লিখিনিতো, যেটা উচ্চারণ করলে বা লিখলে নিজেরই লজ্জা হওয়া উচিৎ? সিগারেট বা যেকোনো মাদক গ্রহণ এই মাসে পরিত্যাগের মাধ্যমে নিজেকে ট্রেইনিং দিচ্ছিতো, যাতে আর কোনোদিন খেতে না হয়, আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ না হতে হয়? আব্বু আম্মুর সাথে খারাপ ব্যবহার করিনিতো? তাঁদের সাথে গলা উচু করে কথা বলিনিতো? সুদী লেনদেন হতে নিজেকে সরিয়েছিতো? চিন্তা করি আসুন। শুধু এগুলোই নয়, শরিয়াহ বিরোধী প্রতিটা কাজের কথা চিন্তা করুন যেটা এই রমাদান থেকে আর "কোনোদিনও" আমাদের করার কথা নয়। আসুন ভাবি।

ভাবনা যদি ঠিকমতো শেষ হয় তাহলে এতক্ষণে আমাদের ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। রমাদান পেয়েও যেসব দূর্ভাগারা নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করতে পারেনা তাদেরকে জিবরাইল (আ) যে অভিশাপ দিয়েছেন আর আমাদের রাসুল (স) তাতে কবুল বলেছেন, নিজেদেরকে সেইসব হতভাগ্য অভিশপ্তদের মাঝে আবিস্কার করার কথা। আমরা ক্ষমা আদায় করবো কি, এখনো তো স্বেচ্ছায় বুঝেশুনে গুনাহর সাগরেই হাবুডুবু খাচ্ছি, প্রাণেপণে উঠে আসারও চেষ্টা করছিনা। হায়! এই যদি আমার জীবনের শেষ রমাদান হয়? আগামী বছর রমাদান আসার আগেই যদি আমি মারা যাই? যদি চলে যেতে হয় এই দুনিয়া ছেড়ে? কি নিয়ে যাচ্ছি আমি? অনন্তের পথে তো হেঁটেই যাচ্ছি। মালাকুল মাউতের লিস্টেতো আমার নাম গতকালের তুলনায় অনেক অনেক উপরে উঠে এসেছে। আর তো বেশি সময় নেই। তবুও কি জাগবো না? এই রমাদানটা পেয়েও কি নিজের হাতেই নিজেকে শেষ করে দেবো?

না। নিশ্চয় না।

যা গেছে, তাতো গেছেই। এখনো রমাদানের এক-তৃতীয়াংশ বাকি। এখনো বাকি মহা-গুরুত্বপূর্ণ শেষ দশদিনের সিয়াম সাধনা। বাকি আছে শেষ বিজোড় দশরাতের মাঝে সযত্নে লুকানো পবিত্র লাইলাতুল ক্বাদরের রাত। এখনো সময় আছে সচেতনদের জন্যে। এই মূহুর্তে যদি উপলব্ধি আর বিবেক ফিরে আসে তাহলে আশার আলো আছে। একটু কষ্ট, একটু পরিশ্রম দিয়েই নিজেকে নিজের পঙ্কিলতার অসীম কুয়ো থেকে টেনে তুলতে পারি। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার, সচেতনতার। এই শেষ দিনগুলোর ট্রেইনিং এ নিজেকে গড়ে-পিটে নিতে পারি সত্যের পথের মজবুত সৈনিক হিসেবে, যাকে কোনোভাবেই তাঁর পথ হতে বিন্দুমাত্র টলানো যায়না। কঠিন না। একটুও কঠিন না। যদি আমাদের ইচ্ছে থাকে, মনেপ্রাণে সাহায্য চাই আল্লাহর কাছে, অটল থাকার জিদ করি, তাহলে

সহজ, একদমই সহজ। জাহিলিয়্যার পথ, অজ্ঞতার পথ, গুনাহের পথ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প হচ্ছে ক্ষমা পাওয়ার শর্তগুলোর একটি। তাই ক্ষমা পাচ্ছি কি না তা নিজেরাই বুঝতে পারবো। আল্লাহতো সুরা তোয়াহার ৮২ নং আয়াতে স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন,

"তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারপর সোজা—সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশী ক্ষমাশীল।"

এই আয়াতে আল্লাহ ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ চারটা পয়েন্টের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

প্রথমত, তাওবা করতে হবে অনুতপ্ত হয়ে। নিজের কাজের ভুল আর তাঁর পরিণাম নিয়ে সচেতন হতে হবে। মাফ চাইতে হবে সেই কাজের জন্যে। আর কখনো সেই কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে মন থেকে। মন থেকে ছাড়তে না চাইলে সেটাতো আল্লাহ জানবেন। আল্লাহতো সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয়ত, ঈমান আনতে হবে। আমরা যখন খারাপ কাজ করি, আল্লাহর আর তাঁর রাসুলের (স) আদেশের অমান্য করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিই, তখন আমাদের ঈমান থাকেনা। তাই আমাদের আবার ঈমান আনতে হবে পরিপূর্ণভাবে। স্মরণ করিয়ে দিতে হবে নিজেকে সেগুলো যেগুলো ভূলে যাওয়ার কারণে আমরা "প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট" হয়ে গেছি। ঈমানহারা অবস্থায় একটা মূহুর্তও যেন না থাকি, ফলে মরণ এসে গেলেও আমরা ঈমান নিয়েই ইনশাল্লাহ যেতে পারবো।

তৃতীয়ত, সৎকাজ করতে হবে। ভালো ভালো কাজের মাধ্যমে করে আসা ভুল-ভ্রান্তিগুলো পূর্ণ করতে হবে। শুধুমাত্র আমাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই সৎকাজ করে যেতে হবে।

আর চতুর্থত, এরপর থেকে ঠিক হয়ে যেতে হবে। একদম সোজা হয়ে যেতে হবে। আর ঐ ভুলগুলো করা যাবেনা যেগুলো আল্লাহ আর তাঁর রাসুল (স) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সোজা সঠিক পথে চলতে হবে। তবেই আমাদের প্রিয় আল্লাহ আমাদের জন্যে বেশি বেশি ক্ষমাশীল হয়ে যাবেন।

এই বাকি দিনগুলোতে আমাদের সত্যিকারভাবে সচেতন হতে হবে। সিয়াম রেখে সারাদিন মাথায় রাখতে হবে, "আমি সিয়াম সাধনা করছি। আল্লাহর জন্যেই করছি। কোনো ভুল করবোনা। কোনো ভুল না। ভূলেও না।" সচেতন হতে হবে খুব। নিজের এন্টেনাগুলোকে খাড়া করে দিতে হবে আরো। আর ক্ষমা প্রাপ্তির

চারটা পয়েন্ট মাথায় রেখে ক্ষমা চাইতে হবে বেশি বেশি। ফিরে আসতে হবে, ঈমান আনতে হবে, যেকোনো রকম সৎকাজ করতে থাকতে হবে আর এখন থেকেই সোজা-সঠিক পথে চলতে হবে। তাহলেই আমরা ক্ষমা পেয়ে যাবো। ক্ষমা পাবোই। এত আমাদের পবিত্র আর মহামহিম আল্লাহর কথা, যে কথার কোনো নড়চড় হতে পারেনা।

তবুও যদি ক্ষমা আদায় করতে না পারি তাহলে আমার চেয়ে হতভাগা আর কে আছে? আল্লাহ আমাদেরকে রমাদানের অপূর্ব সুযোগ দিলেন, ক্ষমা পাওয়ার অপূর্ব সুযোগ দিলেন, কিভাবে ক্ষমা পেতে হবে তাও নিজেই শিখিয়ে দিলেন, পবিত্র লাইলাতুল ক্বাদরকে খুঁজে পাওয়ার সূবর্ণ সুযোগ দিলেন, যদি আমরা তারপরো না ফিরে আসি, তাহলে আল্লাহর ন্যায়বিচারে তো আমরা রক্ষা পাবোনা। আমরা নিজেরাই যদি ধ্বংসের পথ বেঁছে নিয়ে সেই পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি, সেই পথেই থেকে যেতে চাই, তাহলে ধ্বংসই সুনিশ্চিত। আল্লাহর পবিত্র কালাম, ক্ষমার নিশ্চয়তা, মানুষের দেয়া রিমাইন্ডার কোনোটাই আমাকে বাঁচাতে পারবেনা, যদি নিজেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিই। আমরা যেন সেইসব দূর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না হই যাদেরকে নিয়ে আল্লাহ সুরা তোয়াহার ১২৪-১২৭ নং আয়াতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

"আর যে ব্যক্তি আমার যিকির (উপদেশমালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ন জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।

সে বলবে, "হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখানে আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন?"

আল্লাহ বললেন,

"হ্যাঁ, এভাবেই তো আমার আয়াত যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এভাবেই আমি সীমা লংঘনকারী এবং নিজের রবের আয়াত অমান্যকারীকে (দুনিয়ায়) প্রতিফলদিয়ে থাকি এবং আখেরাতের আযাব বেশী কঠিন এবং বেশীক্ষন স্থায়ী।"

আল্লাহ আমাদের সচেতন হতে সাহায্য করুন। উনার পথে থাকার শক্তি দিন। আমাদের অন্তরকে দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে দিন। রাসুল (স) এই দু'আটা প্রায়ই করতেন,

"হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত

করে দিন।”

এই দু'আটা হোক আমাদের নিত্যসঙ্গী।

আন্তরিক আর অনন্য সচেতনতায় কাটুক আমাদের বাকি সিয়ামগুলো। আমরা যেন এই রমাদানে অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, আমাদের সব গুনাহর ক্ষমা নিয়েই যেন আল্লাহর দরবারে যেতে পারি। এটিই আমাদের জীবনের সর্বশেষ রমাদান হতে পারে। এটা মাথায় রেখে রমাদানের শেষ দশদিনে যেন বিশেষভাবে অতিরিক্ত ইবাদাত করতে পারি। সলাত, আল্লাহর স্মরণ আর কুরআন অধ্যয়নে নিজেকে যুক্ত করতে পারি। নিজেকে সকল হারাম হতে মুক্ত করে নিতে পারি সারাজীবনের জন্যে।

কাফনে জড়িয়ে কবরে চলে যাওয়ার দিন চলে এসেছে অনেক কাছে। সেই নতুন ঘরের নিরাপত্তার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় এখনই।

আমার মুক্তি এবং ক্ষমার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন প্লিজ।

প্রিয় মানুষগুলো

উনার বাবা মা মুসলিম না?

-জ্বী না।

-কি বলেন? অমুসলিম?

-জ্বী।

-তাহলে?

-তাহলে আর কি! বাবা মায়ের মতোই দেব-দেবীর মূর্তির পূজা করতেন। আল্লাহ যে একাই সব সৃষ্টি করেছেন, কন্ট্রোল করছেন সবকিছুই, আল্লাহ ছাড়া যে আর কারো পূজা করা উচিৎ না, সেটা উনি তখনও জানতেন না।

-উনি বড় কোনো ক্রাইম করেননি?

-জ্বী করেছেন। দুনিয়ার বুকে সবচাইতে বড় ক্রাইম হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারো পূজা করা। এতে আল্লাহ সবচাইতে বেশি অপমানিত হন। রাগ করেন। এটা তিনি বারবার জানিয়ে দিয়েছেন। তবে কেউ যদি নিজের ভুল বুঝে, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে ফিরে আসে, আর একমাত্র আল্লাহরই পূজা করে তাঁরই পাঠানো মেসেজ আর নির্বাচিত মেসেঞ্জারের মাধ্যমে শেখানো পথ অনুযায়ী, তাহলে তিনি স-ব মাফ করে দিবেন বলেছেন, এমনকি জান্নাতও দিয়ে দিবেন বলেছেন। আল্লাহতো সবচাইতে ক্ষমাশীল। কেউ সত্যি সত্যি ক্ষমা চাইলে উনি ক্ষমা করে দেন।

-হ্যাঁ। এটা আমি জানি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বা পূজা করে মারা গেলে আল্লাহ তাকে আর ক্ষমা করেন না। তাই মৃত্যুর আগেই পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসতে হবে ক্ষমা চেয়ে। আচ্ছা, এটার পাশাপাশি উনি আর কি কি জঘন্য অপরাধ করেছেন? এই ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি? উনি কি ইসলামের বিরুদ্ধে কখনো কিছু করেন নাই?

-করেন নাই মানে? তিনি হাতে অস্ত্র পর্যন্ত তুলে নিয়েছিলেন। ইসলামকে সারা জীবনের জন্যে দুনিয়া থেকে মুছে দেয়াই ছিলো তাঁর পরিকল্পনা। এবং সেটা

করার জন্যে তিনি খোলা অস্ত্র নিয়ে দৃঢ়ভাবে রাস্তায় পর্যন্ত বের হয়ে গেছেন।

-তারপর?

-তারপর সবচাইতে অসাধারণ ঘটনাটা ঘটলো। তাঁর কানে কুরআনের কিছু কথা চলে আসলো। তিনি কুরআনের কথা শুনতে পেলেন। তিনি নির্বোধ আর বেকুব ছিলেন না। বুদ্ধিমান ছিলেন। একটু ভাবতেই বুঝে গেলেন এই কথাগুলো কোনো মানুষের পক্ষে বানানো কোনোওদিনও সম্ভব না। সাথে সাথে ছুটে গেলেন এবং ইসলামকে নিজের জীবনটাকে যাপনের বিধান করে নিলেন। মাফ চেয়ে ফিরে আসলেন আগের অন্ধকারের জীবন থেকে। ইসলামকে সমুন্নত করার জন্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম আর আত্মত্যাগ করলেন। আলোকিত সোনালী মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুললেন। আর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা তো করলেনই, এমনকি মৃত্যুর আগেই একটা অসাধারণ সুসংবাদ পেয়ে গেলেন। জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ।

-তার মানে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত লাভের কথা জানিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুর আগেই। রাসুলের (স) মাধ্যমে, ঠিক?

-জ্বী।

-কী নাম ছিলো উনার? চেনা চেনা লাগছে কেমন জানি!

-উমার। খাত্তাবের ছেলে উমার। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন উনি। সারা দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি অংশ শাসন করেছিলেন উনি কুরআনের বিধিবিধান দিয়ে। সিংহাসনে বসে নয়, খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে। আল্লাহর ন্যায় বিচারকে ভয় করে চলতেন উনি। উনার ন্যায় বিচার আর ন্যায় শাসনের কারণে ইসলাম মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছিলো। জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি অলওয়েইজ কান্নাকাটি করতেন এই ভেবে যে, তিনি হয়তো বড় কোনো ভুল করে ফেলেছেন, তিনি হয়তো তাঁর দায়িত্ব পালনে পারফেক্ট নন বা তাঁর ইবাদাত হয়তো কবুল হচ্ছে না।

-আফসোস! আর আমরা ভাবি যেনো আমরা জান্নাতেই আছি। আর ভাবি যারা এখনও ইসলামকে চিনেনি, মুসলিম হয়নি, তারা আর কোনোওদিনও ইসলামকে চিনতে পারবে না, মুসলিম হবে না। ফলে এরা সবাই অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।

-ঠিক। অথচ আমরা এত এত আল্লাহর অবাধ্যতা করছি যে হয়তো আমরাই

জাহান্নামে যাবো, আল্লাহ আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে স্বীকারই করবেন না। আমাদেরতো কেবলই নামের মাঝেই ইসলাম আছে, জীবন থেকে ইসলামের বিধিবিধান, সৌন্দর্য আর চালচলন বিদায় নিয়েছে।

আর অন্যদিকে যারা এখনও মুসলিম হয়নি, তারাই হয়তো আগামীকাল কুরআনের সত্যতা বুঝে ফেলবে, আল্লাহকে চিনে ফেলে কেঁদে ফিরে আসবে, আর উমারের (রা) মতোই আল্লাহর প্রিয় মানুষদের একজন হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেবে।

সত্যি তো এটাই যে, কুরআনের আগমনের পর পর ইসলাম যাদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিলো, এবং সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে গিয়েছিলো, তাঁরা প্রায় সবাইই ছিলেন কনভার্টেড মুসলিম। বর্তমানেও কনভার্টেড মুসলিমরাই ইসলামের জন্যে জানেপ্রাণে কাজ করছেন। আর মুসলিম ঘরে যারা জন্মেছেন তাঁরা হেসেখেলে দিন কাটাচ্ছেন, আর নিজের দুনিয়াবি জীবনের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছেন। ভুলে গেছেন আখিরাতকে।

তাই যিনি আজ এখনও মুসলিম নন, তিনিই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের আলোতে আসবেন, আর সারা দুনিয়ার লক্ষ কোটি মানুষের কাছে ইসলামকে পৌঁছে দিবেন।

আল্লাহই সব জানেন। উনি আমাদেরকে যতটুকু জানিয়েছেন তার বাইরে যে আমরা কিছুই জানি না।

খেজুরের বাগানটা

সেদিন বিকেল বেলায় তিনি নিজের খেজুর বাগান দেখতে গেলেন। খেজুরের বাগান মানেই হলো বিশাল ব্যাপার। অনেক অনেক খেজুর গাছ, গাছের ফল, সাথে জমির মূল্যতো আছেই। তো দেখতে দেখতে বেশ কিছু সময় পার হলো। হঠাৎ কী যেন মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি মাসজিদে রওনা হলেন। পৌঁছে দেখেন, তিনি আসরের জামাত মিস করে ফেলেছেন। মন ভেঙ্গে গেলো। এরকমতো কোনোদিনও হয়নি। হওয়ার কথা না। চরম বিষাদ আর কষ্টে হৃদয়টা ছেয়ে গেলো উনার। এই কষ্ট কাউকে বুঝানো সম্ভব না, কাউকে না। জামাতে সালাত মিস করার চেয়ে দুঃখের ব্যাপার, কষ্টের ব্যাপার একজন মু'মিনের (বিশ্বাসীর) কাছে আর কিই বা হতে পারে!

ভেবে দেখলেন, তাঁর খেজুরের বাগান দেখতে যাওয়াই এই সালাত মিস হওয়ার কারণ। আখিরাতের অসাধারণ ক্যারিয়ার ধ্বংসের মুখে চলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই খেজুর বাগানের সম্পত্তি। হ্যাঁ, তিনি ভালো করেই জানেন, দুনিয়ার দরকার আছে। এখানে সম্পদের দরকার আছে ভালো থাকার জন্যেই, মানুষের এবং নিজের দুনিয়া আর আখিরাতের উপকারের জন্যেই। এখানকার ক্যারিয়ার এবং সম্পদ হবে আখিরাতের ক্যারিয়ারকেই আরও অনেক বেশি সুনিশ্চিত এবং সুন্দর করার জন্যে। কিন্তু সেই সম্পদ আর ক্যারিয়ারই যদি এক ওয়াক্ত সালাত জামাতে মিস করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই ক্যারিয়ার আর সম্পদ কেবল ক্ষতিই ডেকে আনবে। সফলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। অনন্তের ক্যারিয়ার পুরোপুরি ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে এই সম্পদ আর ক্যারিয়ারের মোহে।

অমুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা অসম্ভব প্রজ্ঞাবান মানুষটা ইসলামকে জেনে-বুঝে-যাচাই করেই নিজের সারা জীবনের যাপন পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। দুনিয়া তাঁর হাতের মুঠোয় ছিলো, অন্তরে নয়। অন্তর পরিপূর্ণ ছিলো আল্লাহ আর রাসুলের (স) প্রতি অগাধ কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা আর সচেতনতায়। ন্যায়বান আল্লাহর নিখুঁত বিচারের ব্যাপারে সেই অন্তরে নিশ্চয়তার বীজ বপন করা ছিলো। তাই সাথে সাথেই তিনি বুঝে গেলেন তিনি কী হারিয়ে ফেলেছেন!

আল্লাহ তাঁর সাথে দিনে মিনিমাম পাঁচবার দেখা করতে বলেছেন। রুকুকারীদের সাথে রুকু করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ জামাতে সালাত আদায় করতে বলেছেন। আরও আদেশ করেছেন তাঁর রাসুলের (স) আনুগত্য করতে। যে
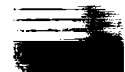
রাসুলের (স) কথা অবশ্যই অবশ্যই মানতে হবে, সেই রাসুল (স) ও বারবার বারবার করে বিশ্বাসীদের সালাত আদায় করতে বলে গেছেন, এবং জামাতের সাথেই তা করতে বলেছেন।

আজান মানেই প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁরই সাথে মিটিং করার (অর্থাৎ দেখা করার, কথা বলার, নিজেকে সমর্পন করার) আহবান। যারা মুসলিম তাঁরা এই আহবানকে কখনোই অগ্রাহ্য করেন না। করতে পারেন না। প্রশ্নই আসে না। অন্যদিকে এই সালাত জামাতে আদায় না করার সাথে অন্তরে মুনাফিক্বির (অর্থাৎ ভন্ডামীর) অস্তিত্বের নিশ্চয়তার কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে। এমনকি বিশ্বাসীদের সাথে অবিশ্বাসীদের পার্থক্যকারী বলা হয়েছে সালাতকে।

কী ভয়াবহ! কী ভয়ংকর!

তিনি সাথে সাথেই এক কাজ করলেন। তাঁর পুরো খেজুর বাগানটা সাথে সাথেই সাদাকা (দান) করে দিলেন। যাতে এই সাদাকা (দান) তাঁর জামাতে সালাত মিস করার ভয়ংকর অন্যায়কে একটু হলেও প্রশমিত করে। আর কক্ষনো যেন তাঁর প্রতিপালক আর তাঁর সম্পর্কের মাঝে দুনিয়াবি কিছুই বাঁধা হয়ে আসতে না পারে।

যে অন্তর আল্লাহকে চিনেছে, রাসুল (স) কে চিনেছে, যে অন্তরে আখিরাতের অনন্ত ক্যারিয়ারের গুরুত্বের বিশালতা স্থান পেয়েছে, সেই অন্তরে দুনিয়ার স্থান হবে কি করে? দুনিয়া থাকে তাঁর হাতের মুঠোয়, যাকে ইচ্ছেমতোন ব্যবহার করা যায়, কিন্তু দুনিয়াতো তাঁর অন্তরকে ব্যবহার করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না কখনোই। যিনি দুনিয়া আর আখিরাতের স-বকিছুর মালিক, তাঁর বিশালতাকে ধারণ করার পরপরই অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়, আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না এরপর।

অমুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা অতি সাধারণ, আপনার আমার মতোই এই মানুষটা দুনিয়ার বুকে থাকা অবস্থাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ আর তাঁর রাসুল (স) কে চেনার কারণে, আনুগত্যের কারণে, আল্লাহর জন্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দেয়ার কারণে।

আমরা জানি, তিনি ছিলেন উমার ইবনে খাত্তাব। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

ইন শা আল্লাহ আমরা যারা নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছি, আত্মসমর্পন করেছি শুধু তাঁর কাছেই, তাঁরা এই ওয়াক্ত থেকে আর একটা ওয়াক্ত সালাতও মিস করবো না। অবশ্যই অবশ্যই জামাতে আদায় করবো। ক্ষমা চাইবো

অতীতের সব ভুল-ভ্রান্তির জন্যে। আর দুনিয়া এবং আখিরাত, দুই জায়গাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি আর সাফল্য আদায় করতে পারবো। নিশ্চয়ই সত্যিকারের সাফল্য একমাত্র পরম করুণাময়, নিরন্তর দয়ালু আর পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর হাতে। আর আমরা সবাই-ই তাঁর রাহমাত আর দয়ার মুখাপেক্ষী।

দড়ি

ধবধবে শাদা দড়ির মজবুত মইটা সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে।

সবাইকে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হলো। জীবন চলে যায় যাক, দড়িটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না। যারা এটা মানবে শুধুমাত্র তারাই সফল হবে। অমান্যকারীরা হবে নিশ্চিত পথভ্রষ্ট, ফলে ব্যর্থ।

পরীক্ষা চলছে।

তো, একটা রুমে ১০জন মানুষ দড়িটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। এদের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করতে হলে যতোই ঘেন্না আর আক্রোশ থাকুক এদের বিরুদ্ধে, দড়ি আঁকড়ে ধরা ঐ ১০জনের ভেতর থেকেই বাছাই করতে হবে। সবাই দায়িত্ব পালন করায় সবাইকেই সমান সুযোগ দিতে হবে। আর কোনো অপশন নাই।

কিন্তু যদি সেই রুমে শুধু একজন মানুষ দড়িটা আঁকড়ে ধরে থাকে, আর বাকি ৯জন তাদের দায়িত্ব জানা সত্ত্বেও দড়িটাকে আঁকড়ে না ধরে থেকে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, তখন দড়ি আঁকড়ে ধরা মানুষদের যারা ঘেন্না করে, তারা বাছাই করে ঐ ৯জন থেকেই নিয়ে নেয়। তাদেরকে খাতির যত্ন করে। সুযোগ সুবিধা দেয়। সৎ, দায়িত্ববান আর যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দড়ি আঁকড়ে ধরা মানুষটাকে তার প্রাপ্য নূন্যতম সুযোগটুকুও দেয়া হয় না।

সে অবাক হয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে বেকুবের মতো ভাবতে থাকে, "আরি আজিব তো! আমি কী করলাম?"

বেকুব দায়িত্ববান মানুষটার সাথে ঘটে যাওয়া এই কুৎসিত অন্যায় আর জঘন্য দূর্নীতির জন্যে শুধু বাছাইকারী ঘেন্নাবাজটা নয়, পাশাপাশি ঐ ৯জনও কিন্তু সমানভাবে দায়ী। দড়িটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকাটা একমাত্র দায়িত্ব জেনেও তারা সেটাকে ছেড়ে দিয়ে শুধু ঐ একজনকেই অন্যায়ের একমাত্র শিকার হতে বাধ্য করেছে।

ঠিক কিনা?

টেনশানের কিছু নাই।

কারণ, ন্যায় বিচারের দিন খুব কাছে। খুব।

যারা দড়িটা আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হাত ছিলে ফেলেছেন, প্রতিদিন রক্তে জবজবে হয়ে ভিজে যাচ্ছে হাত আর হৃদয়, তবুও দাঁতে দাঁত কামড়ে হাতে গনগনে কয়লা ধরে রাখার মতো তীব্র কষ্ট আর যন্ত্রণা নিয়েও দড়িটা আঁকড়ে ধরে আছেন, তারা খুশি হন। প্লিজ খুশি হন, আর কৃতজ্ঞ হন। বিশ্বাস করুন, আপনার সফলতা খুব নিকটেই। খুব।

শুনো, একদম মন খারাপ করবেন না। একটু ওয়েইট করুন। জাস্ট পরীক্ষাটা শেষ হোক। আর একটু পর যখন পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাবে তখন আপনার প্রতিপালক আপনাকে যে কী দেবেন আপনি সেটা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবেন না। কোনো কান কোনোদিন তা শুনেনি, কোনো হৃদয় কখনো সেটা কল্পনা করতে পারেনি। আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

আর আজ যাদের ঘেন্না আর নিজ নিজ দায়িত্বে অবহেলার কারণে আপনি আপনার প্রাপ্যটুকু হারাচ্ছেন, তাদের বেলায় "সবর" করুন। আপনার প্রতিপালক ন্যায় বিচারক।

হ্যাঁ, উনি ন্যায় বিচারক!

শুধু এইটুকু মনে রাখুন আর খুশিমনে অপেক্ষা করুন। শেষ হাসিটা আপনিই হাসবেন।

উপহার

এই এক্ষুণি একটা মজার ঘটনা ঘটবে, দেখুন!

পৃষ্ঠা থেকে এইমাত্র আপনার চোখে আলো গেলো। সেনসরি নিউরন বেয়ে সাঁই করে ব্রেইনে উদ্দীপনাটা চলে গেলো। ব্রেইন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসেস করলো। বুঝতে পারলো আপনি এই অনুচ্ছেদের পাঁচ নং বাক্যটার সিগন্যাল পাঠাচ্ছেন এখন। ঘটনাটা বুঝার কারণে আপনার মুখে এখন সুন্দর একটা মুচকি হাসি।

সামান্য কিছুক্ষণের এই মজার ঘটনাটার জন্যে দরকার ছিলো চোখের সক্ষমতা। সেনসরি নিউরনের কার্যক্ষমতা। মস্তিস্কের সুস্থতা। সিগন্যালকে প্রসেস করার জন্যে এই উপহারগুলো দিয়ে অর্জিত এতদিনের জ্ঞান। কর্মক্ষম সুস্থ মাংসপেশি। মুচকি হাসার জন্যে মুখের মাংসপেশিতে মস্তিস্ক হতে মোটর নিউরন বেয়ে আসা সিগন্যাল। আর সেনস অফ হিউমারের জটিলতায় আর নাই বা গেলাম!

এই উপহারগুলো আপনি নাও পেতে পারতেন। কিছুই বলার ছিলো না আপনার। কয় বিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনতেন তখন এইগুলো? কেনা যায় এগুলো? প্রতি মূহুর্তে কয় বিলিয়ন ডলারের উপহার উপভোগ করছেন আপনি? আমি কি এখনও আপনার ফুসফুস, হৃদপিন্ড কিংবা মাথার উপরের ছাদ, আব্বু-আম্মুর আদর আর দুপুরের খাবারের কথা বলেছি? এখনও কয়েক লক্ষ উপহারের কথা বলিনি আমি। বললে আরো কয়েকটা বই লিখে ফেলতে হবে, সেটা জানেনতো?

কেনো পাচ্ছেন এত উপহার? আপনাকে পরীক্ষার হলেও এত এত উপহার পাঠাচ্ছেন উনি! কেনো? কে আপনি?

সমগ্র সৃষ্টির তুলনায়, এই মহাবিশ্বের বিশালতার তুলনায় আপনিতো একটা বালুকণার সমানও না। চোখেই দেখা যায় না আপনাকে এতই তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র আপনি! সেই আপনাকে উনি এত ভালোবাসেন কেনো? কেনো এত যত্ন করেন? কেনো এত আদর করেন? কেনো শুধু ক্ষমা করে দেন? কেনো আপনাকে অনন্তের ক্যারিয়ার চেনাতে চান, সেইখানে সফল হিসেবে দেখতে চান? কেনো? কি দরকার উনার? কি লাভ উনার? কি সুবিধেটা হবে উনার আপনি এত উপহার পেলে, পরীক্ষায় পাশ করলে, ওই ক্যারিয়ারে ভালো করলে?

কোনো লাভ হবে না, সুবিধেও না। উনার এসবের দরকারও নেই। তবুও এত

ভালোবাসেন আপনাকে উনি! এত্তোওও! উনি শুধু চান যে আপনি উনার কাছে ফিরে যান। উনার কাছে থাকেন। ভালোভাবে পাশ করে আরো আরো উপহার নিয়ে নেন উনার কাছ থেকে। যেনো আপনি আরো ভালো থাকেন, আরো খুশি হন, আনন্দে থাকেন! এখানকার আনন্দগুলোতো কোনো আনন্দই না। উনি আপনাকে সবচাইতে তীব্র আর অনন্তের আনন্দের সুখে ভাসিয়ে দিতে চান। উনিতো সারাক্ষণ আপনাকে দেখছেন, ভালোবাসছেন, ভালোবাসা আর আদর দিয়ে আপনার কাছেই আছেন উনি।

আপনি কবে উনাকে দেখবেন? প্রাণভরে ভালোবাসবেন? উনার কাছে ফিরবেন? উনাকে চিনবেন, বুঝবেন? অনুভব করতে পারছেন এই অপার অতলস্পর্শী ভালোবাসাকে? বুকের গভীরে কোথাও কি আপনার জন্যে এই অনন্ত অসীম নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে চিনতে পারছেন?

কপালটা মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে এখুনি উনার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে আপনার। ঠিক না?

গোশতের দাওয়াত

দোস্ত দাওয়াত দিলো। ডিনারের দাওয়াত। কবুল করলাম।

রাতে যখন গেলাম দোস্ত সাদরে তার রুমে নিয়ে গেলো। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো। স্বপ্নেও ভাবিনি এমন কিছু ঘটা সম্ভব। এত কুৎসিত, আর জঘন্য ঘটনাকে ভাষায় বর্ণণা করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবুও বলার চেষ্টা করছি।

কথা বলতে বলতেই বন্ধু তার খাটের তলা থেকে একটা মানুষকে টেনে বের করলো। কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখলাম সে নগ্ন মানুষটার পা টেনে নিয়ে রানের উপর কামড় বসালো। অনেকক্ষণ টানা হেঁচড়া করে চামড়া সহ এক খাবলা গোস্ত টেনে বের করে নিয়ে আসলো সে। তারপর হাসিমুখে চিবুতে লাগলো আমার চোখের সামনেই। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম।

-কী করতেসিস তুই এইগুলা?

-আরে, খেয়ে দ্যাখ না! ইটস ফান!

-হোয়াআআআআট? কী বললি তুই এইটা? কী বললি?

-সিরিয়াসলি বলতেসি।

-তুই এইভাবে ইশমামের গোস্ত খাচ্ছিস, আবার বলতেসিস ফান! মজা!

-ইয়েপ! আরে ও মাইন্ড করবে না।

বলেই আবার কামড় বসালো।

মাথা নষ্ট হয়ে গেলো আমার। সবকটা তার ছিঁড়ে গেলো। চিৎকার করতে লাগলাম আমি পাগলের মতো। নিষেধ করতে লাগলাম। ও শুনছেই না। শেষে থামাতে না পেরে আমি ওকে ধরে সব শক্তি দিয়ে টানতে লাগলাম। তবুও ও গোস্ত কামড়েই থাকলো। ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। কী ভয়ংকর! কী নৃশংস!!

শেষে ব্যর্থ হয়ে ঘেন্নায় আর প্রতিবাদে চিৎকার করতে করতেই আমি ওর বাসা থেকে এক ছুটে বের হয়ে এলাম।

আর সাথে সাথেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো।

উপরের পুরো লেখাটা গল্প হলেও এটা তখনই সত্যি হয়ে যায়, যখনই আমরা কারো অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে এমন কথা বলি যেটা সে কোনোভাবে শুনতে পেলেই মনে কষ্ট পাবে। আঘাত পাবে। সত্যি কথা হলেও। এইভাবে কাউকে নিয়ে তার অনুপস্থিতিতে কথা বলা খুবই খুবই জঘন্য। এটা এতই নিকৃষ্ট আর জঘন্য যে আল্লাহ নিজেই সুরা হুজুরাতের আয়াত নং ১২ তে এইভাবে কারো অনুপস্থিতিতে কথা বলাকে মৃত ব্যক্তির গোস্ত খাওয়ার মতো জঘন্য কুৎসিত আর বীভৎস দৃশ্যের সাথে তুলনা করেছেন।

এরকম সিচুয়েশানে আমরা যখনই প্রতিবাদ করে বলি যে-

-ভাই, তুই ওর পিছনে এরকম কথা বলতেসোস কেনো? এটা কিন্তু একদমই ঠিক না।

-আরে, আমি ওর সামনেও বলতে পারবো।

অর্থাৎ সে এই কথাগুলো সত্যি কথাই বলছে। এবং অনুপস্থিত মানুষটার সামনাসামনি হলেও সে তার মুখের উপরেই এই সত্যি কথা বলে দিতে পারবে।

তাহলে কী সম্মুখে নিন্দা করা ভালো?

মোটেও না। পরম করুণাময় সম্মুখে এবং পেছনে নিন্দাকারীদের ধ্বংসের কথা সুরা হুমাজাহর প্রথম আয়াতেই বলে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, কারো অনুপস্থিতিতে সত্য কথা, যেটা তার মনে কষ্ট দিবে, সেটাই গীবাহ। আর কথাটা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে সেটা অপবাদ। নামীমাহ। গীবাহ করাই যদি এত কুৎসিত আর জঘন্য হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে, তাহলে মিথ্যে অপবাদ যারা দেয়, তাদের কথা আর নাই বা বললাম!

আজ থেকে আমরা যেনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে ভালো কথা বলি, এবং শুনি। কেউ খারাপ কথা বললে একজন মু'মিন হিসেবে তাকে যেনো অবশ্যই বাধা দিই। তারপরেও সে না থামলে যেনো সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচি। নিজেকে অন্তত বাঁচাই।

কারণ, যে মানুষটা মৃত ব্যক্তির গোস্ত মজা করে খাচ্ছে, তার সেই কাজটাকে আমি সত্যিই ঘেন্না করলে জোরেসোরে প্রতিবাদ করে থামাতে চাইবো। তাকে বুঝাবো আন্তরিকভাবে। নিষেধ করবো এরকম কাজ না করার জন্যে। আর অনেক চেষ্টার পরেও থামাতে না পারলে, এরকম কুৎসিত কাজের প্রতি অন্তর থেকে ঘেন্না

থাকার কারণে সহায়তা না করে (অর্থাৎ না শুনে) নিজে অন্তত পালিয়ে বাঁচবো। যাতে বিচারের দিন আল্লাহর সামনে গীবাহ শুনে তাকে সাহায্য করার কারণে ধরা না খেতে হয়।

মানুষ হয়ে কোনো মরা মানুষের গোস্ত খাওয়ার দৃশ্য কী চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদাস ভঙ্গিতে দেখা সম্ভব?

সবচাইতে ভালো আছেন, সুখে আছেন। হালাল টাকা কামাচ্ছেন। কামানোর সময় কোনো রকম আল্লাহর অবাধ্যতা করতে হচ্ছে না। না সলাত ভঙ্গের। না সুদের। না পর্দার। হায়! অথচ তাঁকেই আমরা শান্তিতে থাকতে দিতে চাই না। আমাদের বড্ড সাধ সেই শান্তিতে থাকা মানুষগুলোর বুকে যদি টাকা নামক খোদার মূর্তি গড়ে দেয়ার। এরপর আজীবন আমার মতোই টাকার পুজো করতে করতে তাঁর নাভিশ্বাস উঠুক, আর এভাবেই সে কবরে পৌঁছে যাক নিঃস্ব আর রিক্ত অবস্থায়।

আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম সঙ্গী দিন। আল্লাহর উপর সর্বাবস্থায় যারা সন্তুষ্ট, টাকার পুজারী যারা নয়, বরং এক আল্লাহর গোলামী আর সন্তুষ্টি অর্জনই যাদের জীবনের সফলতার একমাত্র মাপকাঠি, তাদের সাথেই আজীবন বন্ধুত্ব তৈরী করে দিন। সেই সফলতা দিন আমাদেরকে যাকে আল্লাহ আর তাঁর রাসুল (স) সফলতা হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়ে গিয়েছেন। নোংরা সমাজের পূজা করা থেকে আমাদের অন্তরকে রক্ষা করুন।

আ-মীন।

যেদিন কারো মাথার উপরে ছায়া থাকবে না, থাকবে গনগনে রোদ, সেইদিন আল্লাহ উনাকে ছায়া দিবেন। যেইদিন আপনি আমি বিচারের টেনশানে ভেতরে ভেতরে আতঙ্কে মরে যাবো, সেইদিন হিসাব নিকাশ নিয়ে আল্লাহ তাঁকে নিশ্চিন্ত রাখবেন। যেইদিন হিসাবের ভয়ে আতঙ্কে, আপনাকে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে ভালোবাসেন যে আব্বু-আম্মু, সেই আব্বু-আম্মুই চিনবেন না, সেইদিন উনার আব্বু-আম্মুকে শুধু উনার সম্মানের কারণেই আল্লাহ এত্ত সম্মান দিবেন, এত সম্মানের জ্বলজ্বলে মুকুট দিবেন যে সেটা চারিদিকে ঝকঝকে আলোময় করে দিবে।

আপনি আমি পূজা করি টাকার। টাকাকেই খোদা বলি। যার টাকা আছে তাঁকে সম্মান করি, সালাম দিই, যার নেই তাকে ছ্যাঃ বলে গা সরিয়ে নিই। যে মানুষটা বেশি টাকা কামায় না তাকে ব্যর্থ বলি, কথাও বলতে ইচ্ছে করে না তার সাথে। আর যিনি ভালো(!) জব করেন, অর্থাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার জব করেন, তাকে নমোঃ নমোঃ করে সাঙ্গাষ্টে প্রণাম করতে চাই লম্বা হয়ে।

টাকা নামক খোদাকে অর্জনের ভিত্তিতে আমাদের জীবন আর সম্মানের মাপকাঠি আমরা নির্ধারণ করে নিয়েছি। আল্লাহ কি বোঝেন না? দেখেন না? এর জন্যে কি আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না? সেই জিজ্ঞাসাবাদের দিন আর বেশি দূরে নেই। কাছে। খুব কাছে। নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে আমরা সুখী না। কারণ? টাকা।

অথচ আমরা ভালোভাবেই জানি, এই টাকার চাহিদার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। আজ যে মানুষটা হালালভাবে, আল্লাহর অবাধ্য না হয়ে ২০০০ টাকা কামাচ্ছেন, দিনে এনে দিনে খাচ্ছেন, তিনিই তো সফল। তাঁর হিসেব হবে কম। সবচাইতে কম। জান্নাতের দোরগোড়ায় তিনিই দ্রুত দৌড়ে গিয়ে কড়া নাড়তে থাকবেন। এই তো সফলতা।

উচ্চ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী আমাদের নাককে করছে আরো উচ্চতর। বাড়াচ্ছে টাকা। স্ট্যাটাস। সাথে অহংকার। হায়! বাঁচতে কয়টা টাকা লাগে বলুন? খুব সামান্য। খুবি সামান্য। মানুষের মতো বাঁচতে হলে এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লাগে না। এত এত্তো সার্টিফিকেট লাগে না। মনুষ্যত্ব লাগে। সেইটা বাদ দিয়ে আমরা কিসের জিন্দেগী ধারণ করতে চাই? পশুর? ভোগের?

টাকা নিয়ে নিজের অসন্তুষ্টি, নিজের মাপকাঠির স্কেলটা দিয়ে অন্যদেরকেও লাগিয়ে তুলতে, অবিরাম ঠেলতে বাঁধে না। অথচ আমরা বুঝি না, যাকে আরো অনেক অনেক বেশি টাকা কামানোর জন্যে ধাক্কা দিচ্ছি তিনি হয়তো এখনই

বুঝে কথা বলা

প্রতিদিনের সালাতে যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হয়, কথা বলতে হয়, তখন মনকে আগে আল্লাহু আকবার বলে বুঝিয়ে দেই, "আল্লাহ বড়" । সবকিছুর চাইতে আল্লাহ বড় । মন শুধু আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত হয় । তারপর সানা পড়ে আল্লাহর প্রশংসা করি, অভিশপ্ত শাইত্বান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি । তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে সূরা ফাতিহা দিয়ে আমরা কথা বলা শুরু করি ।

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ কে সেটা ঘোষণা করি । তারপর তাঁকে ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য আর নিজেকে তাঁর দাস বলে ঘোষণা দিয়ে সাহায্য চাই । চোখ ভিজে আসে নিজের অসহায়ত্ব মনে করে । আল্লাহকে বলি পথ দেখাতে । সহজ সরল পথ । নিয়ামাত প্রাপ্তদের পথ । তাদের পথ নয় যাদের উপর তাঁর রাগ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথ হারিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে । কবুল করার মিনতি নিয়ে আকুতি জানাই "আ-মীন" বলে ।

এরপর আমরা অন্য আয়াত তিলাওয়াত করি কুরআন থেকে । মূলতঃ এই আয়াতগুলোই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে গাইডেন্স, হিদায়াহ, যে গাইডেন্সের জন্যে আমরা সূরা ফাতিহায় কেঁদে কেটে আকুতি জানিয়েছি, ফরিয়াদ জানিয়েছি । যে যত বেশি কুরআন মুখস্থ করে সে তত বেশি তিলাওয়াত করতে পারে । তাই কুরআন মুখস্থ থাকা, আল্লাহর বাণী মনে থাকাটা জরুরী । একই সাথে সেটা বুঝাও জরুরী । কারণ, না বুঝে কি তিলাওয়াত করলাম না করলাম, সেটা আমার জীবনে প্রভাব ফেলবে কি করে? আমরা কুরআন হতে যাই শিখি, যাই জানি, সবগুলোর উদ্দেশ্য একটাইঃ সালাতে এপ্লাই করা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে । ফলে, সালাতের আলো জীবনে প্রতিফলিত হওয়া ।

কুরআন মুখস্থের পাশাপাশি তাই আমরা এর অর্থ জানা, বুঝা, আর প্রতিফলনেও জোর দেবো ইন শা আল্লাহ । আল্লাহ আমাদের জন্যে সহজ করুন ।

সেই কুখ্যাত চ্যালেঞ্জ

আমরা সবাই জানি, অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যেতে বললে ইবলিস অহংকারের কারণে মাফ চাওয়া দূরে থাকুক, উল্টো নিজের অপরাধ না দেখে আল্লাহকে দায়ী করেছিলো, আর আদম-সন্তানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করবে তার বর্ণণা দিয়ে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো বেয়াদবী করেছিলো। ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলো।

এই চরম বেয়াদবী করতে গিয়ে ইবলিস যা বলেছিলো তাতে খুবই একটা মজার ব্যাপার আছে। আছে আমাদের কথা। আপনার আমার কথা। কুরআনের সুরা আল-আ'রাফের ১৬ আর ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ ইবলিসের এই কথাটা আমাদের জন্যে রেকর্ড করে রেখেছেন।

আল্লাহকে দোষ দেয়ার পাশাপাশি আমাদেরকে নিয়ে কি বলেছিলো সে? দেখি আয়াত দু'টোঃ

"সে (ইবলিস) বললো: "তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছ তেমনি আমিও এখন তোমার সরল-সত্য পথে এ লোকদের জন্যে ওঁত পেতে বসে থাকবো, সামনে-পেছনে, ডানে-বাঁয়ে, সবদিক থেকে এদেরকে ঘিরে ধরবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকর গুজার পাবে না।"

সে বলেছে সে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, নষ্ট আর ধ্বংস করার জন্যে সত্যের সরল পথে, সাফল্যের পথে, জান্নাতের সোজা পথে ওঁত পেতে বসে থাকবে। আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, সামনে পেছনে, ডানে-বামে থেকে সে আসবে, আক্রমণ করবে যাতে আমরা সত্য-সরল পথে না থাকি। এবং পরিণতি হিসেবে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবো। আর আমাদেরকে অকৃতজ্ঞ করে দেয়াই তার আল্টিমেইট টার্গেট।

প্রথমত, আল্লাহ চান আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই। ধ্বংস না হই। উনি আমাদেরকে খুবই খুবই ভালোবাসেন। তাই ইবলিসের কথাগুলো কুরআনে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে ইবলিসের ফাঁদ থেকে বাঁচতে পারি। সত্য সরল পথ চিনে নিই, আর তা থেকে কক্ষণো না সরে যাই।

দ্বিতীয়ত, ইবলিস সামনে-পেছনে আর ডানে-বামে থেকে আক্রমণ করবে বলেছে।

উপর থেকে আক্রমণ করবে বলেনি? কেনো? কারণ, সে যখন চারপাশ থেকে আক্রমণ করবে, আর আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবো, তখন আল্লাহ সাহায্য পাঠিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করবেন উপর থেকেই। কাজেই, ইবলিস যতোই হামলা করুক, আমাদেরকে নাড়িয়ে দিক, আমরা যেন আল্লাহর সাহায্য চাইতে ভুল না করি। উপর থেকে সাহায্য আসবেই।

ফাইনালি, ইবলিসের আক্রমণে আমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবো বলে ইবলিস দাবী করেছে। অর্থাৎ, এটাই তার লক্ষ্য। অকৃতজ্ঞ করে দেয়া। আমি অকৃতজ্ঞ হয়ে গেলেই সে সফল।

এর মানেটা আসলে কী?

এর মানে হচ্ছে, যে সত্যিকারের বিশ্বাসী, যে জানে আল্লাহ কেমন, যে আল্লাহকে চিনে, সে সবসময় জীবনের সব ঘটনাতেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। আল্লাহ যাই করেন, তা তার কাছে পছন্দ হোক বা না হোক, তাতেই একজন মু'মিন সন্তুষ্ট থাকে। আস্থা রাখে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর। সে জানে এই সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে, আর আল্লাহ কখনোই ভুল সিদ্ধান্ত নেন না। সম্ভব না।

এই দুনিয়ার জীবনে সুখ সবসময়েই ক্ষণস্থায়ী। হুট করে প্রবল সুখ আসে আর সাঁই করেই চোখের পলকে চলে যায়। একজন মু'মিন এটা জানে। সে তার লালন-পালনকারীর উপরে, পরম করুণাময়ের সিদ্ধান্তের উপরে সবসময় অবিচল আস্থা রাখে। সবসময়।

আর এই প্রজ্ঞাময়ের উপর আস্থা হতেই আসে সন্তুষ্টি। এই সন্তুষ্টিই একজন মু'মিনকে রাখে শান্ত আর অবিচল। যাই ঘটে তার জীবনে, তার মন-পুকুর থাকে শান্ত-স্থির। সে থাকে কৃতজ্ঞ, হাসিমুখ।

আর ইবলিস কেবলই হেরে যায় তাকে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট করতে না পেরে, অকৃতজ্ঞ করতে না পেরে।

মু'মিন জিতেছে, জিতবে।

আল্লাহ চাইলে সফলতা আমাদেরই হবে।আমাদেরই।

নিজেকে বলি

ইবলিস আল্লাহকে অবিশ্বাস করতো না, এখনও করে না। তাকে কোনো শাইত্বানও কানে কানে প্ররোচনা দেয়নি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার জন্যে। তার প্রবৃত্তি-ই (বা নফস-ই) তাকে আল্লাহর অবাধ্য করে তোলে।

ফলে, সে সিজদা না করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। আর আল্লাহর আদেশ শুধুমাত্র একবার অমান্য করাটাই তার বহিস্কার এবং অভিশপ্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো।

খেয়াল করে দেখি, এখানে ইবলিসের অবাধ্যতাই ছিলো তার "কুফর" (অবিশ্বাস)।

আমরা আল্লাহকে একবারও যদি সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাই, পরম করুণাময়ের সরাসরি আদেশের অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস যদি একবারও মাথায় স্থান পায়, তখন যেনো নিজেকে মনে করিয়ে দিই-

ইবলিসের প্রবৃত্তি-ই তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিলো,

আর আল্লাহর অবাধ্যতাই ছিলো তার "কুফর"।

কাউকে বলার জন্যে নয়, নিজেকে শোনানোর জন্যেই, অবাধ্য না হওয়ার জন্যেই যেনো কথাটা মনের মাঝে গেঁথে রাখি।

এটা যেনো আর কক্ষনো না ভুলি। কক্ষনো না।

কবে শিখবে ভালোবাসতে?

আপনাকে আমি ভালোবাসি।

এই "আপনি" হচ্ছেন একটা প্রতিক্রিয়া (Effect) যার মূল কারণ (cause) হচ্ছেন শুধুই একজন। উনি না থাকলে আপনি এভাবে সৃষ্টি হতেন না। আপনাকে ভালো লাগা দূরে থাকুক, কখনো দেখাই হতো না আপনার সাথে, জানেন? কাজেই, এই যে আপনি আপনার মতো, এই যে আপনাকে আমি এত ভালোবাসি, তার পেছনের মূল কারণকে আমি ভালো না বেসে আমি কী করে থাকবো বলেন?

এই যে "আমি", সেই আমিও কিন্তু ঐ একই মূল কারণ (cause) থেকে আসা প্রতিক্রিয়া (Effect)। এই যে আমি আপনাকে দেখছি, বুঝতে পারছি, অনুভব করছি নিজের মাঝে, এত এত ভালোবাসছি, উনি না থাকলেতো এই "আমি"-ই থাকতাম না। আমাকে দেয়া এই চোখ, কান, মস্তিস্ক, হৃদয়ের স্পন্দন, এতসব অথৈ অতলস্পর্শী দামী উপহারগুলো ব্যবহার করে আপনাকে আমার চেনাই হতো না কোনোদিন। বুঝেন সেটা? যিনি আমাকে তৈরী করেছেন, তারপর ব্যবহার করার জন্যে উনার কাছ থেকে এত এত অমূল্য সব উপহার দিয়েছেন, যা না দিলে আমার কিছুই করার ছিলো না, বলার ছিলো না, সেই উনাকে ভালো না বেসে কী করে পারি বলেন? কিছু করতে আর বলতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন সেটাও যদি উনি না দিতেন তাহলে অভিযোগটুকুও যে করতে পারতাম না। আমাদের অভিযোগ-অভিমান করার ক্ষমতাটুকুও যে উনারই অসীম দয়ার একটা ক্ষুদ্র প্রতিফলন।

প্রথম বাক্যটার শেষে "ভালোবাসি" বলেছিলাম, খেয়াল করেছেন? একটা অণু-পরমাণু কিংবা ইলেক্ট্রন ভাবতে পারে না, জানেন তো? একটা পাথর বা সাগর কিছুই ভাবতে পারে না। একটা চশমাও কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু সেই একই অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরী হওয়া আমার ভেতরে আমি অপার্থিব বিশাল একটা অনুভূতি ধারণ করতে পারি। ভালোবাসা। শোঁ শোঁ করা ভালোবাসা। তাথৈ তাথৈ ভালোবাসা। এই অনুভূতির স্রষ্টাও আমি নই। এর পেছনের মূল কারণ অন্য কেউ। রহস্যে ঘেরা একজন। এই যে বুকের ভেতরটা উথালপাথাল করা ভালোবাসা আমাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই ভালোবাসার উৎস যিনি, স্রষ্টা যিনি, তাঁর ভালোবাসাটা কেমন? কতো কতো গভীর? কত্তো বেশি তীব্র আর মায়াময়? আমি-আপনি সেটা কোনোদিনও বুঝতে পারবো না। কিন্তু আমাদের অনুভূতির সবটুকু

তীব্রতা দিয়ে সেটার একফোঁটা হলেও অনুভব করতে পারবো, বুঝে ডুবে যেতে পারবো। এইটুকু যে তিনি আমাকে দিয়েছেন সেটাও কেবল তাঁরই দয়া।

এই যে তিনি আমাদের বুকের ভেতরে এই অদ্ভুত সুন্দর আর সুতীব্র অনুভূতিটুকু দিয়েছেন, সেটা দিয়ে যদি তাঁকেই না চিনলাম, না বুঝলাম, ভালো না বাসলাম, তাহলে সত্যিকারের ভালোবাসা কী সেটা আমরা এখনও জানি না, বুঝি না, শুধু এর উপরের সামান্য ছোঁয়ায় ভালোবাসাকে বুঝে ফেলার ভান করে নিজের কুপ্রবৃত্তিতে ভেসে যাই মাত্র। এর অতলে এখনও আমরা ডুব দিইনি, ভাবিনি। ভাবলে কী করে এত এত ভালোবাসার জনকে অসন্তুষ্ট করতে পারি? ভালো না বেসে থাকতে পারি? এও কি সম্ভব?

প্রথম বাক্যটার "আপনি", "আমি" আর "ভালোবাসা" এই তিনটার কিছুই থাকতো না যদি তিনি দয়া করে এই তিনটা সৃষ্টি না করতেন, আমাকে বুঝতে না দিতেন। আর আপনাকে এই লেখাটা পড়বার জ্ঞান-ক্ষমতা না দিতেন। হ্যাঁ, আপনি যে লেখাটা পড়তে পারছেন, তাঁকে আজ একটু একটু করে বুঝতে পারছেন, আগের চেয়ে একটু বেশি হলেও চিনতে পারছেন, এটাও আপনার প্রতি তাঁর অশেষ ভালোবাসার ক্ষুদ্র একটা প্রকাশ মাত্র। এইটুকু কেবল আপনি বুঝতে পারছেন মাত্র। যে বিশাল অংশটুকু বুঝতে পারছেন না সেটা যে কত্তো বিশাল তা বুঝতে পারছেনতো?

তাঁকে যেদিন একটু হলেও বুঝে ফেলবেন আপনি, সেদিনই আপনি প্রথম বুঝতে পারবেন ভালোবাসা কী? এর স্বরূপ কী?

আর তখন থেকে যাই দেখবেন, যা কিছুই ভালো লাগবে, নাড়া দিয়ে যাবে হৃদয়ের সবগুলো তন্ত্রীকে, তার সবটুকুই আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে, তাঁকে আরো আরো ভালোবাসতে শেখাবে। আপনার মানুষ সত্ত্বাকে জড়-পশুদেহ থেকে আস্তে আস্তে সুবিশাল এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

আপনি আলো হবেন । ভালোবাসার কোমল আলো। আপনার আলোয় চারপাশের এই এপার-ওপার-অপার জগৎ গলে গলে ঝরে পড়বে অপরূপ স্নিগ্ধতায়।কবে ভালোবাসতে শিখবেন আপনি?

চাকরী আর আপনার আপোষ

দুঃখিত। এটাই এখানের রুলস। আপনাকে আমরা নিতে পারছি না। আমরা সত্যিই দুঃখিত।

-ধন্যবাদ। আসসালামু 'আলাইকুম।

মন বিষন্ন করে বেরিয়ে এলেন এই ইন্টারভিউ থেকেও।

দাড়ি রাখা বা পর্দা করা যাবে না, তাই এখানেও আপনার জবটা হলো না। দুই মুঠো ভাতের জন্য আপনি আপনার নীতির সাথে আপোষ করেন নি, সত্যের সাথে আপোষ করেন নি। আপনাকে অভিনন্দন।

তবুও মন খারাপ লাগছে?

আপনার কি এই দুনিয়ার জীবনকে কারাগার মনে হচ্ছে?

তাহলে আপনাকে কিছু কথা বলি।

মদ হারাম জেনে জীবনে আপনি মদ খাননি।

ইসলাম বোঝার পর, সিগারেট খাওয়া উচিৎ নয় জানার পর আপনার ঠোঁটে আর সিগারেট ওঠেনি।

সুদী লেনদেনে জড়িত থাকা হারাম জেনে সব রকম ঝুঁকি থেকে বাঁচতে চাকরী খোঁজার তালিকা থেকে আপনি "ব্যাঙ্ক" নামের অপশানটাই কেটে দিয়েছেন।

পর্দা করতেই হবে জেনে, নিজেকে আবৃত করে আপনি আনন্দিত হয়েছেন, মার্জিত এবং ভদ্র হয়েছেন। বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নামের ব্যভিচার থেকে বাঁচতে বিয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সব আত্মীয় স্বজনের টিটকারীর যন্ত্রণা আপনি অধোমুখে সহ্য করেছেন।

দাড়ি কাটা হারাম জেনেছেন যেদিন, সেদিন হতে আপনার মুখ ব্লেডের স্পর্শ ভুলে গেছে একগাল হাসি নিয়ে। চোখ নিচু রাখতে হবে জেনে রাস্তা, ল্যাব, মার্কেট সবখানেই বোনদের সম্মান রক্ষার্থে আপনার চোখ নিচু থাকে। জীবনে সফলতা একটাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে সফলতার সংজ্ঞা কুরআনে দিয়েছেন, সেটাই সফলতা।

আপনি কি বুঝতে পারছেন যে আপনি সেই সফলতা অর্জনের পথে হাঁটছেন?

আল্লাহ আপনাকে শক্ত করে তৈরী করছেন। আপনার ঈমানের পরীক্ষা করছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জান্নাতের জন্যে আপনাকে যোগ্য করে তুলছেন। দেখছেন দুই মুঠো রিজিক্বের টেনশান আপনাকে সত্য হতে সরিয়ে দেয় কি না? আপনি হারামকে অবলম্বন করে রিজিক্ব খুঁজছেন কি না? আপনি ধৈর্য্য ধরে আছেন। সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নিলেও, এমনকি জীবন দিয়ে দিতে হলেও আপনি ঈমান থেকে সরবেন না। আপনার এই জীবনটাকে কারাগারের মতো অসহ্য লাগছে। কেউ পাশে নেই, একা একা কারাবাস করছেন। মুক্তি খুঁজছেন।

অভিনন্দন।

আপনাকে "মু'মিন" সম্বোধন করেই হাদীসে বর্ণণা এসেছে। আবারো অনেক অনেক অভিনন্দন।

আল্লাহ আপনাকে না খাইয়ে রাখবেন না। খুব শীঘ্রই দেখবেন, হালাল উপায়েই স্বস্তিময় রিজিক্বের উৎস তিনিই আপনাকে খুঁজে দেবেন। কারো ঋণাত্মক কথায় কান দেবার সময় যেন আপনার না হয়। যার কথায় আপনি দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত হবার কথা চিন্তা করছেন, সে কিন্তু আপনার কবরে যাবে না, আপনাকে করা সাওয়ালের জবাব সে দেবে না। আর মনে রাখবেন, দ্বীনের পথ সরল, সোজা রেখার মতো। এই পথে চলার সময় যে বিন্দু হতে আপনার যাত্রা একটু বিচ্যুত হওয়া শুরু হবে, দিন শেষে দেখবেন সেই শুরুর সামান্য বিচ্যুতি আপনাকে আপনার মূল গন্তব্য হতে কত দূরে নিয়ে এসেছে। তাই এই মজবুত রশিকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন, দরকার হলে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকুন। তবু যেন ছেড়ে দেয়ার চিন্তা মাথায় না আসে। দুনিয়ার জীবনের ব্যাপারে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন। আর তারপরেই আসবে পুরস্কারের সেই অসাধারণ দিন।

আল্লাহতো বলেই দিয়েছেন, *"লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না?"* (সুরা আনকাবুত: ২)

''তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল

এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি। তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট–ক্লেশ ও বিপদ–মুসিবত, তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। এমনকি সমকালীন রসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"

[সুরা বাকারা: ২১৪]

"তোমরা কি মনে করে রেখেছ তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। "

[সুরা আলে ইমরান: ১৪২]

কাজেই আর একটু সবর করুন। এই জীবনটা চোখের পলকেই অনেকদূর পার করে এসেছেন না? দেখতে দেখতেই শেষও হয়ে যাবে। আর একটু ধৈর্য্য ধরুন।

উনিতো বলেই দিয়েছেন,

"আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো।

এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোনো বিপদ আসে বলে:

"আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"

তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।"

[সুরা বাকারা: ১৫৫–১৫৭]

"হে ঈমানদারগণ! সবর ও সালাতের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।"

[সুরা বাকারা: ১৫৩]

"...চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন... " [সুরা তাওবা: ৪০]

আপনার দূর্বলতা

সৃষ্টিগত নকশা অনুযায়ীই মানুষ দূর্বল। তাই সে খোঁজে এমন একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন যেটা তাকে এই ক্রমাগত জীবন-যুদ্ধক্ষেত্রে অবিরাম সাহস যোগাবে, শক্তির উৎস দেখিয়ে দেবে বারবার।

সে ভুলে যায় যে, যে খুঁজে বেড়ায় এবং যেটাকে খুঁজে বেড়ায় উভয়কেই বাই ডিফল্ট দূর্বল বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছে। আপেক্ষিকতাহীন পরম শক্তির একমাত্র একচ্ছত্র অধিকারী যিনি, সেই ক্ষমাশীল নিরন্তর করুণাময় এবং চিরন্তন দয়ালু আমরা না চাইতেই অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতকে একসাথে চুড়ান্ত প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের আলোর অপূর্ব বন্ধনীতে বেঁধে আমাদের শক্তি আর নির্ভরতার অফুরন্ত বহমান উৎস হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একমাত্র সেইখান থেকেইতো আমাদের বারেবারে আকন্ঠ সিঞ্চন করে নেয়ার কথা। যারা আমার চেয়ে দূর্বল, তাদের অবলম্বন হিসেবে নিজেকে গড়ে-পিটে নিয়ে গ্রানাইট ভেঙ্গে-চুরে-কুঁদে নির্মেদ অটল ভরসার জায়গা হিসেবে নিজ-আত্মাকে প্রতিদিন পুড়ে পুড়ে খাঁটি করে নেবার কথা।

অন্যের মাঝে নয়, বরং পরম শক্তির আধার থেকে বারংবার সাহায্য আর অনুপ্রেরণা নিয়ে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে নিজের সম্পূর্ণ সত্ত্বাকে ভেঙ্গে-গড়ে নিয়ে অন্যের জন্যে দাঁড়ানোটা শিখতে হবে দাঁতে দাঁত চেপে।

প্রত্যেককেই সেই অমিত প্রতিভা আর ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

ভুল সময়ে ভুল জন্ম বলেতো কিচ্ছু নেই।

তিনি সাধ্যের অতীত কোনো বোঝা কারো উপরেই কক্ষনো চাপিয়ে দেন না।

আপনার কাঁধের বোঝাটা আপনি বইতে পারবেন জেনেই আপনাকে দেয়া হয়েছে।

তিনি জানেন, আপনি পারবেন।

হ্যাঁ, তিনি জানেন বলেই এই অসহ্য পরীক্ষা আজ আপনার কাঁধে।

আপনি পারবেন বলেইতো জেনেশুনেই এই দুঃসহ পরীক্ষার হলে আপনাকে এই

প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ, আপনি এটার যোগ্য বলেই। পাশ করার ক্ষমতা রাখেন বলেই।

হাল ছেড়ে দিয়ে উনাকে অখুশি করে দেবেন না।

হাল না ছেড়ে আপনার এই অবিরাম চোয়াল শক্ত করে চেষ্টা করে সামনে এগিয়ে যাওয়াটাই আপনার পাশমার্ক।

So, don't you ever dare to give up and make Him disappointed in you.

KEEP IT UP BRAVEHEART

জীবন্ত মিরাকেল

১৭ বছর বয়সী আনপড় ছেলেটা। ডিগ্রী, সার্টিফিকেট দূরে থাকুক, অক্ষর চেনার মতো নূন্যতম পড়ালেখাও কপালে জুটলো না। আমরা যাকে অশ্রদ্ধা করে ডাকি বকলম! সে নাকি তাঁর এলাকাকে বদলে দেবে! হেহ! সেই সময়ের কিছু মানুষকে নিয়ে একটা টীম গঠন করলো সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বলে। নাহ হলো না! ২৩ বছর টানা চেষ্টা করেও দূর্নীতি আর অনাচারের গথাম সিটির ভিত্তিকে তেমন নাড়ানো গেলো না।

২৩ বছর পরঃ

সেই অশিক্ষিত বকলম ছেলেটাকেই একজন শিক্ষক নির্বাচিত করলেন নিজেই শিক্ষা দেবেন বলে। আজিব না? একটা অক্ষরও শেখালেন না তিনি। বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ বা এরাবিক পড়ালেন না। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অর্থনীতিও শিখালেন না। এমন একটা কোর্স নিলেন যা জীবনের উদ্দেশ্যকে ঠিক করে দেয়, আর বাদবাকি সব জ্ঞানকে দেয় উদ্দেশ্য এবং পূর্ণতা। নিরক্ষর মানুষটাই মানুষকে শিক্ষা দেয়া শুরু করলেন। আবারও ২৩ বছর টানা চেষ্টা করলেন। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেলো তাঁর।

২৩ বছর পরঃ

তাঁর সেই বেড়ে ওঠার অনাচার, অত্যাচার আর দূর্নীতির গথাম সিটি পুরোপুরি বদলে গেলো। সেই জ্ঞান যতদূর গেলো সব বদলে গেলো সুন্দরে। কত জ্ঞানের সমারোহ, কত সভ্যতা ছিলো দুনিয়াতে। সবাই আমূল বদলে গেলো বিশুদ্ধতম জ্ঞানের স্পর্শ পেয়ে। জয় হলো জ্ঞানের। জয় হলো শিক্ষার। বিশুদ্ধতম জ্ঞান হতে আগত শিক্ষার। সত্যিকারের শিক্ষার।

কোর্সটা আজও চালু আছে। এবং যিনি কোর্সটা চালু করেছিলেন তিনিই এখনও মূল শিক্ষক। বিলিওনিয়ার থেকে শুরু করে রাস্তার হতদরিদ্র ভিক্ষুকটা পর্যন্ত সবার জন্যে এই জ্ঞানের কোর্সটা উম্মুক্ত। সার্টিফিকেটের বালাই নেই। বিশুদ্ধতম জ্ঞান এমনই। এটা অর্জনের পথে টাকার অভাব কখনোই বাঁধা নয়, বরং মাঝে মাঝে টাকা এবং টাকা বিষয়ক অনর্থক জ্ঞানই বরং এই জ্ঞান অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা আছে।

পুরো কোর্সটাই একটা মাত্র বইয়ের উপরে বেইজ করে দাঁড়া করানো। বইয়ের লেখক নিজেকে আল্লাহ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এবং বইটার নাম আল-কুরআন। কুরআন শেখানোর ব্যাপারে তিনি আজও কুরআনে বলছেন,

"It is the Lord of Mercy who taught the Qur'an."

[আর রাহ্মান, ১-২]

উনি নিজেই এই বই সম্পর্কেই বলছেন এবং আহবান জানাচ্ছেন,

"We have made it easy to learn lessons from the Qur'aan: will anyone take heed?"

[সুরা ক্বামার, ১৭]

এর মানে হলো, কেউ যদি এই কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে সে আসলে আল্লাহকেই শিক্ষক হিসেবে পাচ্ছে। কতই না অসাধারণ আর বিরল সম্মান! কে বুঝবে এটা? এটা যে আসলেই বুঝেছে সেই এই বইয়ের স্টুডেন্ট হিসেবে নিজেকে তালিকাভুক্ত করে নিয়েছে নির্দ্বিধায়, পরম আগ্রহে।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটাকে বেছে নেয়া হয়েছিলো এই কুরআন শেখানোর জন্যে। এপ্লাই করে দেখানোর জন্যে। অবাক লাগে খুব! ফিজ্জারের যুদ্ধে হতভম্ব হয়ে, হাহাকার বুকে নিয়ে, হিলফুল ফুজুল গঠন করে যিনি ২৩ বছর তীব্র চেষ্টা করে নিজের এলাকাকেও বদলাতে পারেননি, তিনিই, সেই একই মানুষটাই এই বই পাবার পর ২৩ বছরে তাঁর চারপাশ আলোকিত করে দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সাম্য আর শান্তি। এই বইয়ের আলোতেই সারা পৃথিবীর আঁধার দূর হয়েছিলো, পালিয়ে গিয়েছিলো কোনো এক কোণাতে। সেই মানুষটা ডিগ্রী, সার্টিফিকেট কি জিনিস জানা দূরে থাকুক, অক্ষরই চিনতেন না। অথচ তাঁর হাতেই আল্লাহ তুলে দিয়েছিলেন সবচাইতে বিশুদ্ধতম জ্ঞানকে, যে আল্লাহ নিজেই সকল জ্ঞানের উৎস। যিনি নিজের জ্ঞান থেকে মানুষকে নিজ থেকেই দয়া করে কিছু দিতে চেয়েছেন, জানাতে চেয়েছেন, পথ দেখাতে চেয়েছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটা সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করে কোটি কোটি মানুষের জীবনের আলো হতে পেরেছেন। আজও মানুষ যখনই তাঁর নাম বলে, সাথে সাথে তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁর জন্যে দু'আ ও করে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বই দুনিয়াতে আসার পরে সর্বপ্রথম যারা একে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন হতদরিদ্র। অবাক করা

বিষয় কি জানেন? আজকের এই সময়ে কুরআনকে পাঠানো হলেও ধনী, সমাজের তথাকথিত সম্মানী আর উচ্চ ডিগ্রীধারী নাক উঁচুরা একে সহজে মেনে নিতে পারতেন না। সবার আগে গরীবরাই এগিয়ে আসতেন। ভালোভাবে ভেবে দেখলেই কথাটার অর্থ বুঝতে পারবেন। বলতে পারবেন এর পেছনের কারণটা কি? আমি বলবো না। নিজেই ভেবে বের করুন না! মজা পাবেন খুব!

আজকেও যখন খোঁজ নিই, দেখি কুরআনের শিক্ষা নেয়ার জন্যে এখনও হতদরিদ্র গরীব ছাত্ররাই খেটে যাচ্ছে। কুরআনের ছাত্র এরা। এরা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করছে যা আল্লাহ নিজে দিয়েছেন। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছে কুরআনের সর্বপ্রথম ছাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, যিনি জান্নাতের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র হবে বলে জানিয়ে গেছেন। সেই প্রথম থেকেই কুরআনকে গরীবরাই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা থেকে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করতে করতে জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে এর আদর্শকে তুলে ধরার জন্যে। তবু মুখে হাসি।

আল্লাহর কাছে সবচাইতে সম্মানিত ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানুষের মাঝে কুরআনের প্রথম ছাত্র ছিলেন এই অনন্য মানুষটাই। তিনি যেরকম কষ্ট স্বীকার করে, ক্ষুধা পেটে জিন্দেগী পার করেছিলেন, পাথরের শক্ত আঘাতে মাথা ফেটে গেছে যার, খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আর জীবন বাঁচানোর আদেশ পাওয়ার পর যাকে ঘর বাড়ি, এলাকা ছাড়তে হয়েছে, পৃথিবী জুড়ে আজও কুরআনের ছাত্রদের সেই একই অবস্থা। তারপরেও এরা কেউ কুরআনকে ছাড়া দূরে থাকুক, বরং আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে জীবনে।

কেনো?

কি আছে এই কুরআনে যার জন্যে জীবনের সব সাধ-আহলাদ পায়ে ঠেলে তুচ্ছ করে জেনেশুনে কষ্টের জীবন বেছে নিতেও অদ্ভূত আনন্দ লাগে?

সারা দুনিয়ার মানুষ যখন টাকার পাগল, ডিগ্রীর জন্যে দেশ-বিদেশ উল্টে ফেলাকেই সার্থকতা ভাবে, তখন এরা কেমন ছাত্র যারা একই কুরআন বারবার বারবার পড়ে আর ভাবে, ভাবে আর পড়ে!

এত কিসের মজা লুকিয়ে আছে এই কুরআনে?

কী এমন ছিলো এই কুরআনে যার জন্যে সারা রাস্তা সুবাসিত করে হেঁটে বেড়ানো রমনীদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়া সেই ধনবান তরুণ ছেলেটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর এমন জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যার পরিণতিতে তাঁর

জন্যে আপাদমস্তক ঢাকার মতো কাফনও খুঁজে পাওয়া যায়নি? ঘাসের চাদরে যার কাফন তৈরী করা হয়েছিলো। সেই কাফনে মাথা ঢাকলে যার পা দেখা যাচ্ছিলো, আর পা ঢাকলে মাথা। যা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম কেঁদে ফেলেছিলেন। কী হয়েছিলো সেই তরুণের এই কুরআনের স্পর্শে এসে যে আরামের জীবন, ধন সম্পদের জীবন দুই পায়ে ঠেলে রাস্তায় নেমে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেননি? ধন সম্পদ, আরাম বিলাস, লোকের সম্মানের উপরেও এমন কোনো নিশ্চিত সাফল্যকে তিনি চিনে ফেলেছিলেন?

কী আছে এই কুরআনে? এত কি লুকানো আছে এই কুরআনে যেটার মজা যারা সত্যি সত্যি কুরআন অধ্যয়নকে জীবনে সিরিয়াসলি নেয়নি তারা কোনোওদিনও বুঝে না?

এর উত্তরটা কুরআনের সত্যিকারের ছাত্ররা ছাড়া আর কেউই জানবে না! বুঝবেও না। কোনোদিন না।

জীবন্ত মিরাকল একেই বলে!

ভালোবাসা আর হিদায়াত

আমরা ভালোবাসি আর ভালোবাসাটাই স্বাভাবিক, ঘৃণা নয়। চারপাশের মানুষগুলোর প্রতি তীব্র ভালোবাসা বুকের গহীনে তৈরী করে ফেলে অদ্ভুত সুন্দর এক দায়িত্ববোধ। আর সেখান থেকেইতো ভালোবাসার মানুষগুলোর জন্যে ভালো চাওয়া, ভালো কিছু করার অনুপ্রেরণা আমাদেরকে ঘিরে রাখে।

যাকে ভালোবাসি, তাকে "নিশ্চিত ক্ষতি থেকে জীবন দিয়ে হলেও বাঁচাতে হবে", এই অনুভূতির সাথে যিনি পরিচিত নন তিনি বোধ করি এত বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের ভীড়ে কাউকে ভালবাসতে পারার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাননি। আর যাদেরকে আমরা ভালোবাসি তাদের সাথে আড্ডা দিতে ভালো লাগে, ঘুরতে ভালো লাগে, কথা বলতে ভালো লাগে। ভালো লাগে পাশে পাশে থাকতে, বেশি বেশি সময় কাটাতে। হাহা হোহো করতে।

এই পুরো ব্যাপারটার সাথে যখন 'সত্যের' সমন্বয় ঘটে যায় তখন আমরা চাই ভালোবাসার মানুষগুলোকে নিয়ে স্রষ্টার দেয়া অতুলনীয় বাগানে (জান্নাতে), একসাথে অনন্তকাল সময় কাটাতে। তাইতো যাদের ভালোবাসি, তাদের মুঠোফোনে আমরা বার্তা পাঠিয়ে বসি এরকম যে, "বড় ভাইয়া, আমি আপনার সাথে আজীবন জান্নাতে থাকতে চাই, একসাথে ক্রিকেট খেলতে চাই।" এবং সেই জান্নাতে একত্রে থাকার জন্যে আমরা সবসময় আশেপাশের মুসলিমদের এবং এখনো যারা মুসলিম হননি ইসলামকে চেনেন না বলে, তাদেরকে অবিরাম সত্যটা জানাতে চাই। চেষ্টা করি। ভালো কাজে উৎসাহ দিই আর অসৎ কাজে নিরুৎসাহিত করে একদম ভচকায়ে দিই।

এটা আমরা এরকম ভেবে করি না যে, "আমি পারফেক্ট হয়ে গেছি, বা আমি ওর চেয়ে উন্নত"। বরং এটা এই অনুভূতি থেকেই করি যে, "তাঁকে বললে সে হয়তো উন্নত হয়ে যাবে, সাথে সাথে ভালো কথা বলতে বলতে আমার নিজের উপরেও ধিক্কার আসবে, আমি নিজেও প্রাণেপণে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করবো।"

কিন্তু ভালোবাসার মানুষগুলো কি সবসময় তা বোঝে? বোঝে না। তৈরী হয় অমূলক ধারণা, ফলাফল ভুল বুঝাবুঝি। মন খারাপ হয়। "পারলাম না বোঝাতে, আমি ব্যর্থ!" এইসব ভাবনা চেপে ধরে। তীব্র হতাশা নেমে আসে প্রিয় মানুষটাকে সত্য বোঝাতে না পেরে।

আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে অসাধারণ ব্যবহার আর চরিত্রের মানুষ। ছিলেন সবচাইতে সহনশীল আর অসাধারণ শিক্ষক। তাঁকে তাঁর চাচা আবু তালিব যেমন তীব্র ভালোবেসে আগলে আগলে রাখতেন, তিনিও নিজের চাচাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। সেই চাচা যখন ইসলামের ছায়ায় না আসতে পেরেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন আমাদের রাসুলের (স) বুকে কী ভয়ংকর কষ্ট বাসা বেঁধেছিলো তা কী আমরা কোনোদিন অনুভব করতে পারবো? আমাদের প্রিয় মানুষগুলোও যখন সত্যটা বোঝেন না, তখন আমাদেরও কষ্ট হয়। খুব কষ্ট। খুব। নিজেদেরকে ব্যর্থ মনে হয়। হতাশ হয়ে যাই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই আল্লাহ নিজেই আমাদের নাবীকে (স) বলেছিলেনঃ

"হে নবী!

আপনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করতে পারেন না।

কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন,

এবং যারা হিদায়াত গ্রহন করে তাদেরকে তিনি খুব ভাল করেই জানেন।"

[সূরা কাসাস, আয়াত ৫৬]

কাজেই, কাউকে আমরা সত্যের মেসেজটা দিতে পারবো ভালোবাসার সাথে, আন্তরিকতার সাথে, কিন্তু সত্যের পথে হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারবো না। সেটা একমাত্র এবং কেবলমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে। আর এটাতো জানা কথাই যে, যে ব্যক্তি হিদায়াত চায়, সত্য পথে সত্যিই আপোষহীনভাবে হাঁটতে চায়, আল্লাহই তাঁকে পথ দেখান, দেখিয়েছেন, দেখাবেন। আয়াতের শেষাংশে তিনি সেটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আবার অন্যদের পথ দেখাতে সচেষ্ট থাকতে থাকতে আমাদের মাঝেও সুপিরিয়রিটির বাসা বুনে যায় চিরশত্রু। দানা বাঁধে অহংকার। নিজের ভুল চোখে পড়ে না আর। নিজের অসম্পূর্ণতা ভুল মেরে বসি, গাফিলতিতে ডুবে যাই। ভুলে যাই যে আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে আমারই কৃতকর্মের হিসেবের খাতা হাতে, অন্যেরটা নয়।

সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটাও অসীম দয়ালু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশ্বাসীদের তাই স্পষ্ট করে বলে মনে করিয়ে দিচ্ছেনঃ

"হে বিশ্বাসীগন ! নিজেদের কথা চিন্তা করো। অন্য কারোর গোমরাহীতে

তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।"

[সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৫]

অর্থাৎ অন্যকে সত্যের বার্তা দিতে গিয়ে নিজের হিসেব নিজে কড়ায় গন্ডায় নিতে ভুল করা যাবে না। নিজেকে উন্নত করতে থাকাটাই, আল্লাহর প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে থাকাটাই হবে মূল মিশন। আমার নিজের করণীয়গুলো ভুলে গেলে চলবে না। কোনোভাবেই না।

মন খারাপ হয়ে গেলো?

তাই বলে কি আমরা আর ভালো কথা বলবো না?

সৎ কাজ আর ধৈর্যের উপদেশের পাশাপাশি অসৎ আর অন্যায় কাজের নিষেধ করবো না?

নিজে পরিপূর্ণভাবে পারফেক্ট নই। কখনোই সম্পূর্ণ পারফেক্ট কেউই হতে পারবে না। কোনোদিনও না। তবে কি সত্যের পথে অবিরাম ডাকতে থাকা, অন্যদেরকে সত্যটা জানানো বন্ধ করে দেবো?

আমি নিজেই তো অপরাধী, অধম। উত্তম হবো কি করে তাহলে? ভালো কথা, সত্যের কথা কি তবে কেউই বলবে না? সবারই তো সত্যটা বলা উচিৎ। এখন কি হবে?

সমাধানের জন্যে আমরা কুরআনের কাছেই যাবো। আল্লাহই তো বেস্ট সলিউশান দেন সবসময়। সেই প্রিয় করুণাময় আর অসম্ভব ক্ষমাশীল রাব্ব কুরআনে কাদের কথাকে সবচাইতে উত্তম বলছেন চলুন দেখিঃ

"সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎকাজ করলো, এবং ঘোষণা করলো: 'আমি মুসলমান'। ভালো কাজ আর খারাপ কাজ সমান হতে পারে না। আপনি খারাপ কাজকে প্রতিহত করুন যা সবচেয়ে ভালো (আচরণ) তা দ্বারা; তাহলে দেখবে যার সাথে আপনার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।"

[সূরা হা মীম সাজদা (ফুসসিলাত), আয়াত ৩৩-৩৪]

কাজেই, ভালো কথা, সত্য কথা বলতেই হবে।

ডাকতে হবে আল্লাহর দিকে। ভালো কাজ করতে থাকতেই হবে। থামা যাবে না। নিজেকে "মুসলমান" ঘোষণা করতে, মুসলমানের মতো চলতে যেন লজ্জা না পাই, সংকোচ না করি। খারাপ কিছু আসলে আমরা বিনিময়ে ভালো আচরণটাই দেবো, খারাপ ব্যবহার না। ইন শা আল্লাহ আমাদের ভালোবাসায় আর আচরণে সবচাইতে ভয়ংকর শত্রুও আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে যাবে জানের জিগরী দোস্ত।

আল্লাহ আমাদেরকে ভালো কাজ করার আর সবসময় সবচাইতে ভালো কথা বলার তৌফিক দিন সবাইকে।

আ-মীন।

নক্ষত্রকথন

হঠাৎ খেয়াল করলাম, আমাদের সবার মাঝে একটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার আছে।

আমার জীবনে আমি এখন পর্যন্ত কোনো সত্যিকারের খারাপ মানুষের দেখা পাইনি। আসলেই পাইনি। সত্যি বলছি।

ভেবে দেখলাম এর পেছনের কারণটা আসলে খুবই সুন্দর।

দিলের গভীরে আমরা সবাই-ই আসলে ঠিক ঠিক জানি যে একজন পরম অসীম অনন্ত করুণাময় আমার স্রষ্টা, যিনি আমাকে তীব্র ভালোবাসেন। তাঁর গভীর ভালোবাসা আর উপহারে আমরা ডুবে আছি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কীভাবে তাঁর ভালোবাসা ফিরিয়ে দিবো। বুঝতে পারি, এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তবুও ইচ্ছে করে উল্টো ভালোবাসতে। গভীরভাবে ভালোবাসতে। তিনিতো মালিক হয়ে দাসকে কিছু না দিলেও পারতেন। অকৃতজ্ঞ দাসকে সাথে সাথেই শায়েস্তা করে ফেলতে পারতেন।

কিন্তু না।

তিনি করেন না।

তিনি শুধু সময় দেন, আর সময় দেন। বারবার শুধু সুযোগ দেন। যেনো বিচারের দিনের আগেই, নিজে ন্যায় বিচারকের কঠিন আসনে বসার আগেই তাঁর এত এত ভালোবাসার বান্দাগুলো ফিরে আসে। তাঁকে চিনতে পারে। তাঁকে ভালোবেসে না হোক, তাঁর নিখুঁত আর আপোষহীন ন্যায় বিচারের কথা মনে করে হলেও যেনো তারা আর অপরাধ না করে। অপরাধ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে যেনো তাঁর কাছে মাফ চায়। তিনি তাই কতোবার, কত্তোবা-র যে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ক্ষমাশীল। পরম ক্ষমাশীল। মানুষ যেনো ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসে। তিনিতো ক্ষমা করেই দিবেন।

তবুও আমরা ক্ষমা চাইতে পারি না। কতো মানুষ যে পরে ক্ষমা চাইবে বলে, বয়স হলে ফিরবে বলে অপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তি আর শাইত্বানের ফাঁদে ধরা খেয়েছে। বয়স আর হয়নি। সময় আর হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ করেই বিদায় ঘন্টা বেজে যায় কিছু বুঝে উঠার আগেই। কবরস্থানের মানুষগুলোর ক'জন শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে, ক্ষমা চেয়ে, ভালো হয়ে ফিরতে পেরেছে? বেশিরভাগই কেবল

ধোঁকা খেয়ে যায়।

আফসোস!

আমরা তবুও চিন্তা করি না। ফিরে যাই না এক্ষুণি। অথচ আমরা সবাই-ই ভালো হয়ে যেতে চাই। তাঁর পথেই থাকতে চাই। তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে কেঁদে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়ে আবার নতুন করে বাঁচতে চাই। তাঁরই ইচ্ছে অনিচ্ছের কাছে নিজের মাথাটা পেতে দেয়াতেই যে সুখ, সেটা এই অবাধ্য আমাদের সবারই বুকের গহীনে এতদিনে জানা হয়ে গেছে। আর কিছুতেই যে শান্তি মিলে না। স্বস্তি আসে না অন্তরে। কিছুতেই না। শান্তি কেবল নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তাঁর সামনে সিজদাতে হু হু করে কান্না করাতে। আর একটা সিজদাও মিস না করাতে। অবাধ্য না হওয়াতে। ভালো কাজে, সুন্দর কাজে, মানুষের জন্যে কিছু করাতে। সত্যি সত্যি কিছু করাতে।

আমরা সবাই-ই ফিরতে চাই। কেনো ফিরছি না?

আমরা সবাই-ই ক্ষমা চাই। তাহলে কেনো ক্ষমা চাইছি না? ক্ষমা চাইলেই তো ক্ষমা করে দিবেন তিনি।

আমরা সবাই-ই সুন্দর করে, হাসিমুখে সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চাই। কেনো আমরা তবে সেইভাবেই বাঁচছি না? কাছের মানুষ, দূরের মানুষের জন্যে কিছু একটা করছি না?

কিসে আমাদের ভিতরের আলোটাকে গলা চেপে ধরেছে? কার এত বড় সাহস আমাদের ফিরতে দিতে চায় না? কিসের এত ভয় আমাদের বুকের মাঝে?

মাসজিদের সালাতে মানুষ বাড়ছেই। শীতার্ত আর দুঃখী মানুষদের হাহাকারে মানুষ কিন্তু দলে দলে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে পথে নামছে। আমরা কেনো মাসজিদে যাচ্ছি না? আমরা কেনো দুঃস্থ মানুষের জন্যে পথে নামছি না? আমরা কেনো আর সবার মতো একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ার চেষ্টা করছি না?

শুনুন! হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। বুকের ভেতরে আলোর অস্তিত্বটা যদি আজও টের পান, যদি ঠিক জানেন যে সেটা এখনও নিভে যায়নি, তবে সেটাকে জ্বলে উঠতে দিন দাউ দাউ করে। চারপাশটা একবার আলোকিত করে দিয়ে বাঁচার মতো বাঁচতে শিখুন। জানেনইতো, একটা নক্ষত্র নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সবাইকে আলো দেয়। ভুলে গেছেন, আপনাকে যে শরীরটা উপহার দেয়া হয়েছে ব্যবহার করবার জন্যে, তার অণু-পরমাণুগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে কোনো এক

জ্বলজ্বলে গনগনে নক্ষত্রেরই অংশ ছিলো? ভুলে গিয়ে থাকলে আজ মনে করিয়ে দিলাম আবারও।

মনে রাখবেন, আগামীকাল থেকে কখনোই জ্বলে ওঠা হয় না। জ্বলতে হয় আজ থেকে। এখন থেকেই। এটাও মনে রাখবেন, সবাইকে আলো দিতে গিয়ে নক্ষত্রের মতো তিলে তিলে নিঃশেষ হওয়ার মাঝেই আছে স্বস্তি আর বিজয়।

আর বিজয়ের জন্যে নিজেকে চেনার সাথে সাথেই ফিরতে হয়। জেগে উঠতে হয়। জ্বলে উঠতে হয়। তারপর শুধু চারপাশের মশালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে হয় একের পর এক। আলো ছড়িয়ে যায় মশাল থেকে মশালে। চেয়ে দেখুন না, সবার মশাল একে একে জ্বলে উঠছে। আপনারটা কি জ্বালবেন না?

আলোর এলোমেলো মিছিলে চলুন না এক হই নিজ নিজ জায়গা থেকে। কল্যাণ আর রাহমাত হয়ে যাই নিজের জন্যে, চারপাশের মানুষগুলোর জন্যে। আসুন, একসাথে জ্বলে উঠি। আলো হই।

প্রাণপ্রিয় পরম করুণাময়কে অনেক, অন্নেক খুশি করে দিই।

মুসিবাত

গোল্লা একটা বোর্ডের সেন্টারে যে কালো বৃত্তকে টার্গেট করে তীরন্দাজ সাঁইইইই করে হেব্বি স্পীডে তীর ছুঁড়ে দেয়, সেই ছোট্ট কালো বৃত্তটাকে এরাবিকে বলে "আসাবাহ"। আর যে তীরটা ঠিক ঠিক "আসাবাহ"কে ভেদ করে গেঁথে যায়, সেই তীরটাকে আরবীতে বলা হয় "মুসিবাহ"।

আমাদের উপরে কোনো বিপদ আসলে আমরা বলি, "হায়রে, কি মুসিবাত যে নেমে আসলো আমার উপর!" এই মুসিবাতই হলো এরাবিক "মুসিবাহ" বা তীর, যা একদম ঠিক টার্গেটের (অর্থাৎ আমার) উপর পারফেক্টলি নেমে এসেছে। এই মুসিবাত আসলে আল্লাহ দ্বারা নির্ধারিত করে দেয়া ভাগ্য, যা ঠিক সময়ে ঠিক আমার উপরে একদম পারফেক্টলি নেমে আসবেই আসবে।

আমরা যারা মু'মিন, তারা পৃথিবীর আর কিছুতে বিশ্বাস করি আর না করি, আল্লাহর উপরে আমাদের আস্থা হান্ড্রেড পার্সেন্ট। যত বড় বিপদই তাই আমাদের উপরে নেমে আসুক না কেনো এটা আমাদের প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে আমরা ধৈর্য্য ধারণ করি। আমরা জানি, এই বিপদ একদম সময়মতোই কেটে যাবে। কারণ আমরা ক্লিয়ারলি জানি যে এটা একটা পরীক্ষা। এখানে জাস্ট এটাই পরীক্ষা যে, বিপদকালীন সময়ে আমি আল্লাহর ডিসিশানের উপরে আস্থা রাখতে পারছি কি না! সবটুকু কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করেও আল্লাহর ডিসিশানের উপরে খুশি থাকছি কি না!

আমি খুশি না হলেও, আস্থা না রাখলেও বিপদ যতক্ষণ থাকার ততক্ষণই থাকবে। আমার অখুশি বা অনাস্থায় আনন্দের বন্যা কিন্তু নেমে আসবে না।

কিন্তু, আমি যদি আমার প্রজ্ঞাময় প্রতিপালক, পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই পরীক্ষায় শুরু থেকেই ধৈর্য্য ধারণ করি, যত বড় কষ্ট আর তীব্র যন্ত্রণাই হোক না কেন, কোনোরকম অভিযোগ না করি, এবং আল্লাহর অসাধারণ গভীর প্রজ্ঞা আর সিদ্ধান্তের উপর আস্থা দেখিয়ে শান্ত থাকতে পারি, আল্লাহর কাছে সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে পারি, তাহলে এর ফলাফলটা হবে সুতীব্র সুন্দর আর আনন্দময়।

কেমন ফলাফল?

দেখি আল্লাহ ধৈর্য্যের ফলাফল হিসেবে কুরআনের সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আমাদেরকে কি বলছেন?

"হে বিশ্বাসীরা, ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।"

আল্লাহ সাহায্য চাইতে বলেছেন ধৈর্য্য আর সলাতের মাধ্যমে। আর এটাও বলে দিয়েছেন পরিস্কারভাবে যে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্য্য ধারণকারীর সাথেই থাকেন। কী অসাধারণ! আমরা তো সবসময় এটাই চাই আল্লাহ যেন আমার সাথে থাকেন, পাশে থাকেন, তাই না? আল্লাহ তো সেই উপায়টাই বলে দিলেন পরিস্কারভাবে! বিপদে, কষ্টে যদি ধৈর্য্য ধারণ করি তাহলেই আল্লাহকে আমার পাশে পেয়ে যাবো।

আল্লাহকে পাশে পেয়ে গেলে এই জীবনে আর কি লাগে?

সূরা জুমারের ১০ নং আয়াতের শেষে আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের পুরস্কারের কথা বলেছেন। কেমন পুরস্কার? আল্লাহ বলছেনঃ

"আমি ধৈর্য্যশীলদেরকে বেহিসাব পুরস্কার দিয়ে থাকি।"

হিসাব ছাড়া পুরস্কার দেয়া হবে ধৈর্য্যশীলদের! বেহিসাব পুরস্কার!!

তাও আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে! কী অপূর্ব!

উনি কষ্ট আর যন্ত্রণা দিয়ে শেষ করে ফেললেও আমার কিছুই বলার ছিলো না, করার ছিলো না। আমিতো তাঁরই সম্পদ, তাঁরই দাস মাত্র। কিন্তু আমার কিছু সময় ধৈর্য্যের প্রতিদানে তিনি উপহার দিবেন আমাকে! তাও আবার হিসাবহীন বেশুমার উপহার!!

আসলেই আমার প্রতিপালক অন্যরকম এক অসাধারণ স্তরের দয়ালু আর করুণাময়।

নি'আমাত

প্রথম যখন সুরা তাকাসুরের তাফসীর শুনেছিলাম ভয়ে বুকটা বসে গিয়েছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সুরার শেষ আয়াতে খুবই খুবই জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে দেয়া প্রত্যেকটা নি'আমাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

ও আল্লাহ! আমি কই যাবো এখন?

নিঃশ্বাস নিতে পারা থেকে শুরু করে হৃদস্পন্দন, সুস্থ মস্তিস্কে ভাবতে পারা থেকে শুরু করে প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা, বেসিনের কল ছাড়লেই ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকা, নিয়মিত খাবার কিংবা ঘুমানোর জন্যে বিছানা, একটা নি'আমাতের হিসেবও তো দিতে পারবো না। একটারও না।

এরপরে একদিন জানতে পারলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুলুল্লাহ(স) অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল আর উদু (ওজু) করতেন। সামান্য পানি দিয়ে করতেন বুঝলাম, কিন্তু তাই বলে এত সামান্য? কিভাবে সম্ভব? নিশ্চয়ই পানি অত্যন্ত অসাধারণ এক নি'আমাত, যেটার মূল্য আমরা এত এত বেশি পেয়েছি বলে বুঝতে পারি না, কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই পৃথিবীতে এমন মানুষও আছেন যাদেরকে এক জগ পানি আনতে কয়েক মাইল পথ হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিতে হয়! বিশুদ্ধ পানির অভাবে প্রতিদিন হাজার হাজার শিশু ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাচ্ছে! হ্যাঁ, হাজার! শিশু!! ভাবা যায়?

এই অনন্যসাধারণ নি'আমাতের হিসেব তো আমি দিতেই পারবো না, তার উপরে প্রতিদিন এত এত পরিমাণে পানি অপচয় করি যে আমাকে অপচয়কারী হিসেবে পেয়ে খুশিতে শাইত্বান বোধহয় আমাকে "ভাই আমার, কলিজার টুকরা আমার" বলে জোরসে জড়ায়ে ধরে "ধিংকা চিকা, ধিংকা চিকা" করে নাচতে থাকে!

কী করবো আমি? কিভাবে সবচেয়ে অল্প পানি দিয়েই প্রতিদিনের প্রয়োজন সারতে পারি আমি? মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া এই অসাধারণ নি'আমাত যেন আমার কারণে একফোঁটাও নষ্ট না হয়ে যায়, সেইজন্যে কি করতে পারি এখন?

আমার লালন-পালনকারী প্রতিপালক কতোই না মহান! কতোই না অসাধারণ, নিখুঁত আর সুন্দর তাঁর পরিকল্পনা!! তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন। আড়াই

মিনিটের পুঁচকে, কিন্তু একটা অসাধারণ ভিডিও পেয়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র আধা গ্লাস পানি দিয়েই পরিপূর্ণভাবে উদু করে পবিত্রতা আদায় করা সম্ভব। ভিডিওটা দেখেই উদু করতে গেলাম। আধা গ্লাস পানি দিয়েই উদু সারলাম।

কী অদ্ভুত ব্যাপার! আসলেই যে সম্ভব!

আল্লাহর দেয়া নি'আমাতের অপচয়ও হয় না, আবার খুব সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জনও হয়ে যায়। অপচয় না করায় খুব ফ্রেশও লাগছিলো আমার। আইডিয়া পেয়ে গেলাম, বর্তমানে যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করে আমরা উদু করি, ঠিক সেই পরিমাণ পানি দিয়ে কিভাবে আমার রাসুল (স) গোসল আদায় করতেন, আর তার চেয়েও অনেক অনেক কম পানি দিয়ে কিভাবে উদু সম্পন্ন করতেন!

মুসলিমদের সব কাজই অসাধারণ। সামান্য উদু, গোসল থেকে শুরু করে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটা কাজই সে এমনভাবে করার চেষ্টা করে যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, উল্টো মানুষের উপকার হয়। মুসলিমরা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতাকে ভয় করে, ভয় করে অন্যের সামান্য হক্ব নষ্ট করাকেও। যেখানেই যাক, যখনই যাক, মুসলিমরা মানুষের জন্যে কেবলই কল্যাণ হয়ে যায়, রাহমাত হয়ে যায়। আনন্দ আর আলো হয়ে যায়!

ইসলাম এতই সুন্দর যে তার আলোতে মুসলিমরা প্রতিটা ক্ষণ শুধুই আলোকিত হতে থাকে। নিজেকে রাঙিয়ে নিতে ভালোবাসে সবচাইতে সুন্দরতম রঙে। প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনিন্দ্যসুন্দর রঙে।

সময়ের সাথে সাথে তাঁর চারপাশ তাই কেবলই পবিত্র আলোয় আলোকিত আর অদ্ভুত সুন্দর রঙিন হতে থাকে। আর সে রঙিন আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। সবখানে। সবখানে।

কিছু কষ্ট-কথা

এই লেখাটা তীব্র কষ্টের। সত্যি বলছি। এটা শুধুই নিজের জন্যে লেখা। নিজেকে কিছুটা বের করে দিয়ে একটু দম নেবার জন্যে স্বার্থপর একটা লেখা। পড়লে হয়তোবা দুমড়ে-মুচড়ে যেতে হবে, ভেঙ্গে যেতে হবে, গলা দিয়ে আর খাওয়া নামবে না, হাঁটতে কিংবা সালাত পড়তে গেলেই দুই চোখ মরিচ গোলা লোনা জলে ভরে উঠবে। পৃথিবীকে মনে হবে ভয়াবহ দুঃসহ কুৎসিত আর নোংরা-কদর্য পচা-গলা একটা জায়গা। মরে যেতে হবে যতোবার মনে পড়বে ঠিক ততোবার। কারণ, এই লেখাটার প্রতিটা ঘটনাই সত্য। নিজের চারপাশের মানুষের জীবন থেকে নেয়া। তাই আবারও নিষেধ করছি। তারপরেও যদি কথা না শুনে পড়তেই থাকেন, তাহলে আমন্ত্রণ জানাই এক বিষাদের জগতে।

১। ছেলেটার বয়স তিন-চার হবে। কিউট একটা বাবু। পাশের বাসায় খেলতে যায়। বারান্দায় হাঁটে। পিচ্চিটার বড় ভাই একদিন খেয়াল করলেন প্রতিবেশি তরুণ আদর করে কথা বলতে বলতে বাচ্চাটাকে বিশ্রীভাবে স্পর্শ করছেন। বাচ্চাটা বারবার কুঁকড়ে যাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু সে থামছে না। ভাইটা প্রচন্ড ধমক দিলেন। শিশুরা কোথাও নিরাপদ না। কোথাও না। ছেলে শিশুরাও না।

২। মেয়েটার পাঁচ বছর বয়েসী মাথায় টুকটুকে একটা ঝুঁটি। আম্মু বেঁধে দিয়েছেন বোধহয়। কন্সট্রাকশানের কাজ দেখছে একমনে। মিস্ত্রীটা ডাকলো, "চকোলেট নিবা?" চকোলেট হচ্ছে মেয়েটার পৃথিবী। নেবে না মানে? ইতস্তত করলেও ছুটে না গিয়ে পারলো না। কিন্তু মিস্ত্রীটা এমন করছে কেনো? তার জামা কেনো খুলে ফেলছে? হাত দিচ্ছে কেনো এভাবে? "ছিঃ ছাড়েন আমাকে। আম্মুউউউউউ!" বলে চিৎকার দিলো সে। সবাই ছুটে এলে মিস্ত্রীটা পালালো। মেয়েটা বুঝেনি সেদিন কি হয়েছে। কিন্তু তবুও কাঁদতো সে। একটু বড় হয়ে যখন বুঝলো, তখন সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আরেকটু বড় হয়ে দেখলো পুরুষরা তার দিকে কীভাবে কিভাবে যেনো তাকায়! খুব বিশ্রীভাবে। ঘিনঘিন লাগে তার। পুরুষদের আগে ভয় পেতো, আর এখন তীব্র ঘেন্না করে সে। আম্মুকে বলেছে সে কোনোদিনও বিয়ে করবে না। কোনোদিন না। অসহায় মা চুপ করে থাকেন। তিনি যে সব জানেন, সব বুঝেন। চোখ দু'টো একসাথে ভিজে আসে মা-মেয়ের।

৩। চাকরীজীবি আম্মুটা ঘরে ফিরলেন। তার প্রতিবন্ধী ছেলেটা এবার চারে পা দিলো। ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে না

ছেলেটা। কী কষ্ট! কী কষ্ট! পুঁচকিটাকে সারপ্রাইজ দিতে আস্তে আস্তে করে রুমে গেলেন। দেখলেন তার আদরের বাচ্চাটা উপুড় হয়ে শোয়া। কাপড় নেই। ঘরের কাজের ছেলেটা নগ্ন হয়ে তার উপরে...

আর্ত চিৎকার দিলেন আম্মুটা। কাজের ছেলেটা এক দৌঁড়ে পালিয়ে গেলো। আম্মুটা নির্বাক নিথর হয়ে বসে রইলেন। তার স্বপ্নের পুরো পৃথিবীটা যে আজ ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো তা কী কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে?

৪। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে জেগে উঠলো মেয়েটা। হাউমাউ করে আসা কান্নাটাকে মুখে-চোখে বালিশ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। হাই স্কুলে উঠার পর প্রথম বুঝতে পেরেছিলো ছোটবেলায় বাসার টীচারটা তাকে নিয়ে কেনো এমন করতো! সে আর কোনোদিন বিয়ে করতে চায়নি। তবুও তার ভালোর জন্যে তার মতের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিয়ে তাকে আরো ভেঙ্গে দিয়েছে এই সমাজ। সেই বিয়েতেও...

এই সমাজটাকে আজ সে ঘেন্না করে মন থেকে। একসময়ের সালাত, রোজা, পর্দা করা মেয়েটা আজ কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। চারপাশের সমাজ আজও তাকে ধর্মের কথা বলে। সে কথাগুলো বুঝতে পারে না। তার হিসেব মেলে না। সে এই সমাজকে চিনে। এই সমাজ অন্যায়কারীর বিচার কোনোদিন করে না কোনোদিন, করতেও চায় না। ভিক্টিমের উপর আরো আরো অত্যাচার করতে থাকে, করতেই থাকে, যতক্ষণ না মৃত আত্মা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষটা সত্যি সত্যি না মরে যায়। আরো একবার আত্মহত্যার প্ল্যান করছে সে। এই জীবনের অসহ্য ভার সে আর নিতে পারছে না।

৫। নিজের স্ত্রী আর সেই স্ত্রীর দুলাভাই মিলে তাকে বেঁধে ফেলেছে ভালভাবে। শক্ত করে। তারপর তার অসহায় গলাতে দড়ি লাগিয়ে ফাঁসিতে যখন ঝুলিয়ে দেয় দুইজনে মিলে, তখন কি রাজ্যের সব ক্ষোভ, অসহায়ত্ব আর ঘেন্না জমা হয়েছিলো ঝটপট করতে করতে মরে যাওয়া অসহায় মানুষটার দুই চোখে? নাকি সেই দু'চোখে কিছুই ছিলো না? হয়তো অবিশ্বাসের ঝাপটায় শুন্যতায় ভরা ছিলো। শুন্য! সব শুন্য!

৬। শিশু মেয়েটা এখনো ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না। একদিন কাঁদতে কাঁদতে বাথরুমে ঢুকে গোসল করতে লাগলো সে। আম্মু এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে মা? কাঁদো কেনো?" মেয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কোনোমতে বুঝাতে পারলো, তার যুবক কাজিন তার ইয়েতে হিসি করে দিয়েছে। সে ওগুলো ধুতে চাইছে। মায়ের চোখে আঁধার নেমে এলো। সেই কাজিনের

বিচার হয়নি। বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। ছোট্ট মেয়েটা বড় হওয়ার পর কতোবার মরে গিয়েছিলো তা আজও জানা যায়নি।

৭। উচ্ছ্বল হাস্যোজ্জ্বল তরুণ ছেলেটা ভয় পায় আজ। খুব ভয়। অজানা এক ভয়। যে ভয় তাকে আমূল কাঁপিয়ে দেয়। সে আর ঘুমাতে পারে না। নিজের ভয়ের দেয়ালে কুঁকড়ে গিয়ে গুঁটিসুটি হয়ে পড়ে থাকে সে। রাতের বেলা ফুঁপিয়ে কান্না করে কাঁদে শুধু। আর কিই বা করবে সে? সে আর কোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারে না। কোথাও বেড়াতে যেতে পারে না। কোথাও না। তীব্র অসামাজিক ছেলেটা এমন অসামাজিক কেনো? কেউ কখনো জিজ্ঞেস করেনি। সবাই শুধু দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়, সামনে এগুতে বলে। সে পারে না। পারবেও না কোনোদিন আর। ঘরে ফিরেই চুপচাপ কোনোমতে দু'টো ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে সে। রুমের লাইটটা নিভিয়ে দেয় যাতে আর কেউ না আসে, কথা না বলে। কোলবালিশটা নিয়ে দুই চোখ আর কান চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে থাকে সে। তার অসহায়ত্ব বুঝার যে আর কেউ নেই। কেউ শুনলেই যে হাসবে, উল্টো তাকেই দোষ দিবে সে এত নরম বলে, লেডিস বা কাপুরুষ বলে। নিজের ছোটবেলার বন্ধুটাকে একদিন সব খুলে বলে সে। স-ব। শুনতে শুনতে ঐ বন্ধুটাও নিস্তব্ধ বোবা হয়ে যায়। আর হাসতে পারে না। কথা বলতে পারে না। শুধু লিখতে পারে। তাই লিখে যায়। কেবলই লিখে যায়। আলোর কথা। স্রোতের বিপরীতে হাঁটার কথা। স্রোতকে বদলে দেয়ার কথা। যারা সবচাইতে বেশি কষ্টে ভোগে তাদেরই বোধহয় সবচেয়ে বেশি হাসতে হয়। যাতে অন্যের কষ্ট একটু হলেও মুছে যায়। যারা আঁধারে ঘিরে যাওয়া এই দুনিয়াকে চিনে ফেলেছে তারাই হয়তোবা সবচাইতে বেশি আলো জ্বালতে চায়। নিজের জীবনে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে বলে তারাই বেশি আশার কথা বলে, আশাকে ধারণ করতে চায়। যাতে তাদের মতো আর একটা প্রাণও আঁধারে না ডুবে যায়। কষ্টে না পুড়ে যায়। আর যেনো একটা আত্মাও এভাবে জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ আর ছাই না হয়ে যায়। আর না। একটাও না।নিজে মরে গিয়ে হলেও অন্তত একটা মানুষের আত্মাকে বাঁচানোর জন্যে এদের এই আকুলতাটা কেউ কোনোদিন বুঝবে না। সম্ভব না। এটা পুরোপুরি জেনে-বুঝেও এই মরা মানুষগুলো নিজের মরা-জঞ্জাল স্বপ্নের চিতার উপরে দাঁড়িয়ে নিজে জ্বলতে জ্বলতে অন্যকে আলো দিতে চায়। বোঝাতে চায়। কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না। তাতে আর কিছু যায়ও আসে না। নিজের জন্যে আগুন জ্বালানো যে হয়েই গেছে।

কী ভয়ংকর সেই আগুন!

কী যে দম বন্ধ করা আর দুঃসহ!

জ্ঞানঃ কী করবো?

দ্বীনি জ্ঞান (ইসলামের জ্ঞান) অর্জন কেনো ফরজ (বাধ্যতামূলক) সেটা এখন কিছুটা বুঝি।

দ্বীনের জ্ঞান না থাকলে আমরা আসলেই জানতে পারি না যে আমরা প্রতিদিন এমন কাজ করছি, এমন কিছু কথা বলে ফেলছি যা ইসলামের মূল মেসেজের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। আবার এইরকম কথায় বা কাজে সমর্থন দেয়ার কারণেও যে ঈমান চলে যেতে পারে, আমি ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যেতে পারি সেটাও আমরা বুঝি না অনেক ক্ষেত্রেই।

এইরকম অবস্থায় তাওবা ছাড়া মারা গেলে আমরা আল্লাহর সামনে কী হিসাবে দাঁড়াবো তা কী বুঝতে পারছি? অথচ জ্ঞান না থাকার কারণে তো আমরা বুঝতেও পারছি না যে এই কাজটা বা এই কথা বলাটা ভুল হয়েছে, আমার এখুনই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করা উচিৎ! ফলে, দিন শেষে দেখা যাবে যে আমরা ভুলগুলো বুঝতে না পারার কারণে তাওবা ছাড়াই ঈমানবিহীন অন্তর নিয়ে মারা গেছি (আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন, বুঝার শক্তি দিন)। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মূল কারণই হচ্ছে ফরজ কাজগুলো (বাধ্যতামূলক) কী কী সেটা না জানা, এবং না মানা। দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা তাই খুবই খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছুর চাইতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ! কারণ, আমি রিকশাওয়ালার ঘরে জন্মানোয় কলেজ, ভার্সিটিতে পড়াশোনা করার সুযোগ নাও পেতে পারতাম দারিদ্রতার কারণে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর বায়োটেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা নাও করতে পারতাম। কোটি কোটি মুসলিম করতে পারছেও না। এই জন্যে আমাদের পাকড়াও করা হবে না ইন শা আল্লাহ। কিন্তু, ইসলামের জ্ঞান, দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতেই হবে, যেভাবেই হোক, যেমন করেই হোক। কারণ, এটা ফরজ। এটা না থাকলে আমাদের ঈমানই হুমকির সম্মুখীন হয়ে যাবে। জীবনের মুল উদ্দেশ্য হতে যেকোনো মুহুর্তেই আমরা বিচ্যুত হয়ে যেতে পারি এই জ্ঞান না থাকলে।

তো, কিভাবে শুরু করতে পারি?

একটা লং টার্ম প্ল্যান করা যায়ঃ

#১-কুর'আন

আগামী রামাদানের আগেই আমরা পবিত্র কুরআনের অনুবাদটা অন্ততপক্ষে একবার হলেও বুঝে বুঝে পড়ে ফেলতে পারি। এইক্ষেত্রে সহজ সাবলীল এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ হিসেবে MAS Abdel Haleem এর ইংরেজী অনুবাদ The Quran আমার সবচাইতে ভালো লাগে। বাংলা অনুবাদগুলো খুব বেশি অসাধারণ মনে হয়নি কখনোই, তবুও তাওহীদ পাবলিকেশান্সের করা তাইসীরুল কুরআনটার প্রাঞ্জলতার কথা এখন খুব মনে পড়ছে। পড়তে পড়তে কোথাও কনফিউশান লাগলে আয়াতটার অবতরণের প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল), আয়াতটা নিয়ে আমাদের রাসুল (স) আর সাহাবীরা কী বলেছেন, কী বুঝেছেন সেটা জেনে নেয়ার জন্যে আমরা পাশে একটা তাফসীর রাখতে পারি। মা'রেফুল কুরআনের ছোট তাফসীরটা আমরা এইক্ষেত্রে দেখতে পারি। কিংবা অন্য যেকোনো তাফসীরও দেখা যায়।

#২-সুন্নাহ

প্রিয় রাসুলের (স) সুন্নাহ জানার জন্যে, অনুসরণ করার জন্যে হাদীসগুলো জানা জরুরী। উনার সুন্নাহ অনুসরণ করার আগে জানতে হবে উনি কেমন ছিলেন, আমাদের জন্যে ২৩টা বছর কী দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই না তিনি গিয়েছেন! এইটুকু যদি না জানি তাহলে আমি কখনোই জানবো না উনি আমার জন্যে কী করেছেন? মুসলিম হিসেবে উনাকে সত্যিই যেভাবে ভালোবাসার কথা, নিজের জীবনের চেয়ে, আব্বু-আম্মুর চেয়ে, দুনিয়ায় থাকা সবকিছুর চেয়েও বেশি, সেই ভালোবাসাটা কী কোনোদিনও অনুভব করতে পারবো না যদি না উনাকে না জানি! উনি কী কী করেছেন আমার জন্যে সেটা জানতে না পারলে, অনুভব না করতে পারলে আমি কখনো বুঝতেই পারবো না যে ইসলাম আসলে কী! যখন সত্যিই জানা হয়ে যাবে, যখন সত্যিই অনুভব করবো, তখন সাহাবীদের মতোই উনার সুন্নাহ খুঁজবো শুধু পাগলের মতো অনুসরণ করার জন্যে। একটা সুন্নাহর কথা জানতে পারলেই সেটাকে আঁকড়ে ধরবো, জীবনেও ছেড়ে দিবো না আর।

উনি কেমন ছিলেন, কী কী করে গেছেন আমার জন্যে সেটা জানতে হলে উনার সীরাত (জীবনী) পড়তে হবে। অনুভব করতে হবে। এইক্ষেত্রে সীরাতে ইবনে হিশাম এবং আর-রাহীকুল মাখতুম দিয়ে শুরু করা যায়।

দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্যে, এবং মানার জন্যে কুরআন এবং সুন্নাহ এই দুটো দিয়ে শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে পাবো যে আমার জীবনটা বারাকাহ আর নিয়ামাতে ভরে যাচ্ছে। অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করবো সারাক্ষণ। সবচেয়ে বড় কথা, এর কোনো বিকল্প আসলেই নেই।

তো, আর সময় নষ্ট না করে শুরু হয়ে যাক আজ হতেই।

একটা কনফেশান

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা, পড়াশুনার সুবাদে আশেপাশে এমন মানুষ ছিলো যারা মুসলিম পরিবারে জন্মায়নি। কিন্তু জীবনে এক্সাম্পল হিসেবে নেয়ার মতো অনেক কাজই শিখেছি সেই মানুষগুলোর কাছ থেকে। অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া, নিজের কথা না ভাবা, কাউকে সাহায্য করার স্কোপ থাকলে নিজের পার্সোনাল কাজ বাদ দিয়ে তার জন্যে জান দিয়ে দেয়া, পাশে দাঁড়ানো, এই অনুপ্রেরণাগুলো আমি সবসময়েই পেয়েছি তাদের কাছ থেকে যারা জন্মসূত্রে মুসলিম না।

আর জন্মসূত্রে মুসলিম হিসেবে যাদেরকে চিনেছি তাদের মাঝে কখনো আমি ইসলামের ব্যবহারিক অপার সৌন্দর্য্যকে খুঁজে পাইনি। সত্যি বলছি। উল্টো তাদেরকে দেখেই প্রথম ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আমার মাঝে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। মনে হতো, ইসলাম যদি সত্যই হবে তবে সেই সত্য মেনে চলা মানুষগুলোর ব্যবহার এত খারাপ কেনো? ইসলামের আদর্শ যদি মহানই হবে তবে সেই মহান আদর্শকে জীবনে ধারণ করা মানুষগুলো এত নীচ আর হীন কেনো?

আমার ভাবনায় ভুল ছিলো। বিরাট ভুল।

আমি জানতাম না যে জাস্ট মুসলিম ঘরে জন্মেছি বলেই স্রষ্টার সামনে আমি সত্যি সত্যি মুসলিম হিসেবে স্বীকৃত হবো না। একজন মানুষ যে ঘরেই জন্মাক না কেনো, তাকে সত্যের রাস্তাটা নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে, সত্যটাকে কষ্ট করেই খুঁজে পেতে হবে। খুঁজে পেলে সেটাকে মেনে নিয়ে জীবনকে সেই আদর্শে সত্যি সত্যি সাজাতে হবে কথায়, কাজে এবং অন্তরে। হ্যাঁ, কাজে, কথায়, অন্তরে। স্রষ্টা পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে তিনি এমনি এমনি পরীক্ষা না করে কারো মুখের কথায় তাকে ছেড়ে দেবেন না। কাউকেই না। কাজেই আমি মুসলিম ঘরে জন্মেছি বলেই আমি না বুঝে শুনেই ইসলামের ধ্বজাধারী হয়ে গেলাম, জান্নাতী হয়ে গেলাম, আর যারা ইসলামকে জানার, বোঝার সুযোগই পায়নি তাদেরকে নানান কুৎসিত নামে ডেকে গালাগালি করলাম, অপমান আর ঘেন্না করে জাতে উঠলাম, ব্যাপারটা মোটেও এত সহজ-সরল নয়।

আমি-আপনি মুসলিম ঘরে নাও জন্মাতে পারতাম। যাদেরকে "তথাকথিত মুসলিম"রা ডান্ডি-পট্টাশ, মালাউন আর কাফির বলে গালি দিয়ে, অপমান করে

কথা বলে সুখ পায়, আমি-আপনি তাদেরই ঘরের একজন সন্তান হতে পারতাম। আমার-আপনার মতো নগন্য তুচ্ছ মানুষকে যিনি সত্যটাকে এত সহজে চিনতে, বুঝতে এবং মানতে সাহায্য করেছেন, যিনি আমাকে-আপনাকে এত ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, পরম যত্নে লালন-পালন করছেন, সেই একই সত্ত্বাই কিন্তু যারা এখনো ইসলামকে চিনে উঠতে পারেনি তাদেরও স্রষ্টা, তাদেরও লালন-পালনকারী। সেটা তারা এখনো না জানতে পারে, না বুঝতে পারে, তাতে সত্যটা বদলে যায় না যে তিনি তাদের জন্যে সত্যিই কেয়ার করেন, তাদেরকেও ভালোবাসেন সৃষ্টি হিসেবে।

"হেহ! তোরাতো জাহান্নামী, দোজখে পুড়বি"-

এই ভাবনাটা, এই কথাটা কতো বড় অমানুষ হলে অবলীলায় বলে ফেলা যায়, স্রষ্টারই সৃষ্টি একজন অপূর্ব সম্ভাবনাময় মানুষকে ঘেন্না করতে হলে কতটা নিচে নামতে হয়, তা আমি দেখেছি। কিভাবে আমরা এত শান্তভাবে ভাবতে পারি, এত অবলীলায় মেনে নিতে পারি যে এই মানুষটা অনন্তকাল আগুনে থাকবে? এটা ভাবলেই তো আমার নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাকে প্রাণেপণে বুঝানোর চেষ্টা করার কথা, বাঁচানোর চেষ্টা করার কথা! তার পরিণতির কথা ভেবে ঢুকরে কেঁদে উঠার কথা। নাওয়া-খাওয়ায় অরুচি ধরে যাওয়ার কথা তার জন্যে দুশ্চিন্তা আর টেনশানে, তাই না? কিন্তু কীভাবে আমরা উল্টো তাকে ঘেন্না করতে পারি? কীভাবে পারি? কেনো আমরা প্রথমে মানুষ হওয়ার আগেই ইসলামকে বুঝে ফেলার ভান করি? মুসলিম হবার অভিনয় করি? ইসলামের ক্ষতির কারণ হই? এই ভান, এই নিকৃষ্ট অভিনয় পরবর্তী জীবনে আমার কোনো কাজেই আসবে না, যদি না আমি নিজেকে শোধরাই। যদি না আগে একজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ হই, ইসলামের আলোতে কথা, কাজ আর অন্তরকে আলোকিত করি।

সমগ্র মানবজাতির জন্যে সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দিতে যাকে নির্বাচন করা হয়েছিলো তিনি ছিলেন রাহমাত, করুণা আর ভালোবাসার এক অপূর্ব ভান্ডার। মাসজিদে একবার যখন এক বেদুঈন এসে প্রস্রাব করে দিয়েছিলো, তিনি তাকে বকা দেয়া দূরে থাকুক, কাছে ডেকে সম্মানের সাথে, স্নেহের সাথে বুঝিয়েছিলেন কেনো এই জায়গাতে এই কাজটা করা অনুচিত হয়েছে। মাসজিদে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে থাকতে দিয়েছিলেন যে কিনা মাসজিদে বসেই স্রষ্টার উপাসনা না করে অন্য কারো উপাসনা করেছে। এতই ভালোবাসা ছিলো তাঁর আলোকিত বুকটাতে। এতই মায়া ছিলো মানুষটার মাঝে। সেই মায়া আর ভালোবাসা দিয়েই তিনি মানুষকে রক্ষা করতে চেয়েছেন বারবার। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে অনন্তের শাস্তি হতে বাঁচানো, তাদেরকে বুকে টেনে নিয়ে তিনি যে

ঝিয়েই গেছেন। কেঁদেই গেছেন বুঝাতে না পেরে। স্রষ্টার সামনে সিজদায় থাকে লুটিয়ে দিয়ে সাহায্য চেয়েছেন শুধু যাতে তিনি মানুষকে সত্যটা বুঝাতে রেন, পথ দেখাতে পারেন, বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে বাঁচাতে পারেন। থরে পাথরে রক্তাক্ত হয়েও তিনি তাদের ক্ষমার জন্যে হাত তুলে দু'আ করেছেন দে কেঁদে, কারণ এরাতো বুঝে না। স্রষ্টার ইবাদাত করার সময় তাঁর শরীরের ারে বীভৎস নোংরা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাঁর সন্তানের মৃত্যুতে পাশের ড়ের চাচার উল্লাস তাঁর বুক ভেঙ্গে দিয়েছিলো। তবু তিনি ভালোবেসেছেন। ত্যটা জানাতে চেয়েছেন। সত্য জানাতে গিয়ে জীবনের সুখ-আনন্দ সব রিয়েছেন। জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছে তাঁকে খুন করতে আসায়। তাঁর অনুসারী থীদের নির্মমভাবে খুন করে ফেলা হয়েছে। চিরে ফেলা হয়েছে, রক্তাক্ত করা য়েছে, বেঁধে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে দিনের পর দিন। তবু তিনি তাদেরকে লি দেননি। একবারও না। কোনোওদিন না।

। তের বছর নির্যাতনের পর যখন ওরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তখন স্রষ্টা কে বলেছিলেন নিজেদের বাঁচাতে ডিফেন্ড করার জন্যে। আমাদের উপর কেউ ন্যায় করলে আমরা শুধু মারই খাই না, সেটাকে রুখেও দাঁড়াই, পাল্টা জবাবও ই। শুধু তাই নয়, অন্যের উপরে অন্যায় হলে, হোক সে মুসলিম কিংবা অন্য ানো মানুষ, তার জন্যেও জান-কুরবান করে দিয়ে পাশে দাঁড়ানো আর তাকে জের জীবন দিয়ে রক্ষা করে সত্য আর ন্যায়ের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের লামের শিক্ষা। নিজ দেশ ছাড়াও অন্য কোনো ভূমিতে যখন কোনো স্বেচ্ছাচারী সক নিজের বানানো নিয়মানুযায়ী তার দূর্বল জনগণের উপরে অত্যাচারের খড়গ মিয়ে এনেছে, তখন তাকে রুখে দাঁড়াতে, সেই দেশের মানুষকে অন্যায়ের গপাশ থেকে মুক্ত করতে বারবার খাপমুক্ত হয়েছিলো তরুণদের ঝকঝকে বারী। কত দেশ জয় হয়েছে, আর মুসলিমরা অন্যায় শাসককে যখন সরিয়ে য়েছে তখন ইসলামের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়ে সেই দেশের জনগণ নিজেরাই ল দলে এসে ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমাদের কাজই ছিলো তখন লাম, আমাদের কাজই ইসলামকে তুলে ধরতো, ফাঁপা বুলি আর কথার মালা ।

ফসোস! আমরা ইসলাম শিখতে পারিনি, ইসলামের সেই সৌন্দর্যকে নিজের বনে প্রতিফলিত করতে পারিনি, মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোই বাসতে পারিনি। জেরাই মানুষ হতে পারিনি, অন্যদেরকে অনন্তকালের শাস্তি হতে বাঁচানোর ন্য রাহমাত আর আলো কিভাবে হতে হয় তা বুঝবো কি করে?

হায়! আমার-আপনার ব্যবহার তো এমন হওয়ার কথা ছিলো যে আমাদের ব্যবহার দেখে যারা সত্যকে এখনো চিনতে পারেনি তারা অবাক হয়ে এসে জানতে চাইবে, কিসে আমাদের ব্যবহার আর চরিত্রকে এত সুন্দর করলো? জানতে চাইবে কোনো সে মহান আদর্শ যা আপনাকে এত অসাধারণ করেছে? অথচ হয় ঠিক তার উল্টোটাই। একজন "অশিক্ষিত", "অসচেতন" মুসলিমের ব্যবহারই আজ সাধারণ মানুষকে ইসলামকে ঘেন্না করতে শেখায়, ইসলাম সম্পর্কে একটা মানুষকে নেতিবাচকভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাদেরকে যখন স্রষ্টা জিজ্ঞেস করবেঃ

"আপনার কাছে কি আমার সত্যের মেসেজ, ইসলামের অপূর্ব সুন্দর বাণী কেউ পৌঁছে দেয়নি?"

তারা হয়তো বলবেঃ

"সুন্দর বাণী! ইসলামের!! আমিতো দেখেছি ইসলাম পালনকারী মানুষজন অন্যদেরকে শুধু গালাগালি করে। আমি একটি হিন্দু পরিবারে জন্মেছিলাম। ইসলামকে জানতাম না। তবে স্রষ্টা আর সৃষ্টি নিয়ে আমিও ভাবতাম, জানতে চাইতাম। কিন্তু আমার অমুক মুসলিম বন্ধু, অমুক ইসলামী কলিগ আমাকে আড়ালে ডান্ডি ডাকতো। আমার সাথে কথা বলার সময় যখন আমি হিন্দু বলে আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো, তখন আমি সেটা অনুভব করতাম। ওদের মতোই আমিও তো আপনারই এক সৃষ্টি, তাহলে আমাকে সামনে-আড়ালে ঘৃণা করার অধিকার ওদের কে দিয়েছে? ওদেরকে দেখে আমি এই বাণীই তো পেয়েছি যে ইসলাম মানুষকে ঘেন্না করতে শেখায়, ভালোবাসতে নয়। আমি ওদেরকে দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইসলাম কোনো সত্য বহন করতে পারে না। ওরাই আমাকে ইসলাম-বিদ্বেষী বানিয়েছে, আপনার ইসলাম নয়।"

এরপরে ন্যায় বিচারক স্রষ্টা নিশ্চয়ই সেই ইসলাম সম্পর্কে ভুল জেনে, ভুল বার্তা ছড়ানো ঘেন্নাবাজ মানুষটাকে ছেড়ে দেবেন না। যিনি ন্যায় বিচারক তিনি নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেবেন না যার ব্যবহার দেখে একজন ইসলাম না জানা, না বোঝা মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য্য আর সত্যকে জানা দূরে থাকুক, ইসলামকে, স্রষ্টার সত্যিকারের পথকে সারাজীবনের জন্যে ঘেন্না করতে শিখেছে, ভুল বুঝেছে। দূরে সরে গিয়েছে।

স্রষ্টা নিজেকে ন্যায় বিচারক বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কাউকেই ছাড়বেন না। আমাকে আপনাকে কাউকেই না।

শেষকথাঃ

পরম করুণাময় স্রষ্টা আর তাঁর নির্বাচিত বার্তাবাহক কি বলেছেন, কি বলতে চেয়েছেন তা নিজে পরিপূর্ণভাবে জানার চেষ্টা করি, মানার চেষ্টা করি আগে। আগেতো সবটুকু পরিপূর্ণভাবে জেনে নিয়ে নিজেকে গড়ি, মানুষ হই, সুন্দর হই, নিজেকে বাঁচাই। তারপর অন্যকে।

অন্যকে ঘৃণা করে, ভালো না বেসে তাঁর ভালো করতে চাওয়া যায় না, কক্ষণো না। একটা মানুষকে ভালোই যদি না বাসলাম মন থেকে, ভালোই যদি না চাইলাম তার, তাহলে তাকে আমন্ত্রণ জানানো (দাওয়াত দেয়া) তো অনেক অনেক অনেক অ-নে-ক দূরের ব্যাপার। এইটুকু না বুঝে ইসলামকে বুঝে ফেলার দাবী করা, এর চেয়ে বড় কৌতুক নিশ্চয়ই আর হতে পারে না।

নতুন জন্ম মুহূর্তেই

প্রতি মূহুর্তে নতুন করে জন্ম নিচ্ছি আমরা। এই মূহুর্তের "আমি", এর আগের মূহুর্তের "আমি"র চেয়ে আলাদা। পরপর দুইটা মূহুর্তের "আমি"তেই এত ফারাক!

কেনো?

ধরুন, আগামী দুই ঘন্টা আপনি একটা মুভি দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুভি দেখলেন। দেখা উচিৎ নয় এরকম দৃশ্য দেখলেন, শোনা উচিৎ নয় এমন কিছু শুনলেন, ভাবা উচিৎ নয় এরকম চিন্তা আপনার মস্তিস্কে খেলে গেলো। ধরে নিলাম, অনুচিত সব অভিজ্ঞতা হলো আপনার। এর একটা সরাসরি প্রভাব আপনার মনে (আসলে আত্মায়) পড়বেই। ফলে আপনার চিন্তা ভাবনা প্রভাবিত হবে। যেটা পরবর্তীতে আপনার কাজ কর্মকেও প্রভাবিত করবে। আপনি অনুচিত কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়তো বা আর দ্বিধা করবেন না।

সুন্দর উদাহরণ কেনো দেবো না?

ধরুন, আগামী দুই ঘন্টা আপনি একটা কিউট দর্শনের বই পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিংবা নন-ফিকশান কোনো বই। অথবা ফিকশান হলেও ভালো আর সুন্দর মূল্যবোধ ধারণ করে এমন কোনো লেখা আপনি পড়লেন। চোখ দিয়ে অসাধারণ কিছু সিগন্যাল পাঠালেন মস্তিস্কে। ভাবলেন সুন্দর কিছু। গভীর কিছু। কিংবা অসাধারণ সুন্দর আর গভীরতম বোধ নিয়ে আলোচনা করা একটা লেকচার দেখে ফেলায় আপনার চিন্তাজগত আলোড়িত হলো। অথবা হতে পারে, আপনার সুন্দর আর ভালো কিছু কথা লিখে সবাইকে সুন্দরের প্রতি আহবান জানাতে ইচ্ছে হলো।

ফলে, ভাবলেন আপনি।

ভাবনার ফলে, চিন্তাজগতে আলোড়ন ঘটার ফলে আপনার নিউরনগুলো নতুনভাবে আন্দোলিত হলো। সজ্জিত হলো অন্যভাবে। অদ্ভুত নতুন আলোয় ভেতরে আলো অনুভব করলেন। সুন্দরের আলো। আপনার চিন্তাজগতে পরিবর্তন এলো। প্রভাব পড়লো কাজে। সুন্দর আর ভালোর পথে কাজ করতে আপনি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহিত একজন মানুষ।

কাজেই, এই মুহূর্তের “আমি” সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আগামী মুহূর্তের আলাদা আর অনন্য “আমি” কত বেশি সুন্দর আর অসাধারণ হবো। তাই না?

প্রতি মুহূর্তে নতুন করে জন্ম নিচ্ছি আমরা। এই মুহূর্তের "আমি", এর আগের মুহূর্তের "আমি"র চেয়ে আলাদা। একদমই আলাদা। বর্তমানের “আমি”, “আমার ভাবনা” আর “আমার কাজ”ই ঠিক করছে ভবিষ্যতের “আমি”টা কতো সুন্দর আর আলোকিত হবে।

আর সে আলোয় আলোকিত হবে আমাদের চারিপাশ।

একটু ভাবুন

বই এবং সলাত, এই দুটো জিনিস না বুঝে পড়াটা অর্থহীন।

সলাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কী বলছি, তা ভেতর থেকে অনুভব করলেই প্রতিটা সলাত হয়ে যাবে জীবন পরিবর্তনকারী পরশ পাথর। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনের কথাগুলো বলা, চাওয়া পাওয়ার গণিতগুলো তুলে ধরার পরে আল্লাহকে যে বড্ড আপন আর নিজের মনে হয়। মনে পড়ে যায়, জন্ম থেকে এই পর্যন্ত পাওয়া আল্লাহর দেয়া অগণিত অবিরাম অমূল্য উপহারগুলোর কথা।

একটা হাত না থাকলে কী অবস্থা হতো? দুটো চোখ ছাড়া যদি জন্মাতাম? টেবিল থেকে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতেও তখন কী অসম্ভব যুদ্ধ আর কষ্টই না করতে হতো! পড়াশোনা করা, এতদূর আসা, কিংবা এই লেখাটা পড়ে বুঝতে পারার মতো চোখের জ্যোতি, অক্ষরজ্ঞান আর শক্তিশালী একটা মস্তিস্ক, কোনোটা আমাদের অর্জন?

একটাও না।

অথচ এই জিনিসগুলো পেয়ে গেছি কোনো বিনিময় ছাড়াই। ভালোবাসার উপহার। আমার প্রতিপালকের উপহার। উপহারগুলো কম পেলেও আমরা কৃতজ্ঞ হতাম। উপহারের কী কম বেশি হয়? উপহারতো উপহারই। যে উপহারই পাই, তাই খুশি হয়ে হাত পেতে নিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠার নামই তো কৃতজ্ঞতা! আমাদের জীবনের কোনো জিনিসটা পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে উপহার নয়? সলাতে আল্লাহর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে যখন "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন; আর রাহমানির রাহীম" বলি তখন সব, একদম স-ব উপহারের কথা মনে পড়ে যায়। কৃতজ্ঞতায় মাথাটা নুয়ে আসে। চোখ ভিজে যায় শুধু।

একই সাথে সেই অসাধারণ মমতার আধার আল্লাহর সাথেই নিজের কথা না রাখার কথা, অবাধ্যতার কথা, বেঈমানীর কথাগুলো মনে পড়ে যায়, যখন বলি "মালিক ইয়াওম আদ-দীন"। বিচার দিবসের মালিক। তিনি আমাদেরকে এতই ভালোবাসেন যে কাউকে তিনি শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনিতো ন্যায় বিচারক। ন্যায় বিচার তাঁকে যে করতেই হবে। আর তিনি তা করবেনই করবেন এটাও তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। কারো সাথে অন্যায় হবে না, অবিচার হবে না। সবাই

সেইদিন তাদের প্রাপ্য বুঝে পাবে। অপরাধী তার প্রাপ্য শাস্তি বুঝে পাবে। যার উপর অত্যাচার করা হয়েছে, সে ন্যায্য বিচার পেয়ে আনন্দে সত্যিকারের উল্লসিত হবে। শাস্তির জায়গা যে অনন্ত ভয়ংকর জাহান্নাম, তার ভয়াবহতা তাই আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে বারবার বলে দিয়েছেন। আল-কুরআনে। পরম করুণাময় হয়ে তিনি কেন বলেছেন জাহান্নামের শাস্তির কথাগুলো? কারণ, তিনি আমাদেরকে আসলেই ভালোবাসেন। তিনি শুধু এটাই চান যে আমরা যেন শাস্তি না পাই। সাবধান হই। বেঁচে থাকি অন্যায় আর অবাধ্যতা থেকে। তাই তো তিনি বারবার করে বলে দিয়েছেন যেন আমরা ধ্বংসের পথে না হাঁটি। শাইত্বানকে চিনিয়ে দিয়েছেন, ভালো মন্দ আলাদা করে চিনিয়ে দিতে নাবী-রাসুল (স) পাঠিয়েছেন শুধু আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের পথ দেখাতে। জান্নাত দিতে। ভাবতেই চোখ দুটো ভিজে আসে। মন থেকে স্যরি বলি, মাফ চাই বারবার, বারবার। আল্লাহও তাঁর অনুগত দাসের সত্যিকারের অনুতাপ আর ফিরে আসার আকুতি বুঝেন। তাই অবাধ্যতার পাহাড় দেখেও তিনি ক্ষমার পরশে সব মুছে দেন। হালকা লাগে বুকটা খুব।

জানেন, আরো অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু লেখাতো তাহলে শেষ হবে না। অবিরাম চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে। জানেন, প্রতিদিনের সলাত আমাদের জীবন বদলে দিবে। আমার ব্যবহার, চালচলন, আল্লাহর উপহার দেয়া মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটা শব্দ, উনারই দেয়া কানে কী শুনবো আর কী শুনবো না, উনারই দান করা চোখ দিয়ে কী কী দেখবো না, উনার দেয়া হাত আর পা দুটোকে কোনো কোনো অসাধারণ কাজে ব্যবহার করবো, সবই তখন ভাবনায় থাকবে, সচেতনতায় থাকবে। আল্লাহকে খুশি করতে, উনাকে অসন্তুষ্ট না করতে এই সার্বক্ষণিক সচেতনতার নামই হচ্ছে আরবীতে "তাক্বওয়া"।

আল্লাহ রামাদান দিয়েছেন সেহেরী আর ইফতারের মাঝখানে না খেয়ে উপোস করতে নয়, বরং নিজের হাত, পা, মুখ, পেটের ক্ষুধা, চোখের দৃষ্টি, শ্রবণ ক্ষমতা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে আনতে। দেহের চাহিদার উপরে অন্তরকে জয়ী করতে। আমাদের ক্ষুধা লাগে, তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায়। পেট বলে খেতে চাই, গলা বলে পানি চাই, কিন্তু অন্তর বলে, "না। এখন খেলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। এখন খাওয়া যাবে না।" এভাবেই নিজেদের ভেতরের অবাধ্যতার ইচ্ছাকে, প্রবৃত্তিকে আমরা ৩০ দিন একটানা হারিয়ে দিই। অন্তর জিতে যায় টানা ৩০ দিন। আল্লাহর আদেশ মানতে অন্তর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। একই সাথে চোখ থাকে সংযত। উল্টাপাল্টা জিনিসে চোখ যায় না আর, হোক তা স্ক্রীনে, কিংবা রাস্তায়। এমন কিছু কানে শুনতে আর ইচ্ছে হয় না যা আল্লাহর অপছন্দ। এভাবেই আমাদের মাঝে

সচেতনতা আসে, তাক্বওয়া ইন্সটল হয়ে যায় এক মাসের ট্রেইনিং এ। তবে এর জন্যে প্রিপারেশান নিতে হয়। খেয়াল রাখতে হয়। ট্রেইনিং এ মনোযোগ রাখতে হয়, যাতে কোনো ভুল না হয়ে যায়। অবাধ্যতা না হয়ে যায়। এক মাস ট্রেইনিং এর পর আমরা বাকি ১১ মাস শাইত্বানের সাথে যুদ্ধ করার মতো প্রস্তুত হয়ে যাই। এ যে কী আনন্দ! আল্লাহর কাছ থেকে ট্রেইনিং নিয়ে পাশ করার অপার আনন্দ উদযাপন করতে তাই মাস শেষে একটা আনন্দোৎসব দিয়েছেন আল্লাহ, আরবীতে যাকে আমরা "ঈদ" বলি। যাদের ট্রেইনিং ঠিক মতো হয়, তারা ঈদের দিন ফজর, যোহরের সলাত থেকে শুরু করে আর সলাতকে কোনোদিনও ছেড়ে দেয় না, আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায় না। প্রতিদিন কুরআন পড়া আর কখনো ছেড়ে দেয় না। কী অসাধারণ উপহার এই রামাদান মাস আমাদের সারা জীবনের জন্যে! তাই না?

আমাদের প্রতি আমাদের প্রভু আল্লাহর আদেশ হচ্ছে উনার সাথে দিনে পাঁচবার যেন সবাই এক সাথে এক কাতারে (জামা'আতে) দাঁড়িয়ে দেখা করি, কথা বলি। উনি আমার কথা শুনতে চাচ্ছেন, আমার কথার সাড়া দিতে চাচ্ছেন, আর আমি কথা বলতে যাবো না? তা কী হয়? হয় না।

আমরা যাবো। প্রতিদিন পাঁচবার যাবো। সলাতে দাঁড়াবো। প্রতিটা কথা আল্লাহকে বুঝে বুঝে বলবো। মন থেকে বলবো। অনুভব করে বলবো। আমাদের জীবনটাই বদলে যাবে আস্তে আস্তে আল্লাহ চাইলে।

আনন্দের বিষয় হলো, দরজায় রামাদান কড়া নাড়ছে। আজ থেকে রামাদানের আগ পর্যন্ত আর একটা সলাতও ইন শা আল্লাহ আমরা মিস দিবো না। কোনো ভাবেই না। এখনই মোবাইলে পাঁচটা এলার্ম সেট করি, পাঁচ ওয়াক্তের জন্যে। এলার্ম বাজলেই সব কাজ ফেলে দিয়ে সোজা দৌড় দিতে হবে সলাত পড়তে।

এতে রামাদানের প্রস্তুতি হবে।

আমাদের অন্তর শাইত্বানের কবল থেকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে ইন শা আল্লাহ।

এই রামাদানটা আমরা আমাদের জীবনের সবচাইতে বেস্ট রামাদান হিসেবে দেখতে চাই।

ও আল্লাহ, আমরা বড্ড দুর্বল। আমাদেরকে সাহায্য করো। আপনার দিকে যেতে সাহায্য করো। আপনার কাছের একজন হতে আমাদেরকে সাহায্য করো। এই রামাদানের আগের সময়টাকে আমাদের প্রস্তুতির জন্যে সহজ করে দাও। এই

রামাদানটাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ রামাদান করে দাও। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের সবার অন্তরকে এই রামাদানে আপনার নি'আমাতপ্রাপ্ত প্রিয় মানুষগুলোর মতো সোনালী আলোতে আলোকিত করে দাও প্লিজ! প্লিজ ও আল্লাহ, আমাদেরকে সাহায্য করো। আপনার সাহায্য ছাড়া যে আমরা তুচ্ছ আর মূল্যহীন। কবুল করে নাও আমাদের এই চাওয়াটা। দয়া করুন ইয়া রাহমানুর রাহীম! আ-মীন।

আবারও স্মরণিকা

"ওহহহ, আর পারি না, খানা দে কইলাম!", পেট চিৎকার করে উঠবে।

"পানি দে না, প্লিইইইজ। মরে যাচ্ছি তো!", গলা আর্তনাদ করবে।

"মিউজিকটা ছাড় না। এক লাইন শুনবো শুধু", কানের আবেদন।

"একটু দেখবো। একবার চোখ তুলে তাকা। চলে যাচ্ছে তো! একবার শুধু, কিচ্ছু হবে না", চোখের আকুতি।

নাহ! আমরা একটা আবদারও শুনবো না। একবারও না। পুরো এক মাসের ট্রেইনিং এটা। পরিপূর্ণভাবে পুরো মাস জুড়ে কঠোরভাবে নিজেকে ট্রেইন করবো। তবেই না মাস শেষে ট্রেইনিং কমপ্লিশান উপলক্ষ্যে যে মহোৎসব (ঈদ) হবে, শুধুমাত্র পূর্ণাংগ ট্রেইনিং কমপ্লিশানইতো আত্মার গহীনে সেই সত্যিকার আনন্দের কল্লোল বয়ে নিয়ে আসবে। আর তার ফলাফল আমরা উপভোগ করবো বাকি এগারোটা মাস।

নিজের শরীরের উপর এই অতি-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসার কঠোর প্রচেষ্টা শুধুমাত্র আল্লাহকে চাই বলে, উনাকে ভালোবাসি বলে। উনাকে খুশি করতে চাই বলে। রামাদান এমন এক মাস যাকে আল্লাহ এত এত্তো মর্যাদা দিয়েছেন কারণ এই মাসেই আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। আমাদের রাসুলুল্লাহ (স) এই মাসে কুরআন পড়ে এবং শুনে শেষ করতেন। আমরা ছোট্ট দুইটা পদক্ষেপ নিতে পারি এই মাসে, যা আমরা সারাজীবন ধরে চালিয়ে যাবো। আর আমাদের জীবন বদলে যাবে। বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবো। আর কী চাই? কী সেই দুইটা কাজ?

১। দিনে পাঁচ বার জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবো। বুঝে সলাত পড়বো। বেশি বেশি মাফ চাইবো। খুব বেশি। সলাতে মাফ চাইবো। সলাত শেষে মাফ চাইবো। দুই সলাতের মাঝখানের সময়টাতে পাগলের মতো দান-খয়রাত করবো, আর মাফ চাইবো। রাস্তায় হাঁটার সময়, গাড়িতে চড়ার সময় মাফ চাইবো। আর মনে মনে অপেক্ষা করবো পরবর্তী সলাতের জন্যে, মাসজিদে যাওয়ার জন্যে। যেখানে থাকি না কেন, যে কাজেই থাকি না কেন, জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্যে দৌড় দিবো সময় হলেই। ইন শা আল্লাহ এই অভ্যাস গড়ে উঠলে আর জীবনে জামা'আতে সলাত মিস হবে না।

২। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করবো অর্থসহ বুঝে। তাফসীর পড়বো। ভাববো আল্লাহ আমাকে কী বলেছেন, কীভাবে আল্লাহর কথাগুলো নিজের জীবনে প্রয়োগ করা যায়। চিন্তা করবো গভীরভাবে। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় কুরআনের জন্যে নির্ধারিত করে ফেলবো। প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে যেনো কুরআন নিয়ে বসতে পারি, পৃথিবীর কোনো কাজ যেনো আমাকে কুরআন পড়া থেকে আর সরাতে না পারে। যেনো মন দিয়ে পড়তে পারি, তিলাওয়াত করতে পারি, তাফসীর পড়তে পারি, সেভাবেই সময়টা নির্বাচন করতে হবে। একটা দিনও যেন কুরআন পড়া থেকে আর বাদ না যায়। একটা দিনও না। এভাবে এক মাস জুড়ে অসাধারণ একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে, যা রামাদান চলে গেলেও আমাদের জীবনে রয়ে যাবে প্রতিদিনের জন্যে। যার দিন কুরআন দিয়ে শুরু হয়, তার দিনটা অসাধারণ কাটে, ভালো কাজে কাটে। মন্দ থেকে দূরে দূরে কাটে। এর চেয়ে বড় ফলাফল আর কিই বা হতে পারে? রামাদান আসে, রামাদান যায়। আমরা যেমন ছিলাম, তেমনই থাকি। এইবার ইন শা আল্লাহ তা হবে না।

এইবার আমরা প্রতিটা ক্ষণ পেট, গলা, চোখের দৃষ্টি, কানে প্রবেশ করা শব্দমালা, মুখ থেকে বেরিয়ে আসা কথা সবগুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করবো। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো যাতে আল্লাহ দিনশেষে আমার যুদ্ধ দেখে খুশি হন, আমার পরবর্তী জীবনে এই নিয়মিত যুদ্ধের ফলাফল অনাবিল শান্তি আর সৌন্দর্য্যের আলো নিয়ে আসে।

সবার জন্যে দু'আ রইলো যেন এই রামাদানে আল্লাহর ক্ষমা আদায় করতে পারেন। আল্লাহর কাছের একজন হতে পারেন।

আমার জন্যে দু'আ করবেন যেন রামাদান পেয়েও যারা ক্ষমা আদায় করতে পারে না, সেইসব অভিশপ্তদের দলের অন্তর্ভুক্ত যেন আমি না হই। সত্যি সত্যি দু'আ করবেন। মন থেকে দু'আ।

আজকেই রামাদানের জন্যে পরিকল্পনা করে ফেলুন। যতো ছোট প্ল্যানই হোক না কেন প্ল্যান করুন। এটা আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। অন্যকেও প্ল্যান করতে উৎসাহিত করুন। পরিবার আর বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে ছড়িয়ে দিন। নিজেই আলোকবর্তিকা হোন।

আমরা একা একা জান্নাতে যেতে চাই না। সবাইকে সাথে নিয়েই যেতে চাই। একসাথেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই।

পরম করুণাময়, পরম ক্ষমাশীল আমাদেরকে কবুল করে নিন, সহজ করে দিন।

আ-মীন।

সত্যিটা বলুন না!

যেটাকে আজ ভুল বলে জানা হলো, সেটাকে আর কোনোদিন না করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই হলো সাহসিকতা।

হতে পারে সমাজের লক্ষ মানুষ সেই ভুলকে মেনে নিয়েছে, মনে প্রাণে পালন করে অভ্যস্ত। হতে পারে সেই ভুলকে ভুল বলে আঙ্গুল তুললে সমাজ আমাদেরকে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করবে। তবুও সেই ভুলকে আমরা ভুলই বলবো। ঠিক বলবো না।

কেউ হাতে গড়া মূর্তি, কিংবা কবরের কাছে মাথাকে নত করে সাহায্য চায়, ভয় করে। কেউ সমাজকে প্রভু আর অভিভাবক মনে করে তোয়াজ করে চলে। কেউ টাকাকেই মনে করে লালন-পালনকারী প্রতিপালক, অভিভাবক (রাব্ব)।

আমরা তো সেই দলের নই।

ইসলাম সবসময়েই নতুন। আমরাতো সেই ইসলামের জয়গান গেয়ে চলা আগন্তুকের কাফেলা। সব যুগেই আমাদের দেখে মানুষ চমকে যায়। স্রোতের বিপরীতে সত্যের পতাকা হাতে নিয়ে চলায় কষ্ট আছে বৈ কি, কিন্তু সেই বাঁধ ভাঙা তৃপ্তি আর আনন্দের তুলনাটা যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না!

আপনি, আমি যত সুন্দর করেই, যত আন্তরিকতা দিয়েই মূর্তিপূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা, সুদ, ঘুষ, পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা কিংবা মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলি বা লিখি না কেন, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, যারা সংশোধিত হতে চায় না, নিজের প্রবৃত্তির পূজাকেই জিন্দেগীর মাকসুদ বানিয়ে নিয়েছেন যারা, তারা তেলেবেগুনে রেগে উঠবেনই। এদের কথাকে ভয় করবেন না। এদেরকে খুশি রাখার জন্যে সংকোচ করবেন না সত্য বলতে।

আমাদের নবীজির কথা একবার মন দিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। তাঁর চাইতে সুন্দরভাবে আর কে ইসলামের দিকে আহবান করেছে? উনার চাইতে সুন্দর করে সত্যের শিক্ষা কে দিয়েছে এত এত্তো সহনশীলতার সাথে? তাঁর চাইতে অসাধারণ ব্যবহার আর চারিত্রিক মাধুর্য আর কার ছিলো এই জগতে? কারো নয়। কক্ষণো না।

এই মানুষটা সত্যকে সত্য বলেছেন দ্বিধা শঙ্কাহীন ভাবে, কিন্তু সবচাইতে সুন্দরতম আর আন্তরিক উপায়ে। ফলে, অনেক মানুষ সত্যকে চিনে নিয়েছেন,

নিজের জীন্দেগীকে রাঙ্গিয়ে নিয়েছেন ইসলামের স্বর্ণালী আভায়। পাশাপাশি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ঠিকই এই অসাধারণ আর অতুলনীয় চরিত্রের মানুষটাকে গালি আর অপবাদ দিতে চিন্তা করেনি।

উনার কোলে যখন উনার ছেলে শিশু মারা যায়, পুত্রশোকে যখন উনার মনটা পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে বিষাদে ভরে উঠেছে, তখন উনার পাশের ঘরের প্রতিবেশি চাচা আনন্দোৎসব করেছিলো চিৎকার করে করে। ভাবা যায়? সন্তান হারানোর শোক কোনো পিতাই সইতে পারেন না। সেই সন্তানের মৃত্যুর কারণেই নিজের চাচা উল্লাস করছে, আনন্দ করছে, এই দুঃখ কি কোনোদিনও আমরা অনুভব করতে পারবো? কেন আবু লাহাব উনার সাথে এমন কুৎসিততম আচরণ করেছিলেন? কারণ, মুহাম্মাদ নামের অসাধারণ মানুষটা শুধু সত্যটা বলেছিলেন, আসন্ন বিপদ থেকে সবাইকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম।

রাস্তাঘাটে পাথর মেরে মেরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্তাক্ত করে দিয়েছে উনাকে শুধু সত্য বলার জন্যে। সলাত আদায়ের সময় পাবলিক প্লেসেই সবার সামনে উনার শরীরের উপর পুঁতি গন্ধময় নোংরা এনে ঢেলে চাপা দিয়ে দিয়েছে এই অসাধারণ মানুষটাকে। রাতের আঁধারে দলবেঁধে খুন করতে এসেছে উনার নিজের বাসাতেই। দিনের পর দিন ধাওয়া করেছে উনাকে উনার মাথাটা কেটে আনার জন্যে। নিজের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছে। তবুও থামেনি ওরা। উনাকে আর উনার সাথীদের আক্রমণ করেছে হাজারেরও বেশি রণসজ্জায় সজ্জিত আর্মি নিয়ে। দয়ার সেই নাবীকে বাধ্য হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ৩১৩ জন সাথীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছে বদরের সেই ধু ধু প্রান্তরে। এক অসম্ভব, অসম যুদ্ধে।

সত্যটা বলতে গিয়ে সম্ভ্রান্ত আর উচ্চ বংশীয় এই মানুষটাকে জিন্দেগীর সুখ শান্তি ত্যাগ করতে হয়েছিলো। কেনো? শুধু আপনার কাছে সত্য বার্তাটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে। দুই মাস উনার ঘরে রান্নার জন্যে কোনো আগুন জ্বলেনি, শুধু তিনি সত্য বলেছিলেন বলে। ক্ষুধার চোটে নিজের প্রাণপ্রিয় সাথীদের সাথে তাঁকেও পেটে কষে পাথর বেঁধে দিন পার করতে হয়েছে শুধু তিনি সত্য বলেছিলেন বলে।

আপনার ঘরে কয়দিন চুলার আগুন জ্বলেনি সত্য প্রচারের জন্যে? কয়দিন সত্য বলার কারণে মানুষের অত্যাচারে কিছু না খেতে পেয়ে আপনি পেটে পাথর বেঁধেছেন? রাস্তায় উনার মতো সম্মানিত ব্যক্তিত্ববান উচ্চ বংশীয় কোমল হৃদয়ের মানুষটা মুহুর্মুহু পাথরের আঘাত খেয়ে রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেছেন। নিজেকে একবার সেই জায়গায় কল্পনা করুন। কল্পনা করুন সেই রক্ত আপনার

জুতার তলায় পৌঁছে শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে জুতাকে পায়ের সাথে আঁটকে ফেলেছে।

ভুলে গেলে চলবে না, উনি শুধু সত্যটা বলেছিলেন। শুধুমাত্র সত্যটা জানাতে চেয়েছিলেন। মানুষকে সত্যটা বুঝাতে চেয়েছিলেন। আর কিছু চাননি তিনি। ক্ষমতা, নারী, আর বিত্ত চাইলেই উনার পায়ের কাছে হাজির করে দিতে প্রস্তুত ছিলো মাক্কাবাসী। শর্ত একটাই, শুধু উনাকে সত্য বলা থেকে চুপ থাকতে হবে। তাহলেই আপোষে উনি এগুলো সব পেয়ে যেতেন। উনাকে এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু উনিতো সত্য নাবী। উনি মেনে নেননি। সত্যের পথে অটল থাকতে যেয়েই আজীবন এত কষ্ট করেছেন। শুধু সত্যটা জানিয়েছেন তিনি।

এতেই মানুষ তাঁর মতো অসাধারণতম ব্যক্তিত্বের সাথে উপরের ব্যবহারগুলো করেছে। উনি যদি সত্য বলাকে সংকোচ করতেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব আর এলাকাবাসীদের চোখ রাঙ্গানি আর খুন করে ফেলার হুমকিকে ভয় করতেন, তাহলে আজ আমার কাছে সত্যের স্বর্ণালী আলো এসে আর পৌঁছাতো না। অথচ আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষ সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে ভাবি এটা একদম সহজেই হয়ে যাবে। কেউ প্রতিবাদ করবে না, কেউ সম্পর্ক ছেদ করবে না। কেউ কটু কথা বলবে না।

আরে সবচাইতে অসাধারণ মানুষটাকেও সবচাইতে আন্তরিকতার সাথে, সবচাইতে বেস্ট উপায়ে শুধু সত্যটা বলার জন্যে এই দুনিয়ার মানুষ খুন করে ফেলতে চেয়েছে, সেইখানে আপনি আমি কোথাকার কে? আমরা নিজেকে মনে করিয়ে দিতে পারি আল-কুরআনের সূরা আরাফের শুরুতেই স্পষ্ট করে বলে দেয়া আল্লাহর সেই পবিত্র কথাগুলো, যেখানে সত্যকে প্রকাশ করা নিয়ে কোনোরকম সংকোচ আর দ্বিধা করতে একদম মানা করে দিয়েছেন আল্লাহ। নিচে আয়াতগুলো মন দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে চিন্তা করে করে পড়ার জন্যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিলামঃ

"এটি তোমার প্রতি নাযিল করা একটি কিতাব। কাজেই তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে।

এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

এর মাধ্যমে আপনি (অস্বীকার কারীদেরকে) ভয় দেখাবেন এবং বিশ্বাসীদের জন্যে এটি হবে একটি স্মারক।

হে মানব সমাজ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরন করো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবকদের

অনুসরণ করো না।

কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে থাকো।

কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

তাদের উপর আমার আযাব অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের বেলা, অথবা দিনের বেলা, যখন তারা বিশ্রামরত ছিল।

আর যখন আমার আযাব তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোন কথাই ছিল না যে, সত্যিই আমরা জালেম ছিলাম।

কাজেই যাদের কাছে আমি রসূল (মেসেঞ্জার বা বার্তাবাহক) পাঠিয়েছি তাদেরকে অবশ্যি জিজ্ঞাসাবাদ করবো।

এবং রসূলকেও জিজ্ঞাসা করবো (তারা পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব কতটুকু সম্পাদন করেছে এবং এর কি জবাব পেয়েছে)

তারপর আমি নিজেই পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সমুদয় কার্যাবিবরনী তাদের সামনে পেশ করবো। আমি তো আর সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না!

আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে।

অতঃপর যাদের পাল্লা ভরী হবে, তারাই হবে সফলকাম।

এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে।

কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করতো।"

[সূরা আরাফঃ ২-৯]

স্পিরিট আর রিচুয়াল

Spirit এর সাথে Ritual এর প্রকৃত যোগসন্ধি না হলে Spirituality এর জায়গাটা শূন্যই পড়ে রবে। জীবনের সত্য অর্থটা রয়ে যাবে অধরা। যাপিত হবে শুধু খোলসে আবৃত কিছু নিয়মকানুন। আত্মার উন্নতি কী সেটা বুঝে নেয়াই হবে না কোনোদিন। সেই উন্নতিটার কাজে-কর্মে প্রতিফলন হওয়াটুকু বন্দী হয়ে রবে "সুদূর অস্তাচল" নামক শব্দযুগলে।

এই আত্মিক শূন্যতা পূরণের প্রথম এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের নাম হচ্ছে সলাত, যা দৈনিক পাঁচবার "বুঝে" এবং "mean করে" আদায় করতে হয়, স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ তৈরী করতে হয়। বস্তুজগতে অবস্থান করে স্পিরিচুয়ালি অন্যমাত্রার বাস্তবতার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করাটাই শিখতে হয়, অনুশীলন করতে হয় প্রতিদিন। দিনে অন্তত পাঁচবার। “মন” দিয়ে। আত্মিকভাবে এই মনঃসংযোগ করাটা, দিনে অন্তত ১৭ রাকাতে "স্রষ্টার সামনে" আক্ষরিক অর্থেই কাঁপা কাঁপা হাঁটু নিয়ে দাঁড়ানোটা আর কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়াটা যে কী কঠিন, সেটা যারা এই কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সত্যিই যেতে চেয়েছে তাদের চেয়ে ভালো আর কেউই জানে না।

সলাতটা যদি সত্যিকারের সলাত না হয়, স্রষ্টার সামনে সত্যি সত্যি দাঁড়ানোটা যদি সত্যি সত্যি শেখা না হয়, তাহলে আর বাকিগুলো শেখার ব্যাপারটা হয়তোবা কখনো বুঝেই আসবে না। আর সলাতটা শিখা হলে বাকিগুলো শেখা নিশ্চয়ই সহজ হয়ে যাবে। কাজ-কর্মগুলোর কোয়ালিটি আমূল বদলে অসাধারণ হয়ে যাবে। উল্টোটাও সত্যি হতে পারে। সারাদিনের প্রতিটা কাজেকর্মে যে মানুষটা স্পিরিচুয়ালি স্রষ্টার অস্তিত্ব আর জ্ঞানের ব্যাপ্তির ব্যাপারে সচেতন, তার জন্যে সলাতে কনসেন্ট্রেইট করাটা অনেক অনেক সহজ হয়ে যাবার কথা। দৈনন্দিন কাজকর্ম আর সলাত দুটোরই পরস্পরের কমপ্লিমেন্টারী হওয়ার কথা।

ব্যাপারটা অনেকটা এরকমঃ সলাতের কুরআনের স্মরণিকাগুলো প্রতিফলিত হওয়ার কথা সারাদিনের কাজেকর্মে। আবার সারাদিনের কাজেকর্মে স্রষ্টার ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সচেতন থাকার মাধ্যমে উনার অসন্তুষ্টির কাজগুলো থেকে বিরত থেকে নেক্সট সলাতে সংযুক্ত হওয়াটাকে সহজ করে নেয়া যেতে পারে আগের সলাতের তুলনায়।

সম্ভবত এইজন্যেই যে ব্যক্তি শেষ বিচারের দিনে সলাতের হিসেব "ঠিকমতো"

দিতে পারবে, তার জন্যে অন্য সবকিছুর হিসেব দেয়া একদমই সহজ হয়ে যাবে। যোগসূত্রটা কি আমরা একটু হলেও বুঝতে পারছি? কারণ, কথাগুলো শব্দে ধরাটা কঠিন। বোঝানো এবং বুঝে নেয়া দুটোই। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলে বোধহয় সম্ভব।

সলাত আদায়ের সময়ে শত্রুপক্ষের তীরগুলো শরীরে বিঁধে রক্তাক্ত করে দেয়ার পরেও সেই অতন্দ্র নৈশপ্রহরী সাহাবী টের পাচ্ছিলেন না কেনো সেটা কি একটু হলেও এখন অনুভব করা যাচ্ছে? আরেক সাহাবীর শরীরে (সম্ভবত পায়ে) ছোঁয়াই যাচ্ছিলো না ব্যথার তীব্রতায়। উনি সেই অবস্থায় সলাতে দাঁড়ানোর পর তীরটা বের করতে বললেন, করাও হলো, এবং তিনি কিছুই অনুভব করলেন না। কেনো? একটুও কী চিন্তা করতে পারছি? রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গিয়ে এত এত বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন যে উনার স্ত্রী মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন যে উনি হয়তো আর দুনিয়ায় নেই। এতই সন্দিহান হয়ে গিয়েছিলেন যে বেঁচে আছেন কিনা সেটা কনফার্ম করার জন্যে সত্যি সত্যি ছুঁয়ে দেখেছিলেন রাসুলুল্লাহ কে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

নিজেকে প্রশ্ন করি আমরা কি একবারও এইরকম সলাত পড়তে পেরেছি জীবনে?

আরো প্রশ্ন করি কেনো রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত এইরকম ছিলো? কেনো সাহাবীদের সলাত এইরকম ছিলো? সলাত আদায়ের সময় কিসের মধ্য দিয়ে যেতেন উনারা? কেনো উনারা তাহাজ্জুদ মিস দিতেন না? এত আনন্দ পেতেন কেনো উনারা সলাতে? আমরা নিশ্চয়ই সলাতের সবচাইতে আভ্যন্তরীণ আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করছি যেটা মিস করলে সলাতের আসল অভিজ্ঞতাটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। বস্তুবাদীতার (materialism) সাথে আমাদের আত্মিক সম্পৃক্ততার মাত্রার অতিরিক্ততা হয়তো এই ব্যাপারটা বুঝার এবং অভিজ্ঞতা নেয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা ঠিক করার জন্যে আমাদেরকে সেই সলাতকেই ঠিক করতে হবে। ঠিক করে নিতে সারাদিনের কাজের মাঝের আত্মিক সচেতনতাকে। একটা ছাড়া আরেকটাকে ধরতে পারা আপাততঃ অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

আমাদের এখুনি চিন্তা করা উচিৎ- আমাদের সলাতে কি উনাদের মতো অভিজ্ঞতা হচ্ছে? আমরা সলাতে জাস্ট উঠবসের বাইরের অন্য কোনো বাস্তবতার সাথে কানেক্ট করতেই পারছিতো কথাগুলোকে?

প্রত্যেকের স্পিরিচুয়াল জার্নিই আলাদা।

কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে সেটার শুরুটা হতে পারে সলাতেই।

সত্যিকারের গভীর ভাবনা আর উদ্যোগের শুরু হোক এখান থেকেই।

এখন থেকেই।

আরো দেরী হয়ে যাবার আগেই চেনা হোক, খোঁজা হোক, বুঝে নেয়া হোক সফলতার আসল চাবিটাকে।

লেখাটা ভালোভাবে আত্মস্থ করার জন্যে আরো একবার পড়ে নিতে পারেন, তারপরে চিন্তা করতে পারেন আজ সারাদিনের কাজগুলো আসলে কিভাবে করার কথা ছিলো? সলাতগুলো কেমন হবার কথা ছিলো? আমি কি আগের জীবনেই ব্যাক করতে চাই, নাকি জীবনের এই বিন্দু থেকেই আমি নতুন জার্নিটা শুরু করে দিতে চাই?

মনে রাখতে হবে, It's never late to start fresh.

আর অপমান না

পকেটের পাঁচ টাকা, কিংবা ব্যাঙ্কে শুয়ে থাকা পাঁচ কোটি টাকা কোনোটাই আমার না। আরে, যে শরীর দিয়ে পরিশ্রম করে করে টাকা উপার্জন করে আনি সেই শরীরটাই বা কোনো মার্কেট থেকে কত কোটি টাকা দিয়ে কিনে এনেছি যে "আমার" "আমার" বলে দাবী করি? যেখানে এই শরীরটাই আমার না, সেখানে এই শরীর বা মস্তিস্ক খরচা করে যে টাকাটা কামাই করি সেইটাকে নিজের বলি কোনো মুখে?

আমার কাছে থাকা টাকাগুলো আমার না। আমার কাছে থাকা শার্ট, প্যান্ট আমার না। আমার হাত, মাথা, পেট, মেধা কোনোটাই আমার না। সবগুলোই আমাকে আমানাত হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন একজন। সবাইকে এই আমানত তিনি সমানভাবে দেননি। কাউকে বেশি দিয়েছেন, কাউকে কম। টাকার আমানাতের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। জগতের প্রত্যেকটা অণু আর পরমাণু যার মালিকানার আওতাধীন, সেই তিনিই একেকজনকে একেকরকম শারিরীক, আর আর্থিক ক্ষমতা দিয়েছেন।

-কেনো?

-পরীক্ষার জন্যে।

যে কম পেয়েছে, তার জন্যে এটাই পরীক্ষা যে সে কম পেয়েও সন্তুষ্ট কি না? শুকরিয়া করে কি না? কারণ, তার চেয়েও বহু বহু গুণে কম পেয়ে মানুষ জিন্দেগী পার করছে সন্তুষ্টি নিয়ে।

আর যে বেশি পেয়েছে, তার জন্যে এটাই পরীক্ষা যে, সে নিজের সত্যিকার অসহায় অবস্থার কথা মনে রেখে নরম আর বিনয়ী থাকে কি না! যিনি তার দাতা তাঁকে মনে রাখে কি না, থ্যাঙ্কস দেয় কি না! নাকি এগুলো সব নিজেরই কামাই, নিজেরই অর্জন মনে করে, নিজেকে উঁচু মানুষ ভাবে?

আমরা নিজেকে উঁচু ভাবি কি না তা কিন্তু সহজেই বোঝা যায়। গেইটের দারোয়ান ভাইয়া, রিকশাচালক চাচা, কিংবা বাসায় পেটের দায়ে খাটতে আসা গৃহপরিচারিকাটিকে সালাম দিতে গিয়ে কোনো অহংকারে গলায় আঁটকে যায় কেনো কখনো ভেবে দেখেছি? কখনো ভেবে দেখেছি গরীব মানুষকে আমরা

সহজেই কেনো আপনি, তুই বলে ডেকে ফেলি? তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি? একই কাজ কি আমরা বাড়ি, গাড়িওয়ালা, স্যুট প্যান্ট গায়ে দেয়া কোনো মানুষের সাথে একইভাবে অবলীলায় করতে পারি?

আজ আপনার অনেক বিশাল "স্ট্যাটাস" হয়েছে! আপনি আপনার নিজের বা আপনার পূর্বপুরুষের গরিবী স্ট্যাটাসের ইতিহাস ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন, কিংবা কখনো বুঝার সময়ই পাননি, কে আপনাকে এত্তো বি-শা-ল স্ট্যাটাস দিয়েছেন!

আপনার চেয়ে যার "স্ট্যাটাস কম" তাকে আপনার মানুষই মনে হয় না! স্ট্যাটাস কমওয়ালা মানুষের সাথে আপনি এমন ব্যবহার করেন, যেটা আপনি কোনোদিনও কোনো কোটিপতি গাড়িওয়ালার সাথে করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

আপনাকে তাই আজ কিছু কথা জানিয়ে রাখি যা আপনি হয়তো জানেন না। গরীব মানুষগুলোরও না মস্তিস্ক থাকে! মন আর অন্তর নামের বিমূর্ত জায়গাগুলোতে ওদেরো অনুভূতি নামের দামী দামী সব মণি-পান্না বিছানো। ওরা কিন্তু দেখে আপনি ধনীদের সাথে কিভাবে কথা বলেন, আর ওদের সাথে কিভাবে! ওরা কিন্তু এর পেছনের কারণটা বোঝে। খুব ভালোভাবেই বোঝে। ওরা কখনো কাউকে বলতে পারে না, বলে না দেখে ভেবো না যে ওরা বোধশক্তিহীন জম্বি!

ভুলেও ওদেরকে এমনটা ভাবার দুঃসাহস যেনো আপনার আর কক্ষনো না হয়।

মনে রাখবেন, টাকার পরিমাণের জন্যে, স্ট্যাটাসের জন্যে করা অপমান হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে তীব্র আর তীক্ষ্ণ অপমান। একজন মানুষের বুকের মাঝে লালিত অনুভূতিগুলোর জন্যে সবচাইতে কদর্য আর কুৎসিত অপমান। সবচাইতে ভয়ংকর কষ্টের অপমান।

দু'আ করি পরম করুণাময় যেনো আপনাকে কক্ষনো কোনোদিন এমন তীব্র কষ্টমাখা অপমানের মুখোমুখি না করেন।

টর্চার!

একটা দেশে যখন আইন বলে কিছু থাকে না, তখন পুরো দেশটাই কারাগার হয়ে যায়।

রাস্তায় বেরুলেই পুলিশ থামায়। সারা শরীরে হাতা-পিতা করে, ব্যাগ চেক করে।

কেন?

কারণ, আমরা আমাদের রাসুল (স) কে ভালোবাসি নিজেদের জীবনের চাইতেও বেশি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উনার আদেশ মানি, আনুগত্য করি সঠিক পথে থাকার জন্যে। জীবনের চাইতেও উনাকে বেশি ভালোবাসা যে ঈমানেরই একটা শর্ত। অন্তরে যে ভালোবাসার বীজ আমরা বুনি, কাজে-কর্মে সেই ভালোবাসার বিশাল মহীরুহ প্রকাশমান হওয়াটাই যে স্বতঃস্ফূর্ততা।

আমরা যে রাসুলের (স) আদেশ অমান্য করে রেজরের এক টানে দাড়িকে নালায় ভাসিয়ে দেয়ার কথা ভাবতে পারি না। পারি না প্যান্টটাকে ঝেড়ে পায়ের গোড়ালির নীচে নামিয়ে দেয়ার সাথে সাথে উনার কথাকেও ঝেড়ে ফেলে দিতে।

পারি না আমরা। আসতে যেতে পুলিশ তাই আমাদের থামায়। মোবাইল চেক করে। মানিব্যাগের চিপাচাপায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজে দেখে!

ইদানিং নিজেকে কয়েদীর বেশি কিছু আর ভাবতে পারি না।

খারাপ লাগে মাঝে মাঝে।

আবার ভালোও লাগে হঠাৎ। অনুপ্রেরণা পাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরের প্রজন্মের অত্যন্ত মেধাবী স্কলারদের উপর অকথ্য নির্যাতনের পরেও উনাদের ধৈর্য্য দেখে। সত্যকে মেনে নিলেই কিছু পরীক্ষা মানুষের উপর অবধারিত হয়ে যায় বোধহয়। অসাধারণ অনন্ত ক্যারিয়ারের আগে ভিসা আর টিকেট পাওয়ার পথটা একটু বন্ধুর বৈ কি!

আমাদের প্রাণপ্রিয় সাহাবাদের বিদায়ের পর থেকে অজস্র স্কলারই ইসলাম মেনে চলার জন্যে, ইসলাম নিয়ে আপোষ না করার জন্যে কারাগারে বন্দী ছিলেন। আর

আমরা তো কোনো ছার!

কত 'আলীম বৃদ্ধ বয়সে কারাগারের নির্মম অত্যাচার সয়েছেন। নির্মম অত্যাচার ক্ষতবিক্ষত শরীরে সইতে না পেরে প্রাণ চলে গিয়েছে। তবুও ইসলামকে তাঁরা ছাড়ার কথা চিন্তাও করেননি। জীবন বাঁচাতে, আয়েশের খোঁজে আপোষের কথা উনাদের মাথাতেও আসেনি। নিশ্চয়ই উনাদেরকে উনাদের সমসাময়িকেরা হয় বোকা কিংবা উগ্র বলতো। আজ তাদের নাম স্মরণ করতেই আমরা রাহিমাহুল্লাহ বলে দু'আ করি। সেই দু'আ পৌঁছে যায় বিশ্বচরাচরের সীমা পেরিয়ে অন্য এক অপূর্ব জগতে।

প্রথমজনের নাম আবু হানীফাহ। রাহিমাহুল্লাহ। সাহাবীদের নেক্সট জেনারেশানের একজন জ্বলজ্বলে আগুন। তাবি'ই ছিলেন। উনাকে জ্ঞানের পাহাড় বলবো, নাকি মহাসমুদ্র?

কুফার শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইবন উমারের নির্দেশে উনার উপর কত অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। তবুও সরকারী পদ গ্রহণ করতে তাঁকে রাজী করানো যায়নি। পরবর্তীতে আব্বাসিদের শাসনামলে তাঁকে একই অনুরোধ করা হলেও তিনি টলেননি। ফলে, তাঁকে বাগদাদে জেলে বন্দী করা হয়। জেলখানাতেই মৃত্যুবরণ করে নেন এই অসাধারণ নিবেদিতপ্রাণ অত্যন্ত স্মার্ট আর মেধাবী এই মানুষটা।

উনার চাইতে মাত্র ১৩ বছরের ছোট আরেকজন ট্যালেন্টের কথা বলি। ইমাম মালিক। রাহিমাহুল্লাহ। আব্বাসি শাসকদের সরকারী আইনের বিরোধীতা করার কারণে তাঁকে এত এত্তো মারাত্মক নির্যাতন করা হয় এবং এমনভাবে পেটানো হয় যে উনার হাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো। কেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো? উনি সলাতে হাত বাঁধতে পারতেন না, এবং হাত না বেঁধেই উনাকে সলাত আদায় করতে হতো। উফফফ! চোখ বুজে একবার কল্পনা করলেই গা শিউরে ওঠে।

আরেকজন অসাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন ইমাম শাফি'ই। রাহিমাহুল্লাহ। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু পর্যন্ত উনার দূর্দান্ত তত্ত্বাবধানেই ফিক্বহ আর হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন। উনার বিরুদ্ধে আনা হয় মিথ্যে অভিযোগ। অপবাদ দেয়া হয়। ইয়েমেনে গ্রেফতার করা হয় এই অসাধারণ সম্মানিত স্কলারকে। আনা হয় ইরাকের জেলে। আব্বাসি খলীফা হারুন আর রাশীদের দরবারে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা মিথ্যে অভিযোগ খন্ডন করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হন। পরে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

এতক্ষণ তিনটি প্রসিদ্ধ ইসলামিক স্কুল অফ থটের (মাযহাবের) প্রধান স্কলারদের

টর্চার!

উপরে নেমে আসা অকথ্য নির্যাতনের কথা বললাম। চতুর্থ বিখ্যাত মাযহাবের আলীমের উপরে করা নির্যাতনের ইতিহাসটাও আর বাকি রাখি কেনো?

উনার নাম ছিলো ইমাম আহমাদ ইবন হানবাল। রাহিমাহুল্লাহ। উনার সময়ে ভ্রান্ত কিছু বিশ্বাস আর দর্শন ছড়িয়ে পড়ে, এবং তিনি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বিরোধিতা করায় অনেক অনেক নির্মম নির্যাতন করা হয়। দুই বছর তাঁকে জেলে আটকে করে রাখা হয়। কারাগারের উনার উপরে নেমে আসা তীব্র ভয়ানক শারিরীক নির্যাতনের কথা ভাষায় প্রকাশ করা এই ছোট্ট পরিসরে সম্ভব নয়। মুক্তি পাওয়ার পর আবারও বাগদাদে শিক্ষকতায় ফিরে যান। পরবর্তী শাসক এসে আবারও তাঁর উপরে নির্যাতন আরম্ভ করে। পরবর্তী শাসক আসার আগ পর্যন্ত শিক্ষকতা বন্ধ করে উনাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয় পাঁচ বছরের জন্যে। ভাবা যায়? পাঁচ বছর!

আমাদের আর মন খারাপ করার কিই বা কারণ আছে? যেখানে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছে উনাদের মতো অসাধারণ মানুষদের! আমাদের সাথে এই ব্যবহার এটাইতো প্রমাণ করছে যে ইতিহাসের এই ধারায় আমরা সঠিক পথের উপরেই আছি।

ইসলামের পথের উপর। সত্যের উপর। যে পথ স্বল্পদের। যে পথ আগন্তুকদের।

পরীক্ষা আর পরীক্ষা

ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করার সাথে সাথেই আমাদের উপর একের পর এক পরীক্ষা নেমে আসে। আমরা ঘাবড়ে যাই। না চাইতেই পেতে থাকা লক্ষ-নিযুত নিয়ামাতের কথা ভুলে অকৃতজ্ঞ বেয়াদব গাদ্দারের মতো বলে বসি, "আমার সাথেই খালি কেনো এমন হয়?" কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিয়ে আবার আগের জাহিলিয়্যাহর কুৎসিত জীবনে ফিরে যায়। আমাদের যেনো এমনটি না হয়। ভালো-কঠিন প্রতিটা মূহুর্তেই আঁকড়ে যেনো ধরে থাকি কুরআন আর সুন্নাহর পথকে শক্ত করে।

মনে রাখতে হবে, যেকোনো সময়ই একটু অবহেলাতেই পড়ে যেতে হতে পারে আর দশজনের মতোই। তাই কক্ষনো হাল ছাড়া যাবে না। কক্ষনো না। কারণ, এক মূহুর্তের অসাবধানতায় হতে পারে ভয়াবহ পতন।

নিজের পাঁচটা অংশে আমাদের পরম করুণাময় লালন-পালনকারীর বলে দেয়া কথাগুলো যদি অন্তরে গেঁথে ফেলি, তাহলে ইন শা আল্লাহ আমরা আর ঘাবড়ে যাবো না। প্রতিটা পরীক্ষায় আর কষ্টে নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মজন আরপ্রন্ধুদেরকে কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে শক্ত মনোবল ফিরে পেতে পারি বারবার যে আমাদের সাথেতো এমনটাই হওয়ার কথা ছিলো।

মনে যেনো রাখি, আমাদের পরম করুণাময়ের প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

#১

তোমরা কি মনে করেছো, এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে?

অথচ তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের ওপর যা কিছু নেমে এসেছিল এখনও তোমাদের ওপর সেসব নেমে আসেনি।

তাদের ওপর নেমে এসেছিল কষ্ট–ক্লেশ ও বিপদ–মুসিবত,

তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।

এমনকি রসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে

যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।"

[আল বাকারাহ: ২১৪]

❧২

লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, "আমরা ঈমান এনেছি" কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না ? .

অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি।

আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।

[সুরা আল আনকাবূত: ২-৩]

❧৩

তোমরা কি মনে করে রেখেছো তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী।

[সুরা আলে ইমরান: ১৪২]

❧৪

আর নিশ্চয়ই আমরা ভীতি, অনাহার, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো এ অবস্থায় যারা সবর করে, এবং যখনই কোনো বিপদ আসে বলে: "আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে"

তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও, তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে,

এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।

[সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

❧৫

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্য আর সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [সুরা বাকারা: ১৫৩]

বই-রাগী

বিজ্ঞান। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে মজার বিষয়টির নাম। দর্শন আর জ্ঞানের অপূর্ব আর অলৌকিক সমন্বয়।

যেসব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শেখানো হয় সেখানের শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্ভবত আকাশ ছোঁয়া। দায়িত্বটা হচ্ছে তথ্য দেয়া এবং বুঝিয়ে দেয়ার পাশাপাশি, ছাত্রদের মাঝে ভাবনার বারুদে ভয়ংকর বিস্ফোরন ঘটিয়ে দেয়া। বিজ্ঞানের স্টুডেন্টদের নিজ জীবনে সবচাইতে চোখ খোলা, লজিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার কথা ছিলো। এক একটা তথ্য, এক একটা আবিস্কার তাদের চিন্তার রাজ্যে ধুন্ধুমার বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়ার কথা ছিলো। প্রতিটা ক্লাসে, প্রতিটা দিন। ক্লাস থেকে বেরিয়েই ঘ্যাসঘ্যাস করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে নিজের নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে বন্ধুর সাথে রগ ফুলিয়ে তর্ক করার কথা। নতুন আসা ঝকঝকে আইডিয়াটা কেন পুরাই ফাউল আর বোগাস নয়, সেটা বন্ধুকে বুঝানোর চেষ্টা করার কথা। আর বন্ধুর কাজ হওয়ার কথা, কেন আইডিয়াটা পুরোটাই ভিত্তিহীন সেটা প্রমাণ করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকা।

৫ বছর আগের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে বিজ্ঞান বিভাগের স্টুডেন্টদের এরকম ছবিই আমার মাথায় ভাসতো। ভর্তি হলাম। ৫ বছর পার করলাম। দুঃখিত আমি। ক্লান্ত আমি। এখানে কেউই আইডিয়া নিয়ে আগ্রহী না। স্টুডেন্টরাতো নয়ই, ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকরাও নয়। নিজের একটা পিচ্চি অভিজ্ঞতা বলি। আমার মাথায় থার্ড ইয়ারে থাকাকালে একটা বোগাস আইডিয়া এসেছিলো। সাস্পেন্ডেড এনিমেশান করে কিভাবে কার্যকরভাবে একটা জীবন্ত প্রাণীর সব বিপাকের হার ধীরগতির করে দিয়ে ঐ প্রাণীটার কাল দীর্ঘায়ন অর্থাৎ টাইম ডাইলেশান করিয়ে দেয়া যায়, এরকম একটা আইডিয়া। ব্যাপারটা বেশ বোগাস মনে হলেও আমার কাছে তখন বেশ মজার আর উৎসাহের ছিলো। যেসব শিক্ষককে আইডিয়ায় আগ্রহী ভাবতাম, তাদেরকে লিখলাম ব্যাপারটা নিয়ে। উত্তরের অপেক্ষা করতে করতে ৩ বছর হয়ে গেলো। আজও উত্তর পাইনি।

সেদিন এক মজার ফিজিক্স টিচারের ক্লাস করছিলাম অনলাইনে। এই অসাধারণ শিক্ষকটি একটা অসাধারণ কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, একজন স্টুডেন্ট আইডিয়া নিয়ে কথা বলতে চাইলে তাকে উৎসাহিত না করা যেতে পারে, কিন্তু নিরুৎসাহিত করে দেয়াটা রীতিমতো ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে যায়। কেউ যদি তা

করে থাকে নিশ্চয়ই সে একজন ক্রিমিনালের চেয়ে কম অপরাধী নয়। একজন স্টুডেন্টের সৃজনশীলতা নষ্ট করে দেয়াকে তিনি এইভাবেই তুলে ধরেছেন।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা আমার বিজ্ঞান মনস্ক বন্ধুদের সাথে কথা বলে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি। আর তা হচ্ছে, বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গড় চিত্রই মোটামুটি এইরকম। এখানে কেউ আইডিয়া নিয়ে কথা বললে, সায়েন্সের কিছু বুঝিয়ে দিতে বললেই তাকে "আঁতেল" ডেকে অপমান করা হয়। সত্যি বলছি, অপমানই করা হয়। এমনকি শিক্ষকরাও "আঁতেল" শব্দটা ব্যবহার করে ছাত্রদের অপমান করেন। কী বাজে একটা ব্যাপার!

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট আর শিক্ষকদের বই পড়ার ভয়াবহ বাতিক থাকার কথা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বিশ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আর শিক্ষকও এখানে বই পড়ায় উৎসাহী নয়। বিশ্বাস হয়? শিক্ষকরা বই পড়ে না! কী করে সম্ভব? বলাই বাহুল্য, আমি শুধু পাঠ্য বইয়ের কথা বলছি না। উৎসাহী হওয়া দূরে থাকুক, বই পড়াকে উল্টো সময় নষ্ট ভাবে এরকম মানুষও এখানে পাওয়া যায়। আর অল্প যে কয়জন বই পড়ে পাগলের মতো, তারাও উপন্যাসের গন্ডীর বাইরে আসতে পারে না সহজে। কী হতাশাজনক চিত্র! একটা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শুধু নতুন নতুন বই পড়া নিয়েই দিনরাত আড্ডাবাজি হওয়ার কথা, তর্কাতর্কি আর গঠনমূলক আলোচনা হওয়ার কথা, সেখানে সবাই হিন্দী মুভি আর গানে নায়ক নায়িকার দেহভঙ্গী, বিবাহপূর্ব অবৈধ সম্পর্ক, কে কার নামে কি বললো, কার কেমন চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র ইত্যাদি নষ্ট আলোচনাই এখানকার স্টুডেন্টদের আলোচনার মূল টপিক! আবারো বলছি "মূল টপিক"!

একাডেমিক কিছু বলতে হলে সবাই শুধু মার্ক্স, ক্লাস পজিশান আর জব নিয়েই ভাবে, কথা বলে। এগুলোই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। অনার্স পাশ করার আগে যে ছেলের চার চারটা আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক-গবেষণাপত্র থাকে তার জানা এবং ভাবনার পরিধি হাবা-গোবাররও নিচে। সত্যি বলছি। কেউ মার্ক্স বেশি পেয়ে অহংকারী হয়ে ওঠে, আর কেউ কম মার্ক্স পেয়ে হতাশ হয়ে যায়। নিজের অতীত জীবনের সাফল্য, মেধা, শ্রম আর অসাধারণ ফলাফল সে হারিয়ে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে। হতাশায় জীবন পার করা শুরু করে। অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব সবার চোখে এই মানুষগুলি একটা অবজ্ঞার ছাপ খুঁজে নেয়। অসাধারণ মেধা থাকা সত্ত্বেও মানুষটার আর ফুল হয়ে ফুটে ওঠা হয় না। একসময়ের বিজ্ঞানের অসীম আগ্রহী মানুষটা ব্যাংকের ক্যালকুলেটর অথবা সরকারের নিরাপদ চাকর হওয়ার মাঝেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে ফেরে।

এই স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা মানুষগুলোর জীবন নষ্ট করার জন্যে আমরাই দায়ী। আমরাই। এর দায় এখানে এড়ানো গেলেও, ওখানে এড়ানো যাবে না।

বেঁচে থাকতে টাকা লাগে। সত্যি কথা। খুব বেশি টাকা লাগে না। এটাও সত্যি কথা। যে মানুষটার খুলির ভেতরে মস্তিস্ক নামের একটা বস্তু আছে, এবং সেটা চালু আছে, তার জীবনের লক্ষ্য টাকাতে কখনো স্থির হতে পারে না। নিয়ম নেই। হতাশা আর সমস্যার কথা বলবো বলে এই বিশাল লেখা ফেঁদে বসিনি। শুধু সমস্যার কথা বলাটাও একরকম মানসিক সমস্যার লক্ষণ। এই লেখাটা লিখেছি, সমাধানের পথ নিয়ে কিছু বলতে।

এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ। কেউ যদি সত্যিই কিছু শিখতে চায় তাহলে তার জন্যে আক্ষরিক অর্থেই ইন্টারনেট বিল ছাড়া আর কোনো বাঁধা নেই। Khan academy আর শিক্ষক ডট কমের মতো ওয়েবসাইটে যেমন নিজে নিজেই পড়াশোনা করে, ভেবে চিন্তে অনেক কিছু শিখে ফেলা যায়, তেমনি MIT, IOU Avi Coursera তে ঢুকেও মজার মজার পছন্দের কোর্সে সিরিয়াসলি পড়াশোনা করার জন্যে ভর্তি হওয়া যায়। সারাজীবন কুরআন না জানা মানুষটাই ইন্টারনেটে অনলাইনে সিরিয়াসলি কোর্স করে আরবী শিখে ফেলতে পারে। নিজের অসাধারণ একটা মানুষ হয়ে ওঠার শুরুটা অনুভব করতে পারে।

করা যায় অনেক কিছুই। একটা একটা ডিগ্রীর কাগজ জমিয়ে বাকি জীবনটা আরামে পার করে দেয়া যায়, ব্যাংকের ক্যালকুলেটর কিংবা সরকারের পা চাটা গোলাম হয়েও একটা তথাকথিত নিরাপদ ঝুঁকিহীন অথবা মেরুদন্ডহীন জীবন পার করে দেয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র এটুকুই করা কি আমাদের মানায়? এটা কি মস্তিস্ক নামের অসাধারণ উপহারটার প্রতি অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য আর অবহেলা না? আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি এত ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ যে শুধু নিজেকে কেন্দ্র করেই জীবনটা পার করে দেবো?

কী করা যায়? আমি বলি কি, শুরু হোক বই পড়া। ক্লাস মিস দিয়ে হলেও, ঘুম বাদ দিয়ে হলেও, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, কাগজে, মোবাইলে শুরু হোক বই পড়া। উপহার হোক শুধু বই। কমিক্স থেকে শুরু করে যে কোনো বই। দুঃখে পাশে থাকুক বই। কান্না পাচ্ছে? বিশাল শেলফ থেকে যেন একটা বইকে টেনে নেয়া হয়। খুব আনন্দ? ছুটি পাওয়া গেছে? অবসর সময় কাটুক বইয়ের সাথে।

আমাকে দিয়ে আর বই পড়াটা বুঝি হবে না? একদম বাজে কথা। শুরু করলেই হবে। শুরু করতেই হবে। কমিক্স দিয়ে হলেও। কাউকে খুশি করে দিতে ইচ্ছে করছে খুব? একটা বইকে নিজের হাতে বানানো র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে, বইয়ের

উপর নিজেরই অসাধারণ কিছু অনুভূতি লিখে দেয়া হোক তাকে। প্রিয় মানুষগুলো কি ধরণের বই পড়তে পছন্দ করে? জানা থাকুক। টিউশানিতে যাওয়ার সময় হাতে থাকুক বই। ট্রেইনে যাওয়ার সময় কোলে থাকুক বই। বেড়াতে যাওয়ার সময় ব্যাগে থাকুক বই।

যারা ইসলামকে নিজের জীবন-যাপনের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যেকেরই তো ভয়াবহ পড়ুয়া হওয়ার কথা। আরে, আল-কুরআনের প্রথম যে শব্দ, যে আদেশ এসেছে আমাদের জন্যে, তা ছিলোঃ

"পড়ো"।

সেই আমরাই যদি বই-ই না পড়ি তাহলে...

তাহলে কি হবে তা আর বলে লাভ নেই। একটা বই পড়তে না চাওয়া মানুষ এটা কখনোই বুঝবে না। বোঝানো সম্ভব না।

যারা বুঝবে তাদের জন্যে বলছি, বই-ই হোক ভালোবাসা। ভালোবাসাই হোক বই।

নন-প্র্যাক্টিসিং

শুন দোস্ত, যে মানুষটা বেঁচে থাকার জন্যে কখনোই মাংস ছোঁয় না আর, সবসময় উদ্ভিদ থেকে বানানো বিভিন্ন রকমের খাবার-দাবার খেয়েই বেঁচে থাকে, শুধু তাকেই আমরা ভেজিটেরিয়ান বলি। তাকে কখনো প্র্যাক্টিসিং ভেজিটেরিয়ান বলি না।

-কিন্তু কেনো?

-কারণ, সেতো কখনোই মাংস খায় না। খায় না বলেইতো তাকে ভেজিটেরিয়ান বলা হচ্ছে। মাংস না খাওয়াইতো তাকে ভেজিটেরিয়ান বলে সংজ্ঞায়িত করছে। তাই তাকে আলাদা করে "প্র্যাক্টিসিং" ডাকাটা অর্থহীন ফালতু বাহুল্য ছাড়া আর কিছুই না।

-হুম, এইবার বুঝছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গ কেনো আনলি?

-এখনই বুঝবি। উপরের উদাহরণটার মতোই যে মানুষটা নিজেকে, নিজের জীবনের সব ইচ্ছেকে আল্লাহর ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পন করে দেয়, আল্লাহর আদেশকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়, তাকেই তো মুসলিম বলে। আলাদা করে তাকে "প্র্যাক্টিসিং মুসলিম" ডাকার কোনো মানেই হয় না।

-দাঁড়া, দাঁড়া। সবসময় তো এইভাবেই ডেকে আসছি আমরা। আরেকটু ঝেড়ে কাশ ভাই!

-দ্যাখ, মুসলিম মানেইতো সে তার সবগুলো ইচ্ছে আর কাজকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইচ্ছে আর আদেশের কাছে বিনা শর্তে সমর্পন করবার জন্যে সবসময় এক পায়ে খাড়া। সে অটোম্যাটিক্যালি স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে চায়। আর সেজন্যেই তাকে মুসলিম বলা হয়। তাই না?

হুম!

আর আল্লাহর সব কথা মেনে চলতে না চাইলে, উনার ইচ্ছে আর আদেশের কাছে সম্পূর্ণরুপে আত্মসমর্পন না করতে চাইলেতো তাকে আর মুসলিমই বলা হতো না।

একদম ঠিক।

-আমরা যেনো এটা বুঝতে পারি। পুরোপুরি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে মুসলিম না হয়ে থাকলে যেনো এক্ষুণি অনুতপ্ত হয়ে, মাফ চেয়ে, আর ভুল না করার প্রতিজ্ঞা করে ফিরে আসি আল্লাহর কাছে, এবং আর কখনো উনার অবাধ্য না হয়ে জীবনটাকে যাপন করার চেষ্টা করি। এবং এখুনি একটা ভালো কাজ করা শুরু করি। আজ, এই মূহুর্ত থেকেই তো আমাদের থামা দরকার, নাকি? এইভাবে তো শেষ রক্ষা হবে না আমাদের, এইটুকু তো বুঝতে পারছি! সবকিছু পরিস্কার হয়ে যাবার পরেও, ক্লিয়ারলি বুঝবার পরেও, নিজের প্রবৃত্তি এবং মনগড়া চিন্তা-ভাবনার পুজো করে আর কতোদিন চলবো?

রিজিক্বের ভয়

শার্ট-প্যান্ট, চশমা, জুতা, খাতা-কলম, জ্ঞান, খাবার, চাকরী-ব্যবসা, টাকা-পয়সা অর্থাৎ কিনা এই জীবনে আমাদেরকে যাই দেয়া হয়, হচ্ছে, সবই হলো রিজিক্ব। আর যে পরম করুণাময় আমাদেরকে নিজ থেকেই এত কিছু উপহার দিচ্ছেন, রিজিক্ব দিচ্ছেন, তাঁর আরেকটা নাম হচ্ছে আর-রাজ্জাক্ব (রিজিক্বদাতা)।

দাড়ি রাখলে, টাখনুর উপরে জামা পড়লে, হিজাব করে শালীনভাবে চললে, ইসলাম মানলে জব পাবো না, ক্যারিয়ার ধ্বসে যাবে, খেতে পাবো না- আমরা যখন এই ভাবে চিন্তা করি, রিজিক্ব না পাবার ভয়ে ইসলাম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি, তখন আমরা আসলে মনে করি আমাদের চাল-চলন, পোশাক, স্টাইলই আমাদের রিজিক্বদাতা, আল্লাহ নন। আমরা আসলে ভেতরে ভেতরে অবচেতন মনে এটাই সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি যে, নোংরা-অশ্লীল এই সমাজই আমাদেরকে খাওয়ায়-পরায়, দেখাশোনা ও প্রতিপালন করে, আল্লাহ করেন না।

আসলে আমরা ভয় পাই। ভয় পাই ইসলাম মানতে। ভয় পাই ক্ষুধাকে। ভয় পাই মরে যাওয়াকে। চিন্তা করি, আমার সম্পদ কমে যাবে নাতো? উপার্জন তো কমে যাবে যদি ইসলাম মানি! এই ভয় আমাদেরকে ঘিরে ধরে। ভয়েই আমরা মরে যাই। আল্লাহর কাছ থেকে আরো আরো দূরে সরে যাই। সরতেই থাকি, সরতেই থাকি। চিরশত্রুকে খুশি করে দিই। ডুবে যেতে থাকি আরো আরো অন্যায় কাজে। অন্যায়, অশ্লীলতা আর পাপের পঙ্কিলতায় সমাজ আরো ভয়ংকর আর বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। দিকে দিকে চিরশত্রু শাইত্বানের অট্টহাসি শোনা যায়। আমরাই তাকে জিতিয়ে দিই। আমরাই।

এই ভয়ের কথা, পরীক্ষার কথা কি আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দেননি? তিনিতো সূরা বাকারার ১৫৫-১৫৭ নং আয়াতে বলেছেন-

“আর নিশ্চয়ই আমরা ভয়, ক্ষুধা, প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে এবং উপার্জন ও আমদানী হ্রাস করে তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা সবর করে এবং যখনই কোনো বিপদ আসে বলে: “আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও। তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে, তাঁর রহমত তাদেরকে ছায়াদান করবে, এবং এই ধরনের লোকরাই হয় সত্যানুসারী।”

আমরা বুঝি না যে রিজিক্বের মালিকের উপরে ভরসা করে দুই কদম আগে বাড়লেই এই দুনিয়া আর পরের জীবন দুই জায়গাতেই আমরা আরো বেশি বেশি পাবো, সফল হয়ে যাবো। আমাদের চরিত্র, চাল-চলন, কথা-বার্তা যখন উনাকে ভালোবেসে আরো সুন্দর হয়ে যাবে, আমরা যখন নিজে নিজে কোনো অন্যায় করবো না উনার ন্যায় বিচারের কথা মনে রেখে, তখন আমার আর আমার পরিবারের জীবনে শান্তি তো আসবেই, সাথে বোনাস হিসেবে ধীরে ধীরে পুরো সমাজটাই তো বদলে সুন্দর হয়ে যাবে।

যে আল্লাহ, যে রিজিক্বদাতা এত বেশি করুণাময় যে আমরা এত এত অবাধ্য হওয়ার পরেও আমাদেরকে খাবার দিয়েই যাচ্ছেন, উনাকে অমান্য করে উনারই দেয়া চোখ অন্যায় কাজে ব্যবহার করার পরেও চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছেন না, উল্টাপাল্টা জিনিস শোনার পরেও শ্রবণশক্তি সাথে সাথে বন্ধ করে দিচ্ছেন না, খারাপ ভাবনা ভাবার পরেও মস্তিস্কটাকে অকেজো করে দিচ্ছেন না, শরীরটাকে অন্যায়কাজে ব্যবহার করার পরেও যিনি আমাদেরকে সাথে সাথে প্যারালাইজড না করে দিয়ে শুধু সুযোগ দিয়েই যাচ্ছেন ফিরবো বলে, ক্ষমা চাইবো বলে, কাছে যাবো বলে, সেই পরম করুণাময়ের দিকে যখন আমরা ফিরে যাবো কাজ-কর্ম, চাল-চলন আর কথা-বার্তা দিয়ে, দাড়ি, টাখনুর উপরে জামা কিংবা হিজাব দিয়ে যখন তাঁকে আর তাঁর প্রিয় রাসুল (স) কেই অনুসরণ করবো, তিনি কি তখন আমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিবেন, নাকি কমিয়ে দিবেন? কী মনে হয়?

অমূলক ভয়কে উপেক্ষা করতেই হবে। ভরসা করতে হবে তাঁরই উপর যিনি আসমান আর জমীনের সবকিছুর মালিক। যিনি আমাকে এতদিন রিজিক্ব দিয়ে এসেছেন, তাঁর পথে চললে সেই রিজিক্ব তিনি কমিয়ে দিবেন না, উল্টো হালাল পথে রিজিক্বের সন্ধান করে দিবেন, বারাকাহ বাড়িয়ে দিবেন। তাঁর প্রতিটা কথা, প্রতিটা ওয়াদা সত্য, আর পবিত্র কুরআনের সুরা তালাক্বের ২-৩ নং আয়াতের শেষাংশে তিনিই তো ওয়াদা করেছেন-

"যারা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের জন্য উপদেশ হিসেবে এসব কথা বলা হচ্ছে। যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটা মাত্রা ঠিক করে রেখেছেন।"

পথচলা, চেষ্টা এবং ভরসার সবটুকু হোক শুধুই উনার জন্যে।

হাল ছাড়বে?

প্রিয় ভাইয়া আর আপুরা,

আজকের দিনটা আমার এক বিশেষ প্রাপ্তির দিন। নিজের বিভাগ আর ফ্যাকাল্টিসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করার কারণে স্বীকৃতি আর সম্মান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণের দিন। পুরস্কার নেয়ার দিন আজ। একান-ওকান হাসির দিন। এই দিনটা কৃতিত্বের। অর্জনের। কিন্তু সাফল্যের নয়। কেনো? সেটাই পুরো লেখাতে তোমাকে বলবো।

এই দিনটার পেছনে আমার যুদ্ধের আর ব্যর্থতার মহাকাব্য আছে। আছে অজস্র দুঃখের কথা। আছে অজস্রবার আত্মহত্যা করতে চাওয়ার ইচ্ছের কথা। আজ তোমাকে সেই কথাগুলোই বলবো।

আমি কখনোই ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিলাম না। মোটামুটি, কাজ চলে টাইপের ছিলাম। পড়াশোনা কোনোদিনও ভালো লাগেনি, এখনো লাগে না। মনে আছে, স্কুল জীবনের প্রথম পরীক্ষায় আমি ফেইল করেছিলাম। ড্রইং এ। আম্মু এত্তো কষ্ট পেয়েছিলেন যে আমার সাথে সেদিন দুপুরে কথাই বলেননি। ওই ছোট্টবেলার কিছুই আমার মনে নেই, কিন্তু সেইদিনের রেজাল্টের কথা মনে আছে আমার। আম্মু রেজাল্টের জন্যে আমার সাথে কথা বলেননি, এটা আমার ছোট্ট বুকটাকে চিরে ফেলেছিলো। আমার ছোট্টবেলার কোনো মার্কশীট নেই। কিন্তু সেই মার্কশীটটা এখনো আছে। সেইদিনের পর থেকে আমি প্রত্যেকটা ড্রইং পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে এসেছি। আর প্রাইমারী স্কুলে কখনো সেকেন্ড হইনি।

এস এস সি তে আমি গোল্ডেন এ+ পাইনি। আমার আব্বু-আম্মুর আজীবন স্বপ্ন ছিলো ছেলে চিটাগাং কলেজে পড়বে। চান্সই পাইনি। উনাদের আশার আলো তখন বাগান হবে বলে বীজ বুনেছিলো মহসীন কলেজে। নাহ! মহসীনেও চান্স পাইনি। যে সিটি কলেজকে দুই চোখে দেখতে পারতাম না, ভর্তি হতে হয়েছিলো সেই সিটি কলেজেই। এখনো মনে আছে চিটাগাং কলেজ-মহসীন কলেজের সামনের রাস্তা থেকে হেঁটে হেঁটে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এসেছিলাম সেইদিন। এত্তবড় বুক ভাঙা কষ্ট। যে এর মধ্য দিয়ে গিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না আশাভঙ্গের কষ্টগুলো কত্ত ভারী।

এইচ এস সির পর্ব শুরু হলো। আমার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা

নিয়ে কখনোই আমি লজ্জা পাইনি, বরং এই পরিবারই ছিলো আমার সবচেয়ে বড় উৎসাহের জায়গা। আব্বুর মশলার দোকানের স্বল্প আয় আমার পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্যে খুব একটা অনুকূল ছিলো না, ফলে শুরু করলাম টিউশানি। টিউশানি করে করে টিচারদের কাছে বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ার খরচ মোটামুটি জোগাড় করতাম। বাকিগুলো আমার আব্বু দিতেন অনেক কষ্ট করে। মাঝে মাঝে টিউশানির টাকা বাঁচিয়ে গল্পের বই কিনে ডুব দেয়া। এই ছিলো সেই সময়ের অপার্থিব আনন্দ।

অবশেষে পরীক্ষা দিলাম। এবারেও গোল্ডেন এ+ পাবার যোগ্যতা ছিলো না আমার। আব্বু-আম্মুর আকাশ ভেঙ্গে দিলাম আরো একবার। বুয়েটেই পড়বো, তাই আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নেইনি। রেজাল্ট দিলো বুয়েটেও। টিকলাম না। এক বছর আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারিনি। কোথাও না।

এরপর এক বছর ঘরে বসে থাকা। এই সমাজে টাকাই সফলতা বিচারের আসল মানদন্ড। আর টাকা নামের কাগজটা উপার্জনের জন্যে অন্যতম মূল আগ্নেয়াস্ত্র যখন সার্টিফিকেট নামক অর্থহীন শক্ত আরেকটা কাগজ, তখন কোথাও ভর্তি হতে না পারা এই আমার অবস্থা এই নোংরা সমাজে কেমন ছিলো তা বলাই বাহুল্য। দিনের পর দিন কারো সাথে কথা বলতে পারিনি। আব্বু-আম্মু সহজে কোথাও যেতেন না ছেলের ব্যর্থতার লজ্জায়। সবাই যে খালি জিজ্ঞেস করে, “আপনার ছেলে কোথায় ভর্তি হয়েছে?” না বোধক উত্তরে কারো করুণামাখা কণ্ঠ ভেসে আসে, আর কারো হা হুতাশ, “ওতো ছোটবেলা থেকে বেশ ভালো ছেলে ছিলো, হঠাৎ এই অবস্থা কেনো?” এর কোনো উত্তর হয়? এর চেয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়াই বরং কম বিব্রতকর! কতবার যে ইচ্ছে হয়েছে আত্মহত্যা করি! কতবার মনে হয়েছে, কেনো এই বেঁচে থাকা যদি আব্বু-আম্মুর স্বপ্নই পূর্ণ না করতে পারলাম? কেনো এই বেঁচে থাকা যদি আমার কারণেই উনাদেরকে অবিরাম লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়?

সমাজের প্রতি ঘেন্না নিয়ে বেড়ে ওঠা আমার সেই তখন থেকেই। ২য় বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। ভালো পজিশানেই টিকলাম। কোন সাবজেক্ট নিবো? আব্বু-আম্মুর কোনো উত্তর নেই। আমার উপরে উনাদের আর কোনো আশা নেই। স্বপ্ন নেই। একজন সন্তানের কাছে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হচ্ছে তার আব্বু-আম্মুকে খুশি করা। আমার আর সেই সুযোগ রইলো না। মাইক্রোবায়োলোজি, বায়োকেমিস্ট্রির নাম অনেক শুনেছি। যেদিন ভর্তি হতে গেলাম, সেইদিন সাবজেক্ট বাছাই করতে ঢোকার আগে শুনলাম নতুন একটা বিষয়ের নাম। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলোজি। শুনলাম একদম

নতুন সাবজেক্ট। কোনো ভবিষ্যত নেই। চাকরী নেই বাংলাদেশে।

ব্যাস! ভর্তি হয়ে গেলাম এই সাবজেক্টেই। আব্বু-আম্মুর স্বপ্ন নেই, নিজেকে নিয়েও নিজের কোনো স্বপ্ন নেই, তাহলে হোক না নতুন কিছু! কলেজে তো আর পড়ছি না। ভার্সিটিতে এরকম কিছু নিয়েই না হয় যখন যা ভালো লাগে পড়বো। নিজ আগ্রহেই ক্লাস, পড়াশোনা করতাম।

ভার্সিটিতে ওঠায় খরচ বেড়েছে। ছোট ভাইদেরও স্কুলের খরচের প্রেশার আব্বুর উপর। পাঁচটা টিউশানি করতাম ফার্স্ট ইয়ারে। সারাদিন ক্লাস করে এসে টিউশানি করে রাত ১০টায় ঘরে ঢুকে বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতাম। আব্বু-আম্মু তখনও প্রয়োজন ছাড়া আমার সাথে কথা বলেন না। আমিও না। এসবই ভেতরটাকে অবিরাম পোড়ায়। এই দহন বাইরের কাউকে দেখাতে নেই। দেখাতে হয় না। নিয়ম নেই। আমি ভয়াবহ সেন্টিমেন্টাল ছেলে। সুইসাইড করার ইচ্ছে সবসময়েই বুকের ভেতরে লুকোনো ছিলো। কিন্তু সবসময়ে একটা কথা মনে হতোঃ

"দেখি না শালার জীবনটাকে আরেকবার! ফেইল করলে কিই বা আর হবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো। ফুটপাথে ঘুমাবো। জীবনে বাঁচতে তো দুইবেলা খাবার আর একবেলা ঘুমের চেয়ে বেশি কিছু লাগে না। সেটা আমি ঠিকই জোগাড় করে নেবো। জীবনটাকে দেখে নিবো আমি। খেতা পুড়ি আমি এই সমাজের!"

যখন ভর্তি হয়েছি তখন ডিপার্টমেন্টে শুধু দুইজন স্যার পড়াতেন। যখন যে পড়াটা বুঝতাম না এক দৌড়ে স্যারদের রুমে ছুটে যেতাম। কে কি ভাবলো কেয়ার করার সময় নেই! ক্লাসমেইটদের অনেকেই এইগুলোকে আদিখ্যেতা ভাবতে পারে! ভাবুকগে! স্যাররা যদি কিছু ভাবেন? তাতে আমার কি? আমার যুদ্ধে তো আমাকেই লড়তে হবে। জানতে হলে ডিস্টার্ব করতেই হবে। অবাক করা ব্যাপার হলো, স্যারেরা খুবই খুশি হয়ে বুঝিয়ে দিতেন। সময় না পেলে বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে হেল্প করতেন। সেমিনারে পড়তাম, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে পড়তাম। তারপরেও যথেষ্ট মনে না হলে টাকা জমিয়ে বইয়ের ফটোকপিটা কিনে ফেলতাম। ক্লাসে মজার কোনো টপিক পড়ালে শাটলের বগিতেও মাঝে মাঝে পড়ে ফেলতাম। আঁতেল ভাববে কেউ? ভাবলে আমার কচুটা হবে!

ফার্স্ট ইয়ার চূড়ান্ত চলে এলো। সাথে এলো ডেঙ্গু জ্বর। বাবারে বাবা! সে কি কাঁপুনি! লেপ-কাঁথার তলায় হিহি করে কাঁপতাম আর দাঁতে দাঁত চেপে নিজের কাঁপুনিকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করতাম। মন ভেঙ্গে আসতো। ফার্স্ট হবো তো? ফার্স্ট যে আমাকে হতেই হবে। নইলে আব্বু-আম্মুর সাথে যে আর কোনোদিনও

কিছু নিয়ে দাঁড়ানো হবে না। তারপরেও মন ভেঙ্গে পড়তো ঠিকই। ভেঙ্গে পড়লেই হুমায়ুন আহমেদের "হোটেল গ্রেভার ইন" বইটার "ডানবার হলের জীবন" খুলে বসতাম। নাহ! সম্ভব। খুবই সম্ভব। ফার্স্ট আমাকে হতেই হবে। বোধহয় দুই-তিন মাস ধরে পরীক্ষা হয়েছিলো। ডেঙ্গু জ্বর আর পরীক্ষার চাপে বারো কেজি ওজন কমে গেলো। কঙ্কাল হয়ে ঘরে ফিরলাম হল থেকে।

হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে। আব্বু-আম্মুর সামনে এক গাল হাসি নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলাম পরের চারবারের রেজাল্টেও। এস এস সি, এইচ এস সি, কোথাও না টেকার এক বছরের গ্লানি আমি মুছতে পেরেছি অবশেষে। আমি পেরেছি।

যদি আমি এস এস সির পরে ভালো কলেজে চান্স না পেয়ে সবার বকুনি, কটাক্ষ আর অপমান সইতে না পেরে সুইসাইড করতাম? একটা চিঠি লিখে, গলায় দড়ি দিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে সুইসাইডের চিন্তাটা সত্যিই বেশ রোমান্টিক, ভাবতেই অসাধারণ লাগে, তাই না? কিন্তু আব্বু-আম্মুকে সারাজীবন অসহ্য বেদনায় ডুবিয়ে, গ্লানি আর অপরাধবোধে তিলে তিলে মারার দুঃসাহস তোমাকে কে দিয়েছে? তোমাকে দশ মাস পেটে নিয়ে তোমার আম্মু নড়তে পারতেন না, হাঁটতে পারতেন না। অসহ্য যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারতেন না। জন্মের সময় যে তীব্র কষ্ট নিজের আম্মুকে তুমি দিয়েছো তার চেয়ে শুনেছি আগুনে পুরো পুড়ে যাবার কষ্টও অনেক কম। এত এত কষ্ট যে মাকে দিয়ে দুনিয়ায় এসেছো, সেই আম্মুই তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছেন সবচেয়ে ভালোবাসা আর পরম আদরে। জন্মানোর পরেও তুমি আম্মুর কোল ভিজানো, বিছানা বালিশ দুর্গন্ধ করার পাশাপাশি অজস্ররাত তোমার আম্মুকে ঘুমুতে দাওনি। দিনরাত ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে চিৎকার। উফফফফ! সহস্র রজনীরও বেশি সময় তোমার আম্মু তোমার জন্যে ঘুমাতে পারেননি। একবার চিন্তা করো! এক হাজারেরও বেশি রাত! সেই আম্মু তোমাকে সারাজীবন পিটায়ে তুলাধুনা করলেও, বকা দিলেও তোমারতো বেকুবের মতো মাথা চুলকাতে চুলকাতে হেহেহেঃ করে হাসি দেয়া ছাড়া কিচ্ছু করার নেই।

তোমার আব্বু। দিনরাত কী যে কষ্ট করেছেন তোমার জন্যে! হায়! যেদিন আব্বু হবে, সেইদিন বুঝবে। তার আগেই যেনো অনুভব করতে পারো সেই দু'আ করি। আব্বুরা ছেলেতো, তাই কষ্ট দেখাতে পারেন না। নিয়ম নেই। আব্বুদের কষ্টগুলো মানসিক। তীব্র মানসিক যন্ত্রণা। এত করেন পরিবারের জন্যে, এত খাটেন, তবুও সবার ভেতরের এটা না পাওয়ার কষ্ট, ওটা না পাওয়ার অতৃপ্তি আব্বুদের ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। সকাল রাত্রি যে মানুষটা কষ্ট করছেন তোমার হাসির জন্যে, আধা হাত সাইজের আপনাকে খাইয়ে পরিয়ে, পেলে পুষে

এত্ত বড় করেছেন, তাঁর বকুনি খেতে তোমার আপত্তি কোথায়? আজীবন তোমাকে দোষ দিয়ে দিয়ে অন্যায় বকুনি দিলেও তোমাকে বুঝতে হবে এই বকুনি হতাশার বকুনি, অসহায়ত্বের বকুনি। এইগুলো তোমাকে খেতে হবে, হজম করতে হবে। আব্বুকে জড়িয়ে ধরতে না পারো, তাঁর সামনে অন্তত হাসতে হবে।

দুনিয়ার জীবনটা কষ্টের। দুনিয়ার জীবনটা অনেক কষ্টের। দুনিয়ার জীবনটা খুবই খুবই কষ্টের। কথাটা মাথায় গেঁথে ফেলো। এখানে শান্তি পাবে না। এটা পরীক্ষার হল, জান্নাত না। এখানে তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই হাসতে চাইলে কিভাবে হবে? হবে না। পুরো পরীক্ষা ভালোভাবে শেষ করতে হবে। ডেঙ্গু হলেও ঘাড়মোড় ভেঙ্গে পরীক্ষা দিতে হবে, টাইফয়েড হলেও আল্লাহর নাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে যেতে হবে। পরীক্ষা দিতেই হবে। এক একটা ধাপে সফলতা পেয়েও কোনো লাভ নেই। আমি বলছি, লিখে রাখো, লাভ নেই। শান্তি পাবে না।

যার কোটি কোটি টাকা আছে সে শান্তিতে নেই। যে এস এস সি, এইচ এস সি তে গোল্ডেন এ+ পেয়েছে তার শান্তি নেই। যে অনার্স মাস্টার্সে সর্বোচ্চ ফলাফল করেছে সেও শান্তিতে নেই। প্রত্যেকেই পরের ধাপ নিয়ে অশান্তিতে আছে। যে বিদেশে আছে সে দিনরাত আব্বু-আম্মু, আর ফ্রেন্ডদেরকে মিস করে গুমরে কাঁদে। অথচ দেশে থাকতে কাঁদতো বিদেশ যাওয়া হচ্ছে না বলে। যার পি এইচ ডি হয়ে গেছে, সে পোস্ট ডকের পেছনে দৌড়ায়। পোস্ট ডক হয়ে গেলে আরেকটা পোস্ট ডক করার ইচ্ছা আরো একটু টাকার চাহিদা তাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। এই দৌড়ের শেষ নেই। বিশ্বাস করো। শেষ নেই। যদি দুই মুঠো খেতে পাচ্ছো বলে খুশি হয়ে ঘুম দিতে পারো, তাহলেই শান্তি। তাহলেই সুখ। যদি এই জীবনটা নিজের জন্যে না বেঁচে মানুষকে হাসাবে বলে বাঁচতে পারো, যদি তোমার স্রষ্টা যেভাবে বলেছেন সেভাবে চলতে পারো, উনাকে খুশি করার জন্যে মানুষের মতো মানুষ হতে পারো, যদি উনি তোমার উপরে খুশি হন, তাহলে সবাই তোমার উপরে খুশি হবে। তাহলে জানবে, তুমিই সফল।

সফলতার সংজ্ঞাটা মাথায় গেঁথে রেখে দাও। এই দুনিয়ায় একটার পর একটার পেছনে দৌড়ানোর নাম সফলতা নয়। এই দুনিয়ার মানুষ তোমার কাছে খালি চাইতেই থাকবে, চাইতেই থাকবে। তুমি তাদের জন্যে যতোই করো কেউই খুশি হবে না। কেউই কখনোই তোমাকে সফল বলবে না। এদের কথা তাহলে তুমি কানে তুলবে কেনো? তোমার মূল্যবান জীবনের সাফল্যের সংজ্ঞা এই নোংরা সমাজের নোংরামোর পেছনে ছুটে চলা মানুষগুলো কেনো সংজ্ঞায়িত করে দেবে? এরা কারা? এদের কথায় কেনো তুমি কষ্ট পাবে? বলো? কেনো সুইসাইড করার

কথা ভাববে তুমি? কেনো নিজেকে ফালতু ভাববে, ব্যর্থ মনে করবে? যে আল্লাহ তোমাকে এত্ত ভালোবেসে তৈরী করেছেন, না চাইতেই হাত, পা, মস্তিস্ক দিয়েছেন তিনি তো তোমাকে ভালোবাসেন। তিনিতো তোমাকে ব্যর্থ বলেননি এখনো। তিনি তো এখনো তোমার পরীক্ষার খাতা নিয়ে নেননি। তার মানে সময় আছে। সফল হওয়ার সময় এখনো বাকি আছে। সেই সফলতা, যার সংজ্ঞা কেবল সবচেয়ে জ্ঞানী, তোমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে যে জন, তোমার উপরে সবচেয়ে বেশি আশা ভরসা যার, তিনিই দিতে পারেন। তিনি বলেছেনঃ

"এবং যাদের (ভালো কাজের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম (successful)।"

(সুরা আল মুমিনূন: ১০২)

শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চাও, আর কারো কাছে না। তাঁকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করো, মানুষের জন্যে ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পকেটে যদি এক টাকা থাকে তবে সেই এক টাকাই হবে তোমার শক্তি। পকেটে যদি ত্রিশ টাকা থাকে তাহলে একটা গরীব মানুষের এক বেলা খাওয়ার উপায় তুমিই। হ্যাঁ। তুমিই। তুমিই যদি হার মেনে নাও সমাজের ফালতু নিয়মের কাছে তাহলে হবে? হবে না। তোমার আছে। অনেক আছে। শুধু সেটা তোমাকে জানতে হবে। যতটুক ভালো লাগে পড়ো। শুধু মনে রেখো ডিগ্রী আর মার্ক্সই জীবনের শেষ কথা না। ডিগ্রী আর মার্ক্স ছাড়াও বাঁচা যায়। অনেক কিছু করা যায়। চারপাশের মানুষগুলোর জীবন বদলে দেয়া যায়। হাসির আলো ছড়ানো যায়। মানুষের আজেবাজে কথাগুলোকে পাত্তা দিবে না কক্ষনো। মানুষের কথা তোমাকে দুই বেলা ভাত খাওয়ায় না, আল্লাহ খাওয়ান। সেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বাঁচো। মানুষের জীবনে হাসি ফোটানোর জন্যে বাঁচো।

জীবনের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। তবুও যদি মন খারাপ হয়ে যায়, বুক ভার লাগে, কুরআন খুলে বসো। পড়ো। দেখো না আল্লাহ তোমাকে কি বলছেন? নিজেই জেনে দেখো আল্লাহ তোমাকে কত্ত ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসায় এই জগতের বাহির থেকে তোমার জন্যেই কথার মালা পাঠিয়েছেন। দেখবে মন ভালো হয়ে যাবে।

হাঁটো। বৃষ্টিতে ভিজো। নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে থাকো একলা। ছাদে কিংবা মাঠে শুয়ে একা একা রাতের আকাশ দেখতে শিখো। নিজের জন্যে প্রতিদিন একটু হলেও সময় রাখো। খুব খারাপ লাগলো কাঁদো। হাউমাউ করে হোক, ভেউভেউ করে হোক কাঁদো। কান্নায় লজ্জার কিছু নেই। ছেলে হলে নিজের

আব্বু-আম্মু, ভাই-বোন কিংবা কাছের বন্ধুটাকে, মেয়ে হলে আব্বু-আম্মু, ভাই-বোন বা প্রিয় বান্ধবীকে সব খুলে বলে জড়িয়ে ধরে কাঁদো। কিচ্ছু হবে না।

সবাই যেভাবে বলে সেভাবে বেঁচো না। যে কাজটা করতে ভালো লাগে সেই কাজটাতে বেস্ট হও। সেটাই করো। সেটা দিয়েই হালাল কামাই করো। তা যদি দশ টাকাও হয় তবু তাতে তোমার তৃপ্তি থাকবে। আনন্দ থাকবে। টাকা খুব বড় কিছু না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বাঁচতে পারাটা, নিজের বুকের ভেতরের আনন্দের হাসিটা, চারপাশের প্রিয় মানুষগুলোর হাসিই হচ্ছে সত্যিকারের অর্জন।

আমি বলছি, হাল ছেড়ো না। আর মাত্র দুই দিন বাকি। এরপরেই মরে যাবে ইন শা আল্লাহ। এই দুইটা দিন কষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে নাও, মানুষের জন্যে কাজ করে যাও দাঁতে দাঁত চেপে। জান্নাত তোমারই হবে। সফলতা তোমারই হবে।

শেষ হাসিটা আমরা একসাথে জান্নাতে বসেই হিহিহিঃ করে হাসবো ইন শা আল্লাহ। দেখবে, সব পেরিয়ে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আমরাই জিতবো। জিতবোই।

মশাল নিয়ে শেষকথা

মশাল জিনিসটা অদ্ভুত সুন্দর! ঘুটঘুটে অন্ধকারে যখন কেউ মশাল হাতে দাঁড়ায়, তখন আঁধারের পটভূমিতে আলোর উজ্জলতা চোখে আরাম দেয়। আর যখন সেই আঁধার চিরে হাজার হাজার মশাল এগিয়ে যায় সামনে, তখন তার সৌন্দর্য্যকে শব্দে ধারণ করার ক্ষমতা আমার পালনকর্তা আমাকে দেননি।

আপনার মশালে এই ভয়ংকর অন্ধকার সময়ে যদি আপনার পালনকর্তা একটা আলো দিয়ে থাকেন, তাহলে সেই আলো আপনি অন্যের মশালেও কেনো দিচ্ছেন না? আপনি কি চান না, এই যাত্রাপথে আপনার চারপাশের মানুষগুলোও আলোকিত হোক?

ওরা না হয় ওদের এই অন্ধকারেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আলো চেনে না আর, আলোর মূল্য বুঝে না, কিন্তু আপনিতো বুঝেন। আপনার মশাল থেকে ওদের মশালে আলো জ্বেলে দেয়ার চেষ্টা আপনি কেনো করছেন না? আপনিতো কৃপণ নন। আর আপনার মশালে থেকে অন্যের মশালে আগুন দিলে আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই, বরং চারপাশটা আলোকিত হবে আরো দ্বিগুণ।

শুরুতে একটু কষ্ট হলেও, আঁধারে অভ্যস্তরা তাদের মশালে আগুন জ্বালতে না দিলেও, আল্লাহ চাইলে, আমরা অপার অঢেল ভালোবাসা আর আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করতে থাকলে আস্তে আস্তে তারা নিশ্চয়ই বুঝবে।

আর দিনশেষে আমাদের আলোর মিছিলটা দেখতে খুব সুন্দর লাগবে। খুব।

লোকে কী ভাববে, সমাজ কী বলবে এসবে পাত্তা দেয়ার সময়তো আমাদের নেই। ভয় পাবারতো প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ না চাইলে কে আমার ক্ষতি করতে পারবে? কেউ আমার একটা লোমও ছুঁতে পারবে না যদি আল্লাহ না চান। তাহলে আর ভয় কেনো?

আমরা শুধু জানি আরো আলো দরকার। আরো অনেক অনেক মশাল অপেক্ষা করছে আলো পাবার জন্যে। অন্ধকার চিরে চারপাশ আলোকিত হবার অপেক্ষায় দিন গুনছে। সেই আলো জ্বালতে হবে আমার আর আপনার মশাল থেকেই।

"এ বইটাতে কিছু সমস্যা আছে। যারা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী, তাদের জন্য পড়া ঠিক হবে না। অবিশ্বাসে ফাটল ধরে যেতে পারে। আর যারা আম আদমী, তাদের জন্যও পড়া ঠিক হবে না। স্ট্যাটাস কুও-তে ধাক্কা লাগতে পারে। তেলাপোকারা রাতে ঘোরে, দিনে লুকিয়ে থাকে। অন্ধকারের জীবদের আলো ভালো লাগে না। তবে যারা তেলাপোকা না, যারা অন্ধকারেই থাকবে এমন পণ করেনি, যারা আলোর দুনিয়াটাকে দেখতে ভয় পায় না - তারা বইটা পড়তে পারে। ভালোই লাগবে আশা করি।"

-শরীফ আবু হায়াত অপু

"তত্ত্ব ছেড়ে জীবনে" ও "বাক্সের বাইরে" এর লেখক

""উল্টো নির্ণয়" বইটি আপনাকে উল্টো করে সত্যকে নির্ণয় করে দেখাবে যে সত্য কতোটা সহজাত আর সুন্দর হয়। বইটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে এই কথাগুলো আমার, আমার প্রশ্ন, আমার জিজ্ঞাসা। যুগের চ্যালেঞ্জের সময়ে এটি বাংলা ভাষায় একটি অনন্য সংযোজন। মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর একজন জিনিয়াস মানুষ। "উল্টো নির্ণয়" উনার একটি জিনিয়াস কাজ। আল্লাহ উনাকে কবুল করুন।"

-আরিফ আজাদ

"প্যারাডক্সিকাল সাজিদ" এর লেখক

"বইটা পড়ে বহুবার ধাক্কা খেয়েছি। আমি এত ভুল করেছি জীবনে? এখনও এত ভুলের মধ্যে আছি? নিজেকে বহুবার ছোট, হীন মনে হয়েছে। আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেয়াদব মনে হয়েছে। বইটা আমাকে প্রতি পদে পদে মনে করিয়ে দিয়েছে আল্লাহ আমাকে কত দিয়েছেন, কিন্তু আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, উপলব্ধিই করিনি। আশাকরি এই বইটি আপনাকে উপলব্ধি করতে শেখাবে আমরা প্রত্যেকে কি অসীম দয়ার সাগরে ডুবে আছি।"

-ওমর আল জাবির

"পড়ো" এর লেখক

সবাই তোয়াহা নামে চিনে। পুরো নাম মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর। একাডেমিক পরিচয়ে তিনি একজন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন বায়োটেকনোলজিস্ট। আগ্রহ বিজ্ঞানে এবং গবেষণায়। তারচেয়েও বেশি আগ্রহ পড়ানোয়। পেশা হিসেবে তাই স্কুলে শিক্ষকতা করাকেই বেছে নিয়েছেন। নৈতিক এবং আদর্শিক জীবনে একজন মনেপ্রাণে মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করছেন। নাস্তিকতা ছেড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ করুণা আর দয়ায় ইসলামের আলো চিনে সত্যের পথে এসেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। এখন শিখার চেষ্টা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা চলাকালীন সময়ে তাঁর কয়েকটি গবেষণার কাজ আন্তর্জাতিক জার্নালে স্থান করে নেয়। নিজের বিভাগ,ফ্যাকাল্টিসহ পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ রেজাল্টের কারণে সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি ও সম্মান দেন।

- প্রকাশক

পরিপূরক প্রকাশনী www.poripurok.com